ভারতবর্ষ—দেশ ও দেশবাসী

সাধারণ পাখি

সালিম আলি

ও

লাইক ফতেহ্ আলি

ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ভারতবর্ষ—দেশ ও দেশবাসী

সাধারণ পাখি

সাধারণ পাখি
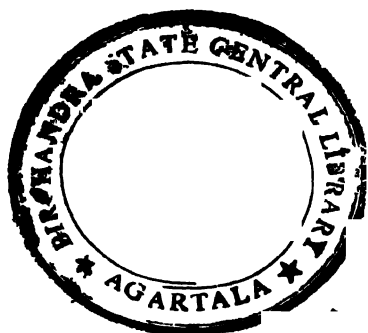
সালিম আলি

ও

লাইক ফতেহ্ আলি

অনুবাদ

নন্দিতা মুখার্জী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়া দিল্লী

সূচীপত্র

দি বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি, বম্বে, অনেকগুলি রঙিন চিত্রের ব্লক ব্যবহার করতে দিয়ে প্রকাশককে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

ভূমিকা

পৃথিবীর সমস্ত মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রাণীকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে সেই-সব প্রাণী যাদের শরীরের রক্ত গরম, আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে তারা যাদের শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা। প্রথম শ্রেণীর প্রাণীদের রক্তের তাপমাত্রা সব সময় প্রায় একই রকম থাকে, বাইরের আবহাওয়া তাদের রক্তের তাপমাত্রার কোনোরকম পরিবর্তন ঘটায় না। কিন্তু দ্বিতীয়শ্রেণীর প্রাণীদের রক্তের তাপমাত্রা পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়, মাছ, ব্যাঙ আর সরীসৃপেরা পড়ে এই শ্রেণীতে। গরম রক্তের প্রাণীদেরও আবার দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়; প্রথম হচ্ছে স্তন্যপায়ী জীব (মানুষও এই শ্রেণীতেই পড়ে) আর দ্বিতীয়, পাখি। স্তন্যপায়ী জীবের প্রধান বিশেষত্ব, এদের শর .র লোম ও চুল থাকে, এরা জীবন্ত শিশুর জন্ম দেয় ও তাকে স্তন্যপান করায়। আর পাখিদের শরীর ঢাকা থাকে পালকে, এরা ডিম পাড়ে এবং নিজেদের শরীরের উত্তাপে সেই ডিমে তা দিয়ে ডিম ফোটায়। আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু এই নভোচারী পক্ষীকুল।

পাখিদের সংজ্ঞা নির্ণয় করা কিছু শক্ত নয়। এরাই হচ্ছে

পৃথিবীর একমাত্র পালকবিশিষ্ট প্রাণী। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে সব পাখিই বুঝি একই রকম, কারণ ওরা প্রায় সকলেই উড়ে বেড়ায়, বাসা বাঁধে আর ডিম পাড়ে। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে ওদেরও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য আছে প্রচুর। পক্ষীজগতে মানুষের বুড়ো আঙুলের মাপের ছোট্ট 'হামিং বার্ড'ও আছে, আবার টাট্টু ঘোড়ার মতো বড়ো উটপাখিও আছে। এমন পাখি আছে যারা হাজার মাইল উড়তে পারে, আবার পেঙ্গুইনের মতো পাখিও আছে যারা মাটি ছেড়ে উঠতেই পারে না।

উইভার বার্ড (weaver bird) বা বাবুইজাতীয় পাখিদের মতো অনেক পাখিই আছে যাদের বাসা বোনার কৌশল অপূর্ব, আবার এমন পাখিও অনেক আছে যারা বাসা বাঁধেই না, মাটিতেই যেখানে-সেখানে ডিম পেড়ে রাখে। বহু পাখি আছে যারা একটা বিশেষ ধরনের খাদ্য ছাড়া অন্য কিছু খেতেই পারে না, শকুন জাতীয় পাখিরা পচা গলা মাংস খেয়ে দিব্যি থাকে আবার কাকের মতো পাখিও আছে যারা বোধহয় একমাত্র ধাতব পদার্থ ছাড়া অন্য সব-কিছু খেয়ে হজম করতে পারে। যাযাবর পাখিদের কথা সবাই জানেন, তারা বছরে দুবার করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়, আবার এমন পাখির সংখ্যাও অনেক যারা একটি বাগানের আশে-পাশেই কাটিয়ে দেয় সারাটা জীবন। গৃহপালিত মুরগীর বাচ্চা ডিম ফুটে বার হয়েই খাবারের খোঁজে ছুটোছুটি শুরু করে দেয়, আবার দীর্ঘপুচ্ছ টিয়া ও ঈগল পাখির বাচ্চা প্রথম কয়েক সপ্তাহ বাসা ছেড়ে বাইরে যেতেই পারে না। বহু পাখি আছে যারা লোকালয় থেকে দূরে থাকতেই পারে না, আবার এমন পাখিও

আছে যারা মানুষের সঙ্গ সযত্নে পরিহার করে চলে। এত অজস্র রকমের বৈচিত্র্য আছে যাদের মধ্যে তাদের শ্রেণীবিভাগ করা কি সোজা কথা?

প্রাণীজগতে কিছুটা শ্রেণীবিভাগ করবার প্রথম চেষ্টা করেছিলেন অ্যারিস্টট্‌ল। তারপর অষ্টাদশ শতকে সুইডেনের প্রকৃতিবিদ লিনিয়াস (Linnaeus) এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করে গেছেন। মোটামুটি ভাবে এঁর নির্দেশিত শ্রেণীবিভাগই সর্বত্র মেনে নেওয়া হয়েছে। গঠন এবং ক্রমবিবর্তনের মৌলপ্রকৃতি অনুসারে সমস্ত পক্ষীজগৎকে 27টি প্রধান বর্গে (order) ভাগ করা হয়েছে।

যেমন, পাসেরিফর্মিস্ বর্গ (Passeriformes) বললে বুঝতে হবে সেই-সব পাখি যারা বাস করে বৃক্ষশাখায়, অর্থাৎ আমাদের চেনাশোনা অধিকাংশ পাখিই এই বর্গের অন্তর্গত। সিকোনিফর্মিস্ (Ciconiiformes) বর্গের অন্তর্গত হল সমস্ত সারস ও বকজাতীয় পাখি যারা জলের কাছাকাছি বাস করে। আর হাঁস জাতীয় সাঁতারু পাখিরা হচ্ছে অ্যানসেরিফর্মিস (Anseriformes) বর্গের।

এই বিভিন্ন বর্গগুলিকে আবার ভাগ করা হয় কতকগুলি গোষ্ঠীতে। সাধারণত যে-সব পাখিদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ ধরনের লক্ষণ দেখা যায় তাদেরই ফেলা হয় এক-একটি গোষ্ঠীতে (family)। পাসেরিফর্মিস বা শাখারূঢ় শ্রেণীর মধ্যে আছে অন্তত 40টি গোষ্ঠী, যেমন ফ্লাইক্যাচার (Muscicapidae), কাক (Corvidae), সান বার্ড (Nectariniidae) ইত্যাদি। এই গোষ্ঠীগুলিকে সত্যি সত্যিই এক-একটি পরিবার বললে কিছুমাত্র ভুল বলা হয় না কারণ এদের মধ্যে এমন সব প্রজাতি

আছে যাদের ক্রমবিবর্তনের মধ্যেও খুব ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। তা ছাড়া তাদের ধরন-ধারণ আর বিভিন্ন অভ্যাসের মধ্যেও মিল আছে যথেষ্ট। এই-সব অভ্যাসের মিল প্রতিফলিত হয় ওদের ঠোঁট আর নখের আকৃতিতে, ডানার গঠনে আর হাঁটা, চলা ও ওড়ার বিভিন্ন ভঙ্গিমার মধ্যে। কোন্ পাখি কী ধরনের খাদ্যে অভ্যস্ত তা স্পষ্ট বোঝা যায় তার ঠোঁট আর নখের গড়ন দেখে, এ বিষয়টি নিয়ে পরে বিশদভাবে আলোচনা করা যাবে। কোনো একটি নতুন অজানা পাখির দেখা পেলে তার সঠিক প্রজাতিটি জানা না থাকলেও সেটি কোন্ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তা নির্ণয় করা খুব কঠিন নয়। বাজপাখির শক্ত আংটার মতো বাঁকানো ঠোঁট, চ্যাপ্টা মাথা, হিংস্র দৃষ্টি আর শক্ত সমর্থ গড়নই তাকে চিনিয়ে দেয় নির্ভুল ভাবে। কাজেই ঐ ধরনের কোনো পাখির দেখা পেলে, তার সঠিক প্রজাতির নাম জানা না থাকলেও তাকে অনায়াসে বাজপাখির গোষ্ঠীভুক্ত করে নেওয়া চলে। ঠিক তেমনিই সানবার্ডদের থাকে সরু লম্বা গড়নের একটু বাঁকানো চঞ্চু, যা দিয়ে ওরা ফুলের ডাঁটা থেকে মধু টেনে নেয়। এই বিশেষ ধরনের ঠোঁট আর শরীরের আকৃতি এবং কিছু কিছু ধরন-ধারণ দেখেই এদের নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত করতে কোনো অসুবিধা হয় না। অবশ্য ভুল হবার সম্ভাবনা যে একেবারে নেই তা নয়, কারণ কখনো কখনো শুধুমাত্র বিশেষ রকমের খাদ্যে অভ্যস্ত হওয়ার জন্যই বিভিন্ন গোষ্ঠীর পাখিদের মধ্যে ঐ ধরনের সাদৃশ্য দেখা যেতে পারে। যেমন প্যারাকিট বা দীর্ঘপুচ্ছ টিয়া আর বাজপাখি দুইয়েরই আছে বাঁকানো আংটার মতো চঞ্চু, কিন্তু প্রথমটি ঐ চঞ্চু দিয়ে ঠুকরে খায় ফল আর দ্বিতীয়টি ঐ চঞ্চুর সাহায্যে

টেনে ছিঁড়ে খায় কাঁচা মাংস। এই দুটি পাখির বর্গ এবং গোষ্ঠী সম্পূর্ণ আলাদা। এই রকমই নতুন জগতের হামিং বার্ড ও পুরোনো জগতের সানবার্ডদের মধ্যে বাইরের চেহারায় আর পুষ্প-প্রীতির ব্যাপারে যথেষ্ট মিল থাকলেও আসলে এরা একেবারে আলাদা আলাদা জাতের পাখি।

গোষ্ঠীর পরবর্তী বিভাগটিকে বলা যেতে পারে গণ (Genus)। খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিশিষ্ট কয়েকটি প্রজাতি নিয়ে গঠিত হয় এক-একটি গণ। যে-সব প্রজাতিগুলির মধ্যে বেশ-কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে তাদের আমরা এক-একটি গণের অন্তর্ভুক্ত করেছি। এক-কালে লিনিয়াস (Linnaeus) এই গণ বিভাগকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন, কিন্তু আধুনিক যুগে গণকে আর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয় না।

কোন্ প্রজাতিকে কোন্ গণের অন্তর্ভুক্ত করা হবে তা নিয়ে অনেক সময়ই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। প্রত্যেকটি প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম বলতে হলে, নামের প্রথমে তার গণ উল্লেখ করতে হয়, বর্তমানে গণের প্রয়োজনীয়তা শুধু এইটুকুই। একই গণের অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের সবারই নামের প্রথম অংশ এক। যেমন কাকেদের মধ্যে বেশ কয়েকটি আলাদা আলাদা প্রজাতি আছে যাদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে তাই এদের সবাইকেই কর্ভাস (corvus) গণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পাখিদের জাতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শেষতম বিভাগ হচ্ছে প্রজাতি (Species)। গণকে বিভিন্ন প্রজাতিতে ভাগ করা হয়। একই জাতের পাখি, যাদের পরস্পরের মিলনের ফলে বংশবৃদ্ধি হতে পারে তারা সবাই একই প্রজাতির অন্তর্গত। এই হিসাবে যে-সব

বুলবুলের শরীরে নিম্নভাগের লালের ছোপ আছে তাদের মধ্যে একটু-আধটু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা সবাই একই প্রজাতির অন্তর্গত। লাল গোঁফওয়ালা বুলবুলরা সব আর-এক প্রজাতি এবং শ্বেতগণ্ড বিশিষ্ট বুলবুলরা আবার আর এক প্রজাতির অন্তর্গত। স্থানীয় জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেক সময়েই পাখিদের আকৃতি, পালকের রঙ ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে, তার ফলে একই প্রজাতির পাখিদের মধ্যেও স্থানভেদে রঙ ও আকৃতিতে কিছু কিছু প্রভেদ চোখে পড়ে। উত্তরাঞ্চলের পাখিরা সাধারণত তাদের দক্ষিণাঞ্চলের জাতভাইদের চেয়ে আকারে বড়ো হয়। একই প্রজাতির পাখিদের মধ্যে যারা আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে বাস করে তাদের পালকের রঙ শুষ্ক অঞ্চলের পাখিদের পালকের রঙের চেয়ে গাঢ়তর হয়ে থাকে। এই-সব প্রভেদ যদি খুব বেশিরকম স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় তখন আবার একটি প্রজাতিকে কয়েকটি জাতি (race) বা উপপ্রজাতিতে (sub species) ভাগ করতে হয়। কিন্তু এই-সব জাতি বা উপপ্রজাতির পাখিদের মধ্যেও পারস্পরিক মিলনের ফলে বংশবৃদ্ধি ঘটা সম্ভব এবং সেই কারণেই এরা সবাই একই প্রজাতি। মোটকথা পাখিদের প্রজাতিই হচ্ছে তাদের চূড়ান্ত পরিচয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোনো পাখির পরিচয় দিতে গেলে প্রথমে নির্দেশ করতে হবে তার বর্গ (order) তারপর দেখতে হবে তার গোষ্ঠী (family)। গোষ্ঠীর পরে নির্দেশিত হবে গণ (genus) এবং সবশেষে বলতে হবে তার প্রজাতি (species) এবং প্রয়োজন হলে ভৌগোলিক জাতি (geographical race)। আজকের পৃথিবীতে যে-সব পাখি দেখা যায় তাদের মোট প্রজাতির সংখ্যা

হল প্রায় 8650টি। স্বাভাবিক ক্রম-অনুসারে যে 27টি বর্গে তাদের ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে পুচ্ছবিহীন ডুবুরী পাখিরা, এদের বিবর্তন হয়েছে সবচেয়ে কম। আর এই শ্রেণীবিভাগের সব থেকে শেষ ধাপে আছে পাসেরিফর্মিস্ বা শাখাচারী পাখিরা, পণ্ডিতদের মতে এদের বিবর্তন হয়েছে সবচেয়ে বেশি। কারো কারো মতে ক্রমবিবর্তনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উঁচুতে স্থান পাওয়া উচিত কাকেদের, আবার কেউ বলেন চড়াই জাতীয় ফিঞ্চ (finch) পাখিদের এ বিষয়ে প্রথম স্থান দেওয়া উচিত।

বর্তমানে ভারতবর্ষে পাখিদের প্রায় 1200 প্রজাতি দেখা যায়, এদের মধ্যে আছে অন্তত 75টি গোষ্ঠী ও 20টি বর্গের পাখি। একটিমাত্র দেশে এত বিচিত্র রকমের পাখি খুব কমই দেখা যায়, আর আমাদের দেশের জলবায়ুর অসীম বৈচিত্র্যের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। উষ্ণ, আর্দ্র গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল থেকে আরম্ভ ক'রে হিমালয়ের তুষার শীতল অঞ্চল, আবার ওদিকে রাজস্থানের শুষ্ক মরুপ্রদেশ আর পাহাড়ী অঞ্চলের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু সবই আছে আমাদের দেশে। গভীর অরণ্য, ছোটোখাটো বনজঙ্গল, উদার উন্মুক্ত প্রান্তর, বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র, সমুদ্রতীর, নদীর বালুচর, পার্বত্য খাড়াই আর আকাশছোঁয়া পর্বতমালা— কোনো কিছুরই অভাব নেই এদেশে। প্রতিটি বিভিন্ন রকমের প্রজাতির রুচি আর পছন্দ অনুযায়ী বাসস্থান আমরা দিতে সক্ষম। কাজেই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রকমের পাখিই কিছু কিছু এদেশে দেখা যায়। কোনো কোনো প্রজাতি সারা বছর ধরেই এখানে বাস করে, আর যাযাবর পাখির দল এখানে এসে কাটিয়ে যায় শুধু

শীতের সময়টুকু। কেবল যে-সব পাখি সম্পূর্ণভাবে নয়া দুনিয়া আর অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী তারাই আমাদের দেশে অনুপস্থিত। তা ছাড়া মেরু অঞ্চলের পেঙ্গুইন জাতীয় পাখিদেরও ভারতে দেখা যায় না।

পক্ষী-বিজ্ঞান ও পক্ষী-নিরীক্ষণ

ইংরাজ-আগমনের পূর্বে এদেশে আধুনিক পক্ষীচর্চার ব্যাপারটা ছিল না বললেই চলে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে কর্মরত বৃটিশ সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কিছু কিছু পাখিদের ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন এবং মোটামুটি একটা শ্রেণীবিভাগ করারও চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় পক্ষীবিজ্ঞানে প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ যিনি করেছেন তাঁর নাম টি. সি. জার্ডন (T. C. Jerdon), 1862-64 খৃস্টাব্দে তাঁর রচিত 'দি বার্ডস্ অফ্ ইণ্ডিয়া' বইটি প্রকাশিত হয়। ডা. জার্ডন ছিলেন সামরিক ডাক্তার, চাকরিসূত্রে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁকে দীর্ঘকাল থাকতে হয়। সেই সময় তিনি বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে এদেশের পাখিদের নিরীক্ষণ ও তৎসম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর বইটিতে, তাঁর নিজের সংগৃহীত যাবতীয় তথ্য তো আছেই, তা ছাড়া ব্রায়ান হজ্সন (Brian Hodgson) ও এডোয়ার্ড ব্লিথ্ (Edward Blyth) নামে আরো দুজন বিখ্যাত পক্ষী-নিরীক্ষকের সূত্রে প্রাপ্ত বহু মূল্যবান তথ্যও আলোচিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে প্রথমজন ছিলেন নেপালের বৃটিশ রেসিডেণ্ট এবং দ্বিতীয়জন কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির জাদুঘরের কিউরেটর রূপে ভারতে এসেছিলেন। জার্ডনের আগে, এবং পরেও, এমন-কি এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও ভারতীয় পক্ষীতত্ত্ববিদ্‌দের প্রধান কাজ ছিল শিকারী আর পাখিধরাদের সাহায্যে পাখি মেরে বা ফাঁদ

পেড়ে ধরে এনে তাদের শ্রেণী আর জাত গোত্র বিচার করা। অবশ্য এর প্রয়োজনও ছিল, কারণ তখন পর্যন্ত বহু পাখিরই নাম আর পরিচয় ছিল অজ্ঞাত, জাদুঘরে গিয়ে তাদের সম্বন্ধে পড়াশুনা করে জানতে হত এবং তাদের নামকরণ করতে হত।

পক্ষী-নিরীক্ষণ ব্যাপারটা এখনো বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি। পাখিদের সম্বন্ধে ভালো ছবি ও বর্ণনা সম্বলিত বই এবং উচ্চমানের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অভাবেও অনেক সময়ে ঠিকমত পাখি চেনা মুস্কিল হত, অন্ততঃ যদি না পাখি সামনে থেকে দেখা যেত।

আগেকার দিনে জাদুঘরের প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌রা মনে করতেন পক্ষী-নিরীক্ষণ ব্যাপারটা ছেলেখেলা করে সময় নষ্ট করা ছাড়া কিছুই নয়, ওটা অলস বড়োলোকদেরই সাজে, বিজ্ঞানের জগতে ওর বিশেষ কিছু মূল্য নেই। কাজেই গুলি করে মেরে পাখির নমুনা জোগাড় করা এবং পাখির ডিম সংগ্রহ, দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় পক্ষী-তত্ত্ববিদ্‌দের এই ছিল প্রধান কাজ। এরই মধ্যে জার্ডনের 'দি বার্ডস্ অফ ইণ্ডিয়া' বইটিতে প্রথম নতুন কথা শোনা গেল। প্রত্যেকটি প্রজাতির আকৃতি, পালক, ডানা ইত্যাদির বর্ণনা ছাড়াও এই-সব পাখিদের আচার-আচরণ, অভ্যাস ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণও এই বইটিতে আছে, আর সেইজন্যই সাধারণ পাঠকের কাছে বইটি সমাদর পেয়েছে। পাখিদের সম্বন্ধে যাঁরা উৎসাহী, পাখি দেখতে যাঁদের ভালো লাগে তাঁদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করল এই বইখানি, এই বই পড়ে অনেকেই শৌখীন প্রকৃতিবিদ্ হয়ে পড়লেন।

ভারতীয় পক্ষীচর্চার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পর্যায় আরম্ভ হল যাঁর হাতে তাঁর নাম অ্যালান অক্‌টেভিয়ান হিউম্ (Allan Octavian Hume)। এই উচ্চপদস্থ বৃটিশ সরকারী কর্মচারী

শুধু যে একজন প্রখ্যাত পক্ষীবিশারদ ছিলেন তাই নয়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন ইনি ছিলেন তাঁদের মধ্যেও একজন। ভারতীয় পক্ষীচর্চার ক্ষেত্রে বহুদিন ধরে হিউমের নেতৃত্ব ছিল অবিসম্বাদিত, সারা দেশময় অজস্র শৌখীন প্রকৃতিবিদ্ ছিলেন তাঁর শিষ্য, কিভাবে মাঠে ঘাটে ঘুরে নানারকম তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, কি করে মৃত পাখির খোলস ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে এ-সব ব্যাপারে হিউম তাঁদের নির্দেশ দিতেন ও উৎসাহ জোগাতেন। তাঁরা যে-সব প্রজাতি সংগ্রহ করতেন হিউম সেগুলি পর্যবেক্ষণ করে সেই-সব প্রজাতির সঠিক নাম ও পরিচয় লিখে রাখতেন এবং প্রকাশ করতেন। এইভাবে বহু নতুন প্রজাতির নাম জানা গেছে: ভারতীয় পক্ষীতত্ত্ব সম্বন্ধে হিউম একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন, এটির নাম ছিল 'স্ট্রে ফেদার্স' (*Stray Feathers*)। এই পত্রিকায় হিউম ও তাঁর শিষ্যদের সংগৃহীত তথ্যগুলি প্রকাশিত হত। 1872 সাল থেকে 1888 সালের মধ্যে এই 'স্ট্রে ফেদার্সে'র 11টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। এই খণ্ডগুলি থেকে পাখিদের সম্বন্ধে মৌলভাবে প্রচুর তথ্য জানা যায়। ভারতীয় পাখিদের নিয়ে যে-কোনো গবেষণামূলক কাজ করতে হলে প্রতি পদেই এই অমূল্য পত্রিকাগুলির সাহায্য অপরিহার্য।

1889 সাল থেকে 1898 সালের মধ্যে ইণ্ডিয়া অফিসের উদ্যোগে (*Fauna of British India*) 'বৃটিশ ভারতের প্রাণীকুল' এই সিরিজের চার খণ্ড পুস্তকে ভারতীয় পাখিদের বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই বইগুলির রচয়িতা ছিলেন ই. ডবলিউ. ওয়েটস্ (E. W. Wates) এবং ডবলিউ. টি. ব্লানফোর্ড (W. T. Blanford)। এঁরা দুজনেই খ্যাতনামা পক্ষীবিশারদ, কিন্তু পক্ষীচর্চা এঁদের কারোই

পেশা ছিল না, এঁদের মধ্যে প্রথমজন ছিলেন পূর্ত বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার ও দ্বিতীয়জন ছিলেন সরকারী ভূতত্ত্ববিদ্। হিউম এবং তাঁর চেলাদের সংগৃহীত যাবতীয় তথ্য এই বইগুলিতে স্থান পেয়েছিল, এবং তখনকার কালের পক্ষে যতটা সম্ভব ঐ-সমস্ত তথ্যকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ও আধুনিক ধরনে শ্রেণীবিভাগ করে নামের তালিকাও প্রস্তুত করা হয়েছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, এই বইগুলিতে সিন্ধু প্রদেশ, কাশ্মীর, আসাম, বাংলা (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ), বর্মা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং সিংহলের পাখিদের নিয়েও আলোচনা করা হয়েছিল। জার্ডনের বইটিতে এই-সব অঞ্চলের পাখিদের খবর বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নি। পক্ষীতত্ত্বের ছাত্রদের কাছে 'দি ফওনা' (*The Fauna*) নামে সুপরিচিত এই বইটির প্রথম সংস্করণে সমগ্র ভারতীয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের পাখিদের বিবরণ পাওয়া যায়। পাখিদের সম্বন্ধে ভালোভাবে জানতে গেলে এই বইটির সাহায্য নিতেই হবে। সে যুগে পক্ষীপ্রীতি যাঁদের মধ্যে দেখা যেত তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন ইংরাজ চা-বাগানওয়ালা এবং সামরিক ও সরকারী কর্মচারী। এঁদের কাছে 'দি ফওনা' বইটি বিশেষভাবে সমাদৃত হল এবং এই বইটির সাহায্যেই ভারতে পক্ষীচর্চা বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল। 'স্ট্রে ফেদার্স'-এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবার পর নব-প্রতিষ্ঠিত 'বম্বে ন্যাচারাল হিস্টরি সোসাইটি'র পত্রিকায় ভারতীয় পাখিদের সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত (বর্তমানে পত্রিকাটির 66তম খণ্ড চলছে) ভারতীয় পাখিদের সম্বন্ধে যা-কিছু উল্লেখযোগ্য রচনা লেখা হয়েছে তার অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকাটিতেই। ক্রমশ

আরো অনেক নতুন তথ্য সংগৃহীত হওয়ায় 1920 সালের শেষের দিকে 'দি ফওনা' বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন অনেকেই অনুভব করতে লাগলেন। সুতরাং 1921 সাল থেকে 1930 সালের মধ্যে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ সমাপ্ত হল, তবে এবার আর চার খণ্ড নয়, সমগ্র বইটি শেষ হল আট খণ্ডে। এই বিরাট কাজ সমাধা করলেন যিনি, তিনিও একজন শৌখীন পক্ষীবিশারদ, নাম ই. সি. স্টুয়ার্ট বেকার (E. C. Stuart Baker)। ইনি ছিলেন ভারতীয় পুলিশ বিভাগের অফিসার, চাকুরিসূত্রে দীর্ঘদিন আসামে থাকতে হয় এঁকে, বিশেষ নিষ্ঠা-সহকারে পাখিদের বাসা বাঁধার অভ্যাস ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করছিলেন ইনি। তা ছাড়া সংগ্রহও করেছিলেন প্রচুর পাখি। এই 'নিউ ফওনা' (*New Fauna*) বইটি শ্রেণীবিভাগ, নামকরণ, ভারতীয় পাখিদের সাধারণ বিবরণ ইত্যাদি সব দিক থেকেই এর পূর্বের সমস্ত বইগুলির চেয়ে অনেক উন্নত ধরনের ও বিজ্ঞানসম্মত হল। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে পক্ষীবিজ্ঞানে যে ভাবে অগ্রগতি হচ্ছে সেইদিকে নজর রেখেই এই বইটি সম্পাদনা করা হয়। ভারতীয় পাখিদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানে কোথায় কোথায় ফাঁক থেকে গেছে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আরো তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন তা এই বইটিতে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং পক্ষীতত্ত্বের উৎসাহী ছাত্রেরা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে কিছুমাত্র বিলম্ব করেন নি। 'নিউ ফওনা' প্রকাশিত হওয়ার পর 35 বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে এই উপমহাদেশে পক্ষীবিজ্ঞানের চর্চা আরো অনেকখানি এগিয়ে গেছে, যাঁরা একে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই অবশ্য ইংরাজ, তবে কিছু কিছু ভারতীয়ও আছেন

এর মধ্যে। বিশেষ করে 1947 সালের পর অনেক ভারতীয়েরও নজর এদিকে পড়েছে। ভারতীয় পক্ষীচর্চার এই যুগের সঙ্গে আরো দুটি নাম বিশেষভাবে জড়িত, এঁরা হলেন হিউ হুইস্লার (Hugh Whistler) এবং ক্লড্, বি. টাইস্হার্স্ট (Claude, B. Ticehurst)। স্টুয়ার্ট বেকারের মতো হুইস্লারও ছিলেন ভারতীয় পুলিশ বিভাগের পদস্থ কর্মচারী আর টাইস্হার্স্ট ছিলেন ডাক্তার। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি রাজকীয় সামরিক চিকিৎসক বাহিনীর ডাক্তাররূপে পশ্চিম ভারত অর্থাৎ এখনকার পাকিস্তানের অনেক জায়গায় কিছুকাল বাস করেছিলেন, এই সময়ই ভারতীয় পাখিরা তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে। 'নিউ ফওনা' প্রকাশিত হওয়ার আগে এবং তার পরেও ভারতীয় পক্ষীতত্ত্ব চর্চায় এই দুই ভদ্রলোকের অবদান যথেষ্ট।

এতদিনে ভারতীয় পক্ষীবিজ্ঞান এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে যে এখন আর, খুব নতুন ধরনের অজানা পাখি ছাড়া, সাধারণ পাখিদের খোলস সংগ্রহ করে বেড়াবার প্রয়োজন নেই। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে প্রচুর পাখির কঙ্কাল ও খোলস এখন পৃথিবীর সমস্ত জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। কিন্তু এখন জাদুঘর আর গবেষণাগার থেকে বেরিয়ে এসে মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াবার সময় এসেছে, অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবন্ত পাখিদের আচার-ব্যবহার চালচলন আর জীবন-যাত্রা প্রণালীর বিষয় আমাদের জানতে হবে। পাখি কেমন ভাবে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়, কি করে সাথী নির্বাচন করে, কেমন কৌশলে বাসা বাঁধে আর সন্তান-পালন করে, পক্ষীজগতের সামাজিক নিয়ম-কানুন কী ধরনের আর

দুনিয়ার কোথায় কত পাখি আছে এই-সব খবরই এখন সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কোন্ পাখি কী খায় এবং সেই হিসেবে তারা মানুষের বন্ধুস্থানীয় না শত্রুস্থানীয় অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ ব্যাপারটা বিচার করে দেখা যেতে পারে। আমাদের দেশ কৃষি-প্রধান, অরণ্যসঙ্কুল এবং ঘনবসতি সমাকীর্ণ, প্রায়ই আমাদের খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হতে হয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে পাখিদের সম্পর্কে ঐ-সব খবর সংগ্রহ করা অবশ্যকর্তব্য এবং জাদুঘরের মরা পাখির কঙ্কাল থেকে এ-সব খবর পাওয়া সম্ভবও নয়। বিভিন্ন প্রজাতির জীবন ইতিহাস সংগ্রহ করা এবং অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিচার করার কাজটি প্রচুর ধৈর্য আর অধ্যবসায়-সাপেক্ষ। এ পর্যন্ত ভারতে খুব অল্প কয়েকটি প্রজাতির জীবন ইতিহাসের ওপর কিছু কিছু কাজ হয়েছে মাত্র। অধিকাংশ পাখির জীবনযাত্রা প্রণালী ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনো একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের এবং অসম্পূর্ণ। কোনো কোনো প্রজাতির জীবন ইতিহাস লিখতে গিয়ে দেখা গেছে অনেক সময় শৌখীন পক্ষী-নিরীক্ষকরাই প্রচুর মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছেন।

পক্ষী-নিরীক্ষণের প্রথম ধাপ হল যে কোনো অঞ্চলের সাধারণ পাখিদের সঠিক ভাবে চিনতে শেখা। অক্ষর পরিচয় ছাড়া যেমন অধ্যয়ন অসম্ভব ঠিক তেমনিই নির্ভুল ভাবে পাখি চিনতে না শিখলে পক্ষীতত্ত্বের চর্চায় এক-পাও এগোনো সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে পক্ষী-নিরীক্ষণের কাজে তিনটি জিনিস অবশ্য-প্রয়োজনীয়। একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র, পাখি চিনতে সাহায্য করবে এমন একটি বই এবং যা-কিছু দেখবেন তা টুকে রাখবার জন্য একটি খাতা।

8×30 অথবা 7×50 মাপের দূরবীক্ষণ যন্ত্রই পাখি দেখবার জন্য সবচেয়ে উপযোগী। যন্ত্রটি এমন হওয়া দরকার যাতে পাখির শরীরের সব-কিছু খুঁটিনাটি যথেষ্ট বড়ো মাপে দেখা যায়, খুব কাছ থেকেও লক্ষ্য করতে কোনো অসুবিধা না হয় এবং বহন করে নিয়ে বেড়াবার পক্ষে যন্ত্রটি যেন খুব বেশি ভারী না হয়। প্রথম প্রথম আশেপাশে যে-সব পাখি চোখে পড়ে বইয়ের সাহায্য নিয়ে সেগুলিকে চিনতে হবে। বর্তমান বইটি সেই কাজের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে মনে হয়। হুইস্লারের 'পপুলার হ্যাণ্ডবুক অফ্ ইণ্ডিয়ান বার্ড্স (*Popular Handbook of Indian Birds*) এবং সালিম আলির 'দি বুক অফ ইণ্ডিয়ান বার্ডস', (*The Book of Indian Birds*) বই দুটিও এর জন্য বিশেষ উপযোগী। শেষোক্ত বইটিতে পাখিদের আকৃতি, বর্ণ ও বিশেষ বিশেষ লক্ষণীয় বস্তু (লম্বা ঠোঁট, পা ইত্যাদি) অনুসারে ছবি এঁকে তালিকা প্রস্তুত করে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া প্রতিটি প্রজাতির রঙিন ছবিও দেওয়া আছে যা থেকে পাখি চেনা খুব সহজ।

পাখি চেনার ব্যাপারে ঠিকমতো খেয়াল করা প্রয়োজন কী কী বিষয় নজরে পড়েছে। যেমন হয়তো সাদায় কালোয় মেশানো একটা ছোট্ট পাখি দেখা গেল, এখন মনে রাখতে হবে পাখিটির শরীরের ঠিক কোন্ অংশে সাদার ছোপ আছে, মাথার ওপর না লেজের ডগায় অথবা নিচের দিকে বুক আর পেটের কাছে। আরো যে-সব জিনিস খুঁটিয়ে দেখতে হবে সেগুলি হল, পাখিটির ঠোঁটের আকার ও রঙ, পায়ের রঙ এবং গঠন আর লেজের গঠন। মাথায় ঝুঁটি আছে কিনা তাও দেখা দরকার। কিন্তু

পাখিরা স্বভাবতই বড়ো চঞ্চল, একটু দেখা দিয়েই হয়তো ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, কাজেই প্রথম দর্শনেই এত-সব খুঁটিনাটি মিলিয়ে দেখা শক্ত, সে ক্ষেত্রে বরং একসঙ্গে সব-কিছু দেখবার চেষ্টা না করে দু-একটা বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়ের ওপরই পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া ভালো। আসল কথা, পাখিটার রঙ বাদামী আর লাল মেশানো, তার সঙ্গে কালো আর ধূসর রঙের ছিটও আছে, এই বর্ণনা দিলে যতটা বোঝা যাবে তার চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা হবে যদি বলা যায়, পাখিটা একটা ময়না পাখির মাপের লাল রঙের পা-ওয়ালা পাখি। তা ছাড়া, আমাদের স্মরণশক্তির ওপর সব সময় খুব বেশি ভরসা করা উচিত নয়। পাখি দেখবার দু-এক ঘণ্টা পরেই আমরা হয়তো তার রঙ ইত্যাদির বিশেষত্ব বেমালুম ভুলে যেতে পারি। কাজেই দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সব-কিছু লিখে ফেলা দরকার এবং এইজন্যই খাতা আর পেন্সিল সর্বদা সঙ্গে রাখতে হবে।

যদি কখনো কোনো পাখিকে অনেকক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করবার সুবর্ণসুযোগ আসে তা হলে যা-কিছু নজরে এল তা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে লিখে ফেলতে হবে। পাখিটির মাপ এবং আকার অন্য একটি পরিচিত পাখির সঙ্গে তুলনা করে লেখা ভালো, তা ছাড়া পাখিটির রঙ, শরীরের কোথায় কী ধরনের ছোপ আছে এবং ঠোঁট, পা, ডানা, পুচ্ছ, গলা এবং সম্ভব হলে চোখেরও রঙ এবং আকৃতি লিখে নিতে হবে। যদি দেখামাত্র পাখিটির একটা ছবি এঁকে ফেলা যায় পেন্সিলের সাহায্যে, তা হলে পরে খুব সুবিধা হবে। পাখিটিকে কোথায় দেখা গেল, মাটির ওপরে না ঘন পাতার ফাঁকে, গাছের গুঁড়ির ওপর না জলের কাছে এবং সেই

সময় পাখিটা কী করছিল এ-সব খবরও লিখে রাখা উচিত। কারণ, ওড়ার বিশেষ ভঙ্গি বা লাফিয়ে লাফিয়ে চলা এই-সব দেখেই অনেক পাখিকে ঠিকমতো চেনবার সুবিধা হয়। পাখির ডাক শুনেও পাখি চেনা যায় কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে পাখির ডাককে ঠিকমতো বর্ণনা করে লিখে রাখা সহজ নয়। তবু যদি এ-বিষয়ে সামান্য কিছু ইঙ্গিতও করা সম্ভব হয়, যেমন, কোন্ পাখি একটি সুতীক্ষ্ণ আওয়াজ করে অথবা শিস্ দেয়, বা ওড়ার সময় কোনোরকম শব্দ করে অথবা কিচ্‌মিচ্ করে ডাকে, এই ধরনের কিছু লিখে রাখলেও পাখি চেনার কাজে খুব সাহায্য হবে। পাখিটি কিরকম পরিবেশে দেখা গেছে এবং কোন্ সময়ে কোন্ তারিখে দেখা গেছে সেটা একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্য। কারণ বছরের একটা বিশেষ সময় ছাড়া যাযাবর পাখিদের দেখা যায় না, পালকের রঙও অনেক সময় নির্ভর করে ঋতুর ওপর, তা ছাড়া বাসভূমি বা পরিবেশের নিখুঁত বর্ণনা পেলে পাখিটির সঠিক পরিচয় খুঁজে বের করা অনেক সহজ হয়ে যায়।

বইয়ের ছবিতে পাখির রঙ যদিও খুব নিখুঁতভাবেই দেখানো হয়ে থাকে কিন্তু তবুও পক্ষীচর্চার ক্ষেত্রে যাঁরা নবাগত তাঁদের প্রথমটা কিছু কিছু অসুবিধা হবেই। প্রথম অভিজ্ঞতায় তাঁরা পাখির রঙ এবং চেহারার সব-কিছু খুঁটিনাটি লক্ষ্য করতে পারবেন বলে মনে হয় না। বিশেষ করে উড়ন্ত পাখির ক্ষেত্রে, আর গাছের পাতার ফাঁকে আলো-ছায়ার লুকোচুরির মধ্যে যে-সব পাখিকে দেখা যায় তাদের সব-কিছু বিশেষত্ব লক্ষ্য করা খুবই কঠিন। এমন-কি খোলা রৌদ্রালোকিত জায়গাতেও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে কারণ খালি চোখে একই রঙ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ

থেকে বিভিন্ন রকম দেখাতে পারে। কাজেই শুধু রঙ দেখে পাখি চেনার চেষ্টা করা উচিত নয়, রঙ ছাড়াও ঠোঁট, পা, ঝুঁটি অথবা লেজ— এদের মধ্যে অন্তত কোনো একটির দিকে একটু বেশি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করা উচিত।

কিছুদিন অভ্যাসের পরই দেখা যাবে পাখি চেনা বেশ সহজ হয়ে এসেছে। মানুষের মধ্যেও যেমন এক পরিবারভুক্ত লোকদের অনেক সময় দেখলেই চেনা যায়, ঠিক সেই রকমই একেবারে অজানা পাখিরও কিছু কিছু ধরন-ধারণ আর অভ্যাস দেখেই অনায়াসে বলে দেওয়া যায় সে কোন্ গোষ্ঠীভুক্ত। ইগ্রেট (egret) গোষ্ঠীর পাখিদের পিছন দিকে ঘাড় হেলিয়ে ওড়ার ভঙ্গি, মাছরাঙা পাখির ঠোঁট, বাজপাখির মাথা ও ঠোঁট এগুলি সব এমন এক-একটি সুস্পষ্ট চিহ্ন যে এই ধরনের বৈশিষ্ট্য যে-সব পাখিব মধ্যে দেখা যাবে তাদের সঠিক প্রজাতিটির নাম না জানলেও, সে কোন্ গোষ্ঠীর অন্তর্গত তা বলে দেওয়া কিছুমাত্র কঠিন হবে না। দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার পর পাখিদেব চলা ও ওড়া দেখেও তাদের পবিচয় বার করা সম্ভব হয়। অনেক প্রজাতির এবং কোনো কোনো পরস্পব-সম্পর্ক-বিশিষ্ট প্রজাতির ওড়া আর হাঁটাচলার মধ্যে একটা বিশেষ ভঙ্গিমা ও সাদৃশ্য ফুটে ওঠে, তাই দেখে তাদের চেনা যায়। যে-কোনো ফ্লাইক্যাচার কোনো উড়ন্ত পতঙ্গ দেখলেই ঠিক একটা বিশেষ ভঙ্গিতে তার দিকে তেড়ে যাবেই, পাখিটিকে যদি ভালো করে নাও দেখা যায়, দূব থেকে তার সেই ওড়ার বিশেষ রঙটি দেখেই বোঝা যাবে ওটি ফ্লাইক্যাচার। তেমনি ছোট্ট (wren-warbler) ফুট্কি পাখিকে চেনা যায় তার ঝাঁকুনি দিয়ে ওড়ার ভঙ্গি দেখে। বম্বের ন্যাচারাল

হিস্টরি সোসাইটি এবং কলকাতার জুলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার সংগ্রহশালায় যে-সব নমুনা সংরক্ষিত আছে সেগুলি দেখেও উৎসাহী পক্ষী-নিরীক্ষকেরা অনেক দুষ্প্রাপ্য ও ভবঘুরে জাতীয় পাখির নাম ধাম বংশপরিচয় ইত্যাদি জানতে পারবেন।

কোনো একটি পাখির বাসা যদি খুব ভালো করে দেখবার সুযোগ পান তা হলে সেই পাখিটির সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হবে। কিন্তু পাখির বাসাটির ওপর নজর রাখতে হবে খুব সাবধানে, কাক বা ঐ জাতীয় অন্য কোনো ডাকাতে পাখি বা অন্য প্রাণী যেন বাসাটির সন্ধান না পায়। পাখির ডিম বা সদ্যোজাত বাচ্চাগুলিকেও হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করা উচিত নয়। বলা হয় যে, মানুষের ছোঁয়া লাগা বাচ্চাকে পক্ষীদম্পতি নাকি আর লালনপালন করে না, কথাটা কিন্তু একেবারেই সত্যি নয়। কিন্তু তবু পাখির বাচ্চাদের হাত দিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভালো, কারণ এরা বড়ো সুকুমার জীব। যদি কখনো কোনো আহত পাখিকে শুশ্রূষা করতে হয় তা হলে খুব যত্নের সঙ্গে ঠিকভাবে পাখিটিকে নাড়াচাড়া করতে হবে। করতলের ওপর ডানা দুটি দুপাশে রেখে তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দিয়ে গলার দুটি পাশ আলগাভাবে ধরতে হবে। কোনো কোনো ছোটো পাখি এতই ক্ষীণজীবী যে বুকের ওপর সামান্য চাপ পড়লেই তাদের মৃত্যু ঘটতে পারে। কোনো পাখিকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখতে হলে তাকে করতলের ওপর উল্টে শুইয়ে রাখলে সুবিধা হয়, কারণ উল্টে রাখলে পাখিরা একদম নড়াচড়া করে না। পরীক্ষা শেষ হলে এটিকে সোজা করে পূর্বে যেভাবে [illegible] হয়েছে সেইভাবে ধরে উড়িয়ে দিতে হবে।

প্রত্যেক পক্ষী-নিরীক্ষকই যে পাখিদের বিষয়ে নিত্য নতুন চমকপ্রদ আবিষ্কার করে ফেলতে পারবেন তা নয়, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে পাখি দেখতে দেখতে পাখিদের সঙ্গে সত্যিই একটা যেন ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পাখি দেখার শখ যাঁদের আছে তাঁরা যে-কোনো সময়ে যে-কোনো অবস্থায় পক্ষীচর্চার মাধ্যমে প্রচুর আনন্দ লাভ করতে পারেন।

প্রজনন

সব পাখি'দের জীবনেই বাৎসরিক সন্তান উৎপাদন পর্বটি বেশ একটু দুশ্চিন্তাজনক সময়, কারণ এই সময় এদের বহু বাধাবিঘ্ন ও বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, বিশেষ করে যে-সব পাখিদের বাসা বাঁধার আগে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আসতে হয় তাদের বিপদের আশঙ্কা থাকে আরো বেশি। বাসা বাঁধতে উদ্যত পক্ষী পরিবারের অবস্থা বড়ো অসহায়, এই সময়ই এদের সাহায্যের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। বাসাটিকে শত্রুর দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখার জন্য উপযুক্ত আচ্ছাদন চাই, বাসা বানানোর উপকরণ চাই, তারপর ডিম আর সদ্যোজাত বাচ্চাগুলিকে সুস্থ রাখার জন্য চাই প্রয়োজনীয় উষ্ণতা। বাচ্চাদের পেট ভরাবার মতো প্রচুর খাদ্যের সংস্থান থাকা চাই আশেপাশে, এবং সেই খাদ্য সংগ্রহ করে আনার জন্য চাই দীর্ঘস্থায়ী দিবালোক। মোটের উপর এই সময়ে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ হল খাবার সংগ্রহ করা। বছরের যে সময়টা প্রচুর খাবার পাওয়া যায়, অন্য একটু আধটু অসুবিধা থাকলেও, পাখিরা সেই সময়টাই বেছে নেয় বাসা বাঁধার জন্য। বোম্বাই অঞ্চলের ছোটো পাখিরা ঠিক এই কারণেই বর্ষাকালে বাসা বাঁধে। প্রতি মুহূর্তেই দমকা হাওয়া আর বৃষ্টির ঝাপটায় বাসা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও ওরা বাসা বাঁধার জন্য এই সময়টাই বেছে নেয় এটা সত্যিই ভারি আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু বছরের এই সময়টিতেই দেখা দেয় অজস্র পোকা-মাকড়, কীট পতঙ্গ যারা পাখিদের জন্য

একেবারে 'তৈরি খাবার'। এই খাদ্যসম্ভারের প্রাচুর্যের জন্যই ওরা বর্ষার বৃষ্টিকেও গ্রাহ্য করে না। অবশ্য শীতপ্রধান দেশগুলিতে প্রায় সমস্ত পাখিরই ডিম পাড়ার সময় বসন্ত এবং গ্রীষ্মকাল, কারণ ঐ সময়েই আবহাওয়া থাকে সবচেয়ে অনুকূল। এখানেও লক্ষ্য করে দেখা গেছে, কোনো একটি বিশেষ ধরনের পোকা যদি একটি বিশেষ প্রজাতির পাখির প্রিয় খাদ্য হয়, তা হলে বছরের ঠিক যে সময়টিতে ঐ পোকারা দেখা দেয় সেই সময়টিই হবে ঐ বিশেষ প্রজাতির পাখিদেরও বাসা বাঁধা আর ডিম পাড়ার সময়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে খাদ্য যখন সহজলভ্য এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাও যথাসম্ভব অনুকূল সেইরকম সময় বুঝেই প্রতিটি প্রজাতি তাদের ডিম পাড়ার সময় নির্বাচন করে। ঠিক সময় অনুসারেই তাদের শারীরিক অবস্থাও প্রজননের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। এমন অনেক পাখি আছে যারা অনুকূল আবহাওয়া না পেলে সে বছর ডিম পাড়বেই না। বর্ষার ঠিক পরেই কচ্ছের রাণে ফ্লেমিংগো পাখিরা ডিম পাড়ে, কিন্তু এরা ভারি খুৎখুতে পাখি, ঠিক নিজেদের পছন্দমতো আবহাওয়াটি না পেলে কিছুতেই বাসা বাঁধতে রাজি নয়। কাজেই যে বছর অতিবৃষ্টি কিম্বা অনাবৃষ্টি হয় সে বছরে এদের ডিম পাড়াও বন্ধ।

এদের প্রজননের ঋতু যখন এগিয়ে আসে তখন পুরুষ পাখির দেহে দেখা দেয় বিশেষ ধরনের পালকের বাহার। এই সময় নতুন পালক গজাতেও পারে আবার পুরোনো পালকেই নতুন কোনো বর্ণচ্ছটা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এও দেখা যায়। যেমন, এক জাতের বকেদেরও এই সময় মাথায় আর গলায় দেখা দেয় কমলা রঙের ছোপ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরোনো পালকই আবার

নতুনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠে পুরুষ পাখিটির রূপকে আকর্ষণীয় করে তোলে। পুরুষ পাখিদের কণ্ঠেও এই সময় শোনা যায় নতুন ধরনের ডাক। সারা বছর ধরে ওরা যেভাবে ডাকাডাকি করে তার সঙ্গে এই বিশেষ ধরনের ডাকের যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে তা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলেই বোঝা যায়। প্রিয় সঙ্গিনীর প্রতি আহ্বান ধ্বনিত হয়ে ওঠে এই বিশেষ ডাকটির মধ্যে দিয়ে। তাই প্রজনন পর্বে এই ডাকটির যথেষ্ট মূল্য আছে। অনেক সময়েই দেখা যায় গাইয়ে পাখিদের সুন্দর কণ্ঠস্বর শুধু গান করা ছাড়াও অন্য অনেক জরুরি প্রয়োজনে লাগে। আগে লোকের ধারণা ছিল পুরুষ পাখির সুরেলা কণ্ঠস্বর বুঝি শুধু স্ত্রী পাখিকে আকর্ষণ করবার জন্যই প্রয়োজন হয়, কিন্তু আসলে নিজের অধিকার সাব্যস্ত করা বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিজের এলাকা থেকে তাড়ানো এ-সব কাজেও পুরুষ পাখি বিশেষ ধরনের আওয়াজ করে ডাকতে পারে। পুরুষ পাখির গলার মিঠে সুর স্ত্রী পাখিকে কতখানি মুগ্ধ করে তা অবশ্য ঠিক জানা নেই, কিন্তু এ-কথা ঠিক যে সঙ্গিনীহীন পুরুষ পাখি যখন ঘর বাঁধার একটি মনের মতো জায়গা খুঁজে নিয়ে আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করে যোগ্য সঙ্গিনীর জন্য সেই সময় তার কণ্ঠে যে সুর শোনা যায় তার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের অস্তিত্বের কথা আশেপাশে জানান দেওয়া। ছোটোখাটো গাইয়ে পাখিরা জানে যে এক জায়গায় এক জোড়ার বেশি পাখি বাসা বাঁধলে খাবার-দাবারে টান পড়তে পারে। সেইজন্যই পুরুষ পাখি নিজের মনের মতো জায়গাটি খুঁজে পেলেই সেখান থেকে অন্য পুরুষ পাখিদের রীতিমত লড়াই করে তাড়িয়ে দেয়। এইরকম ক্ষেত্রে পুরুষ পাখির উঁচু গলার ডাক একটি শক্তিশালী অস্ত্র। যে-সব পাখিরা কোনো কালেই

গান গায় না তাদেরও ডাকাডাকির মাত্রা বেশ বেড়ে যায় প্রজননের ঋতুতে। স্টর্ক পাখিদের গলার পেশীগুলি এমন যে গান গাওয়া তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব কিন্তু তারাও এইসময়ে ঠোঁটের সাহায্যেই একরকম আওয়াজ করে।

পাখিদের মধ্যেও পূর্বরাগের পালাটি বেশ ভালোভাবেই চলে। সঙ্গিনীর হৃদয় জয় করতে ময়ূর কেমন পেখম মেলে নাচে তা তো সবাই দেখেছেন। ময়ূর অবশ্য পাখি বা মানুষ যাকে সামনে পায় তাকেই মুগ্ধ করতে নাচ জুড়ে দেয়, কখনো কখনো একেবারে একলা নিজের মনেই নাচে। পুরুষ নীলকণ্ঠ পাখি, স্ত্রী পাখিকে মুগ্ধ করবার জন্য তার সামনে শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে নানারকম কসরৎ দেখায় আর টিয়া পাখিরা পূর্বরাগ পর্বে ভারি মজার মজার অঙ্গভঙ্গি করে থাকে, ওরা একপায়ে খাড়া হয়ে সঙ্গিনীকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করে। কিছু কিছু পুরুষ পাখি আছে যারা স্ত্রী পাখিদের সামনে নিজেদের সমস্ত পালকের বাহার মেলে দিয়ে খুব ভারীক্কি-চালে পায়চারি করে বেড়ায়। আবার এমন পাখিও আছে যারা খুব শান্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে পূর্বরাগের পালা চালায়। বাবুইদের (Bayas) মতো পাখিদের ক্ষেত্রে বাসাবাঁধার কাজটিই পূর্বরাগের একটা অঙ্গ হয়ে ওঠে, যে পুরুষ পাখির তৈরি বাসা স্ত্রী পাখির সবচেয়ে পছন্দ হয় তাকেই বরণ করে নেয় স্ত্রী পাখিটি। সুস্বাদু পোকা বা অন্য খাবার-দাবার দিয়েও সঙ্গিনীকে খুশি করবার চেষ্টা অনেক প্রজাতিই করে থাকে। পুরুষ পাখির সেই সময়কার ঐকান্তিক আগ্রহের সুযোগ নিয়ে স্ত্রী পাখি প্রায়ই তার কাছ থেকে যথেষ্ট ভালো ভালো খাবার আদায় করে নেয়।

পূর্বরাগের পরবর্তী অধ্যায় হল বাসাবাঁধার পালা। কখনো

দুজনে মিলেই বাসাবাঁধার কাজে নামে কখনো বা শুধু পুরুষ পাখিটি অথবা শুধু স্ত্রী পাখিটিকেই বাসা তৈরি করতে দেখা যায়। সাধারণত পাখিরা যে ধরনের পরিবেশে থাকতে অভ্যস্ত সেই ধরনের জায়গাতে বাসা বাঁধে। ঈগল পাখি উঁচু জায়গায় থাকতে ভালোবাসে তাই তার বাসা সব সময় দেখা যায় সুউচ্চ খাড়া পাহাড়ের গায়ে, পর্বতচূড়ার কাছাকাছি। যে-সব পাখি গাছপালা ভালোবাসে তাদের বাসা থাকে গাছের ঘন পাতার আড়ালে আর তিতির, বটের প্রভৃতি যে পাখি মাটির ওপরই বেশি সময় ঘুরে বেড়ায় তারা ডিমও পাড়ে মাটির ওপরেই। বক, পানকৌড়ি প্রভৃতি জলচর পাখিরা বাসা বাঁধে জলের কাছাকাছি। বাসা বাঁধার সাধারণ নিয়ম যদিও এই, কিন্তু এর অজস্র ব্যতিক্রমও আছে, দু-একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে— মৌমাছিভুক পাখি মোটেই মাটির ওপর বেশিক্ষণ থাকে না, কিন্তু তারা নদীর ধারের মাটির তলায় লম্বা সুড়ঙ্গের মতো বাসা বানায়, আবার অনেক হাঁসেদের বাসা বাঁধতে দেখা যায় গাছের ডালে। বিভিন্ন পাখির বাসার আকার আর গঠনের মধ্যে বৈচিত্র্য যে কত রকম তার আর সীমা পরিসীমা নেই। মাটিতে বসবাসকারী পাখিরা কেউ কেউ সামান্য একটু মাটি খুঁড়ে ছোটো একটা গর্ত বানিয়ে তারই মধ্যে ডিম পেড়ে রাখে আবার ওদিকে বাবুই পাখিদের বাসা বাঁধা একটা বিরাট পর্ব, সুন্দর করে বোনা বাসার মধ্যে ওরা আবার ডিমগুলিকে সযত্নে রাখবার জন্য একটি আলাদা ঘর তৈরি করে, সেটি থাকে বাসার ভিতরের দিকে, সেই ঘরটির বুননি এমন চমৎকার যে দেখলে মনে হবে সত্যিই কোনো সুদক্ষ কারিগরের হাতের কাজ। অনেক পাখিই মরা-গাছের ডালের কোটরে বা

দেওয়ালের কোনো ফুটোর মধ্যে নরম ঘাস পাতা জাতীয় জিনিস বিছিয়ে বাসা তৈরি করে। কেউ কেউ লম্বা সুড়ঙ্গের মতো বাসা বানায় আবার গাছের ডালে ঘাস পাতা শুকনো কাঠি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি থলের মতো বাসাও অনেক দেখা যায়। জাসানাদের (Jasana) মতো কোনো কোনো জলচর পাখি জলজ উদ্ভিদের ভাসমান পাতার ওপরেই যেমন তেমন করে একটা বাসা বেঁধে কাজ সারে। আগেই বলা হয়েছে কোনো কোনো প্রজাতি বাসা বাঁধবার আগে খুব ভালো করে দেখে নেয় ধারে কাছে আরো কোনো জাত-ভাই বাসা বেঁধেছে কিনা, এরা এক জায়গায় দু জোড়া পাখি কখনো বাসা বাঁধবে না, আবার এমন পাখিও আছে যারা বহু পাখি কাছাকাছি বাসা বেঁধে একসঙ্গে থাকতে ভালোবাসে। দল বেঁধে বাস করা অনেক নিরাপদ এটা ঠিক কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে দরজী পাখি অর্থাৎ টুনটুনি এবং রবীন পাখিদের মতো ছোটোখাটো সুকুমার পাখিরাই একলা থাকতে ভালোবাসে বেশি, গাছপালার আড়ালে আত্মগোপন করে এরা নিজেদের নিরাপদ রাখে আর সারস বক প্রভৃতি বড়ো বড়ো শক্ত সমর্থ পাখিরা থাকে দলবদ্ধ ভাবে। অবশ্য এর একটা কারণ হয়তো এই যে ছোটো পাখিরা বেশি দূর উড়তে পারে না, ওদের খাবার খুঁজে নিতে হয় বাসার আশপাশ থেকেই, আর সেইজন্যই ওরা চায় না যে ওদের বাসার আশেপাশে খাদ্যের আরো ভাগীদার জুটুক। অপর পক্ষে বড়ো পাখিরা খাবারের খোঁজে বহুদূর পর্যন্ত ঘোরাফেরা করতে সক্ষম, কাজেই তাদের পক্ষে আশেপাশে খাবারের ভাগীদার থাকলেও বিশেষ কিছু যায় আসে না।

ডিমে তা দেওয়া আর বাচ্চাদের আহার জোগানোর কাজটা

পক্ষীদম্পতি ভাগাভাগি ক'রে নেয়, তবে এই ভাগাভাগির অনুপাতটা সব প্রজাতির মধ্যে একরকম নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পক্ষীদম্পতি কাজ একেবারে সমান ভাগ করে নেয়, কোথাও কোথাও স্ত্রীপক্ষীই এই-সব দায়িত্বের বেশির ভাগ সামলায় আবার জাসানা (Jasana) বা রঙিন কাদাখোঁচাদের (Painted Snipe) মতো ব্যতিক্রমও আছে যাদের মধ্যে পুরুষপাখিরাই সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে থাকে। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বাচ্চাদের লালনপালনের জন্য পক্ষীদম্পতিকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। হিসেব করে দেখা গেছে ডিম ফুটে বের হবার পর প্রথম কয়েকদিন পাখির বাচ্চারা প্রতিদিন তাদের নিজের ওজনের ডবল খাবার খায়। ওরা বাড়ে খুব তাড়াতাড়ি, তবে প্রথম কয়েকদিনের পর বাচ্চাদের আর ওরকম রাক্ষুসে খিদে থাকে না। ডিম ফুটে বাচ্চা বার হওয়ার পর প্রথম এক সপ্তাহ পক্ষীদম্পতি উদয়াস্ত খাবার খুঁজে বেড়ায় কিন্তু তবু বাচ্চাদের খাই খাই থামাতে পারে না। পক্ষীশাবকদের জীবন বড়ো বিপদসঙ্কুল। লুঠেরা দস্যু প্রাণীদের উৎপাত আছেই, তা ছাড়াও আছে নানা রকম দুর্ঘটনার আশঙ্কা। তার ওপর কোনো বাচ্চা যদি অন্য-গুলির চেয়ে বেশি দুর্বল হয় তা হলে অন্য ভাইবোনেদের কাড়া-কাড়ির ফলে তার ভাগ্যে খাবার খুব কমই জোটে। দুর্বল বাচ্চাটির অন্যদের চাপে পিষ্ট হয়ে যাবার বা বাসা থেকে পড়ে যাবার ভয়ও থাকে যথেষ্ট। ইঁদুর, বেরাল, গিরগিটি, সাপ, কাক ও অন্যান্য পাখিরা পক্ষীশাবকদের মারাত্মক শত্রু, তা ছাড়া ঝড়-বৃষ্টি এ-সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো আছেই। এই-সব কারণে অনেক প্রজাতিই অনেকবার অনেকগুলি করে ডিম পাড়লেও শেষ

পর্যন্ত তার মধ্যে অল্পই বেঁচে থাকে, ফলে তাদের সংখ্যাও বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। হাঁসেদের মতো বড়োসড়ো অধিকতর সবল পাখিরা স্বভাবতই এক এক ঋতুতে অনেকগুলি করে বাচ্চার জন্ম দেয়। যদি ডিম বা বাচ্চা ভরা একটি বাসা কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায় তা হলে পক্ষীদম্পতি শোক করতে বসে না, তৎক্ষণাৎ পরবর্তী বাসা বাঁধার কাজে লেগে যায়।

এই অধ্যায়ের গোড়াতেই বলা হয়েছে অন্য সব প্রাণীদের মতো পাখিদের মধ্যেও বংশবৃদ্ধির সহজাত প্রবৃত্তি খুবই প্রবল, আর এই কর্তব্য পালনে তারা যে ভাবে সব রকম বাধা-বিপত্তিকে জয় করে তা দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়।

প্রব্রজনবৃত্তি

পাখিদের প্রব্রজনবৃত্তি পক্ষীবিজ্ঞানের এক অন্যতম বিস্ময়। এ রহস্যের কোনো সমাধান আজও হয় নি। প্রতি বছর বসন্ত আর শরৎ এই দুই ঋতুতে পাখি ডানায় ভর করে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনন্ত আকাশের বুকে— মহাসাগর, মহাদেশ পার হয়ে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসে পৌঁছয় একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে। কেন আসে ওরা? কী ওদের আসতে বাধ্য করে? কেন ওরা এই সুদীর্ঘ পথের সমস্ত বিপদ আপদ মাথায় তুলে নেয়? পথের নির্দেশই বা ওরা পায় কোথা থেকে? যদিও প্রব্রজনশীল পাখিদের নিয়ে অনেক রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ওদের সম্বন্ধে এখন আমরা অনেক কথা জেনেছি, কিন্তু ঐ-সব মূল প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তর আজও পাওয়া যায় নি।

পাখিদের এই প্রব্রজন সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে ওদের আসা ও ফিরে যাওয়ার গন্তব্যস্থল এবং সময়ের নড়চড় হয় না। প্রতি বছর ঠিক কখন ওরা আসবে আর কখন ফিরে যাবে তার তারিখ পর্যন্ত আগে থেকে বলে দেওয়া যায়, বড়োজোর সপ্তাহখানেক এদিকে ওদিকে হতে পারে, তার বেশি কখনই নয়। এই-সব পাখিদের শীতকালীন, আবাসস্থল আর গ্রীষ্মকালীন আবাসস্থলের মধ্যে দূরত্ব অনেক সময়ই বেশ কয়েক হাজার মাইল, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ওরা ঠিক সেই একই বাগানে বা একই মাঠে আবার ফিরে আসবে সুনিশ্চিত ভাবে।

এই প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটা প্রথমেই মনে আসে সেটা হল পাখিদের মধ্যে কোন্ কোন্ প্রজাতি এইরকম দূরদেশে পাড়ি দেয় কিন্তু অন্য প্রজাতিরা দেয় না কেন? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হচ্ছে প্রাণ বাঁচাবার জন্যই এরকম ভাবে স্থান পরিবর্তন করতে হয়, অন্যদের ক্ষেত্রে তার দরকার হয় না। কিন্তু এটাও দেখা যায় যে কোনো প্রজাতির কিছু সংখ্যক পাখি হয়তো স্থান ত্যাগ করল কিন্তু বাকিরা থেকে গেল সেই একই জায়গাতে। এ রকম ক্ষেত্রে শুধু প্রাণ বাঁচানোর তাগিদেই ঐ কিছু সংখ্যক পাখি দূর পথে পাড়ি দিচ্ছে এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়।

কূট (Coot) আর স্পুন বিল (Spoon bill) পাখিদের মধ্যে এই ব্যাপার যথেষ্ট দেখা যায়। এদের মধ্যে কিছু অংশ প্রতিবছর নিয়মিত ভাবে স্থান পরিবর্তন করে, অন্যেরা থেকে যায় সেই একই জায়গাতে, এবং বেশ সুস্থই থাকে, তাদের কিছু অসুবিধা হচ্ছে বলে মনেও হয় না।

উত্তর গোলার্ধে শরৎকালে উত্তরাঞ্চলের পাখিরা কিছুটা দক্ষিণে চলে আসে এবং উঁচু পার্বত্য অঞ্চলের পাখিরা নেমে আসে সমতলে। দক্ষিণ গোলার্ধে হয় ঠিক এর উল্টোটা, সুদূর দক্ষিণ অঞ্চলের শীতের হাত থেকে রক্ষা পেতে পাখিরা কিছুটা উত্তরে চলে আসে। অধিকাংশ পাখিই প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ এড়াবার জন্যই অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে উড়ে আসে এবং শীত শেষ হয়ে গেলেই তারা আবার ফিরে যায় তাদের জন্মভূমিতে— এটা বুঝতে কিছু অসুবিধা হয় না।

পাখিরা তাদের জন্মস্থানে ফিরে যায় ঠিক গ্রীষ্মের মুখে, গাছে গাছে যখন নতুন পাতা আর ফুলের সমারোহ, মাটিতে যখন প্রচুর

পোকামাকড়, অর্থাৎ পাখিদের পরিবার-পোষণের মতো পর্যাপ্ত খাদ্য— তখন মেলে। গ্রীষ্মের শেষের দিকে পাখিদের বাচ্চারা বেশ বড়োসড়ো হয়ে স্বাধীনভাবে উড়তে শিখে যায়, তারপর আবার শরতে ঠাণ্ডা আমেজ অনুভূত হবার ঠিক আগেই পাখিরা প্রস্তুত হয়ে নেয় উষ্ণ আবহাওয়ার দেশে পাড়ি জমাবার জন্য। কোনো কোনো পাখি তাদের জন্মভূমিতে থাকে খুবই অল্পদিন। যেমন ধরা যাক টিলইয়ার (Tilyer) বা রোজি প্যাস্টর (Rosy Pastor)-দের কথা, এদের জন্মভূমি মধ্য এশিয়া, এরা ভারত থেকে রওনা হয় মে মাসে, আবার আগস্ট মাসের মধ্যেই ফিরে আসে ভারতবর্ষে। তবে অন্য পাখিরা এত তাড়াতাড়ি ফিরতে পারে না। তারা সাধারণত মার্চমাসে বিদায় নেয় আর সেপ্টেম্বরে আবার আসে। যা হোক, কিছু কিছু পাখির পক্ষে এইভাবে সুদূর পথ পাড়ি দিয়ে স্থান পরিবর্তন যে সত্যিই প্রয়োজনীয় তা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু যখন দেখা যায় কোনো কোনো পাখি বাসাবাঁধার জন্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রায় একই অক্ষরেখা ধরে এমন জায়গায় চলে আসে যেখানকার জলবায়ুর অবস্থা ঠিক তার ছেড়ে আসা স্থানটির মতোই তখন সত্যিই ভারি অদ্ভুত লাগে। আবার অনেক পাখি মাত্র কয়েক মাইল দূরে উড়ে গিয়ে স্থান পরিবর্তন করে, এতে যে তাদের কী উপকার হয়, কেন এর প্রয়োজন, তার কিছুই কারণ বোঝা যায় না। যেমন দেখা যায়, বোম্বাই অঞ্চলের ওরিওল (Orioles) আর মৌমাছিভুক (Bee eaters) পাখিরা বর্ষার প্রারম্ভেই শহর এলাকা ছেড়ে দাক্ষিণাত্যের মালভূমির দিকে উড়ে যায়, আবার ঠিক নিয়মিত ভাবে সেপ্টেম্বরে মাসের গোড়াতেই ফিরে আসে বোম্বাই অঞ্চলে। প্রচুর পাখি এইভাবে কাছাকাছির

মধ্যেই স্থান পরিবর্তন করে, কিন্তু তা ছাড়া আর এদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই আমরা এখনো জানতে পারি নি। বহুসংখ্যক পাখিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তবেই এদের গতিবিধি সম্বন্ধে সঠিক খবর সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

যাযাবর পাখিদের ক্ষেত্রে আরো একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে যার কোনো মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ যাযাবর পাখিই একটা নির্দিষ্ট স্থানে চলে আসে ডিম পাড়বার প্রয়োজনে, আবার সেখান থেকে পূর্বের জায়গাতেই ফিরে যায়, কখনো হয়তো যাত্রাপথের সামান্য একটু অদল বদল করে. কিন্তু ওদের মধ্যেও এমন অনেক দুঃসাহসী পাখি আছে যারা ইচ্ছে করেই যাত্রাপথের জটিলতা বাড়িয়ে তোলে। একজায়গায় এসে ডিম পেড়ে বাচ্চাদের বড়ো করে, সব কর্তব্য সমাপণ করে আবার আর-এক নতুন জায়গায় উড়ে যায় ছুটি উপভোগ করতে। তারপর শীতকালীন আবাসে ফেরার পথেও ওরা ওদের প্রজনন পূর্ব স্মৃতিতে ভরা জায়গাটি আর-একবার দেখে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পাখিদের গতিবিধির মধ্যে এমন অনেক বৈচিত্র্য আছে যা সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে মোটামুটি ভাবে এইটুকুই বলা যায় যে পাখিরা অনুকূল আবহাওয়া অনুযায়ী বছরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আলাদা আলাদা জায়গায় থাকতে ভালোবাসে এবং তাদের এই আসা-যাওয়ার সময়ের কখনো একটুকু নড়চড় হয় না।

দীর্ঘ পথের যাত্রা শুরু হওয়ার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই যাযাবর পাখিদের মধ্যে প্রস্তুতির সাড়া পড়ে যায়। ওরা প্রচুর পরিমাণে আহার করতে আরম্ভ করে কারণ, দীর্ঘ পথের ধকল সহ্য করতে হলে শরীরে কিছুটা বাড়তি চর্বি থাকা প্রয়োজন।

অনেকে আবার দল বেঁধে প্রায় এক ধরনের ব্যূহ রচনা করে ওড়ার অভ্যাস করতে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যাযাবর পাখিরা যাত্রার সঙ্কেত বুঝে নেয় সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দেখে। দীর্ঘ পথে সূর্যই ওদের দিক্‌দর্শন যন্ত্র, আকাশের কোন্ দিকটি থেকে সূর্য উঠেছে তাই দেখেই ওরা যাত্রাপথ ঠিক করে নেয়। তাই অনেক সময় ঘন কুয়াশায় পাখিরা পথ ভুল করে, কিন্তু সূর্যের মুখ দেখতে পেলেই আবার তাদের গতিপথ ঠিক করে নিতে দেরি হয় না। জমির ওপর যদি কোনো বিশেষ নিশানা বা চিহ্ন থাকে তা হলে সেদিকেও ওরা নজর রাখে অবশ্য, কিন্তু ওদের যাত্রাপথের আসল দিশারী হল দিনে সূর্য আর রাতে আকাশের তারা। পাখিরা সাধারণত 600 মিটার থেকে 1300 মিটার উচ্চতায় ওড়ে, কাজেই জমির ওপরের ছোটোখাট চিহ্ন ওদের চোখে পড়বার কথা নয়, তার জমির ওপরের কোনো চিহ্নের ওরা যে বিশেষ পরোয়া করে না তাও বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়, কারণ প্রায়ই দেখা যায়, অনেক প্রজাতির তরুণ পাখিরা, যারা সেই প্রথম লম্বাপথে পাড়ি দিয়েছে তারাই গন্তব্যস্থলে তাদের বাবা-মাদের থেকে আগে পৌঁছে যায়। কাজেই কোনো সহজাত প্রত্যয়ের বলেই যে ওরা সূর্য দেখে পথ ঠিক করে নেয় এ কথা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

কোনো কোনো প্রজাতি অবশ্য একলা উড়তেই ভালোবাসে কিন্তু অধিকাংশ পাখিই বড়ো বা ছোটো ছোটো দল বেঁধে ওড়ে। অনেক ছোটো পাখি, যারা এমনিতে নিশাচর নয়, তারাও রাত্রিতে ওড়াই পছন্দ করে। খুব সম্ভব রাত্রে শত্রুর আক্রমণ থেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বলেই এরা দূরপাল্লার পথে চলে রাত্রের অন্ধকারে।

ছোটো পাখিরা একদিনে সাধারণত 8 ঘণ্টা ওড়ে এবং এদের গতি ঘণ্টায় প্রায় 30 কিলোমিটার। কাজেই এরা দিনে প্রায় 250 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারে। অবশ্য বড়ো পাখিরা ঘণ্টায় প্রায় 80 কিলোমিটার পথ অনায়াসেই উড়তে পারে, কাজেই ওরা একদিনে আরো অনেক বেশি পথ অতিক্রম করে থাকে। সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়তে হলে অনেক সময় ক্লান্ত হলেও নামার উপায় থাকে না, তখন কোনো কোনো পাখির দলকে একবারও না থেমে একটানা 36 ঘণ্টাও উড়তে দেখা গেছে। এই-সব উড়ন্ত পাখির দলকে অনেক সময়েই প্রচণ্ড বাতাস আর দুর্যোগময় আবহাওয়ার মুখে পড়তে হয়, বিশেষ করে মাটিতে নামার সময় যদি পাখিরা ঝড়বৃষ্টির মুখে পড়ে তা হলে বহু পাখিকে প্রাণ হারাতে হয়। মোটের ওপর এইরকম দূরপাল্লার যাত্রা পাখিদের পক্ষে যথেষ্ট কষ্টকর তো বটেই, এমন-কি, যথেষ্ট বিপজ্জনকও।

সাধারণত কত পাখি এই প্রব্রজন অবলম্বন করে তার হিসেব রাখা বেশ কঠিন। দেখা গেছে ইউরোপের এবং এশিয়ার উত্তরাঞ্চলের পাখিদের মধ্যে শতকরা 40 ভাগ, অর্থাৎ অর্ধেকের চেয়ে কম পাখি প্রতিবছর স্থান পরিবর্তন করে। বৃটেনের 68 রকমের গাইয়ে পাখিদের মধ্যে 22টি প্রজাতি প্রব্রজনে অভ্যস্ত। ভারতবর্ষে যে 1200 প্রজাতির পাখি দেখা যায় তার মধ্যে প্রায় 300 প্রজাতি দূরদেশ থেকে শীতকালে এখানে চলে আসে। কোন্ পাখি কতদূরে হাওয়া বদলাতে যায় তার হিসাবও খুব বিস্ময়কর। মেরু অঞ্চলে সামুদ্রিক পাখি টার্ন (Tern) প্রতিবছর উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে যায় এবং আবার ফিরে আসে, অর্থাৎ এই পাখিরা বছরে প্রায় 35000 কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে, কয়েক হাজার কিলো-

মিটার তো বহু পাখিই ভ্রমণ করে থাকে। ইউরোপের কোনো কোনো পাখি শীতকালে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত চলে যায় আবার অনেক পাখি ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলিতে এসেই যাত্রা সমাপ্ত করে।

আমাদের ভারতবর্ষে যে-সব পাখি প্রব্রজনে আসে তাদের এটা শীতকালীন আবাসস্থল, তারা এখানে ডিম পাড়তে আসে না। যে-সব পাখির জন্মভূমি পূর্ব ইউরোপ, উত্তর ও মধ্য এশিয়া এবং হিমালয় অঞ্চল তারা অনেকেই ভারতের উপদ্বীপ-অংশে শীতকাল কাটাতে আসে। আমাদের দেশে যে-সব যাযাবর পাখিদের অজস্র সংখ্যায় দেখা যায় তারা হচ্ছে বিভিন্নরকমের হাঁস ও অন্যান্য জলচর পাখির দল। শীতকালে আমাদের সমুদ্র আর নদীর তীরে, বড়ো বড়ো বিল আর জলায় এদের দেখা পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু ভারতের এই যাযাবর পাখিদের যেটুকু চোখের সামনে দেখা যায় তার বেশি এদের সম্বন্ধে আমরা, বলতে গেলে কিছুই জানি না। ঠিক কোন্ জায়গায় এদের জন্মভূমি, কেমন ধরনের পূর্ববর্তীদের থেকে এদের উৎপত্তি, কোন্ পথ দিয়ে এরা আসে আর যায় এ-সব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। যাযাবর পাখিদেব সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ কববাব উদ্দেশ্যে এই শতকের শুরু থেকে একটা বিশেষ উপায়েব সাহায্য নেওয়া আবম্ভ হয়েছে। পৃথিবীর সব দেশেই এখন যাযাবর পাখিদের পায়ে অ্যালুমিনিয়ামেব আংটি পবিয়ে দেওয়া হয়। ওদের জাল বা ফাঁদ পেতে ধ'বে, আংটি পরিয়ে ওদের সম্বন্ধে সব কথা লিখে নিয়ে ওদের আবাব ছেড়ে দিতে হয়। এই কাজে বিভিন্ন মাপের আংটি ব্যবহার করা হয় এবং আংটির ওপর, যিনি সেই আংটি পাখিকে পরিয়েছেন তাঁর নাম ঠিকানা ও একটি ক্রমিক নম্বর খোদাই করা থাকে।

পরে সেই পাখাটি আবার যদি কোনো রকমে কারো হাতে ধরা পড়ে তা হলে ঐ আংটির মালিকের ঠিকানায় খবর দিতে হয়।

বোম্বাইয়ের 'ন্যাচারাল হিস্টরি সোসাইটি' এক পরিকল্পনা অনুসারে গত 10 বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যাযাবর পাখিদের এইভাবে আংটি পরানোর কাজ চালাচ্ছেন এবং ফলে এ পর্যন্ত বহু মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এখানকার কিছু কিছু বুনো হাঁস সেই 4800 কিলোমিটার দূরে সাইবিরিয়ায় গিয়ে আবার ধরা পড়েছে। এইরকম ভাবে আরো অনেক প্রজাতিও ধরা পড়েছে অন্যান্য দূর দেশ থেকে এবং তার ফলে জানা গেছে এদের সম্পর্কে বহু দরকারী খবর। এতদিন তা জানার কোনো উপায় ছিল না। এই আংটিগুলিতে একটি ক্রমিক সংখ্যা ছাড়াও লেখা থাকে "বম্বে ন্যাচারাল হিস্টরি সোসাইটিকে খবর দিন"। যারা এই বই পড়বেন তাঁদের সকলের প্রতি অনুরোধ, তাঁরা যেন এই আংটি সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন পরিচিত মহলে প্রচার করেন। কেউ যদি কখনো কোনো মৃত পাখির পায়েও এইরকম আংটি দেখতে পান তা হলে এ সম্বন্ধে কী করতে হবে তা আগে থেকে জানা থাকলে যে-কোনো মূল্যবান খবর হারিয়ে যাবার আগেই যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। অন্য দেশে আংটি পরানো অনেক পাখি ভারতবর্ষে এসে ধরা পড়ে, স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক সব আংটিই ঐ সোসাইটির কাছে পাঠানোই ভালো। আর তা যদি সম্ভব না হয় তা হলে আংটির সঠিক নম্বর এবং কত তারিখে, কোন্ জায়গায়, কী রকম পরিবেশে আংটিটি পাওয়া গেছে সে সম্বন্ধে যাবতীয় খবর সোসাইটিকে জানানো প্রয়োজন। এ ধরনের সহযোগিতাদ্বারাই ভারতীয় পাখি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যথাযথভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে।

পক্ষী-বিবরণ

পডিসিপেডিফর্মিস (Podicipediformes)—গ্রেবস (Grabes) বর্গের মধ্যে পড়ে ছোটো ডানাওয়ালা প্রায় পুচ্ছহীন জলচর পাখিরা, এদের পা-দুটি থাকে অনেকটা পিছনদিকে, আর পায়ের আঙুল-গুলির দুপাশে পাতলা চামড়া থাকায় অনেকটা মাঝখানে শিরা-বিশিষ্ট গাছের পাতার মতো দেখতে লাগে। এই বর্গের পাখিদের মধ্যে যাদের আমরা প্রায়ই দেখতে পাই সেগুলি হচ্ছে **ছোটো গ্রেব বা ড্যাবচিক্** (Little Grebe or Dabchick)—(Podiceps ruficollis)—চিত্র নং 1—

হিন্দী নাম— পানডুবী, ডুব্‌ডুবী, এবং লাওক্রি।

বাংলা নাম— পানডুবী বা ডুবুরী হাঁস।

মেটে রঙের মোটা মোটা ছোটোখাটো এই সাঁতারু পাখিগুলির শরীরের নিচের দিকটা রেশমের মতো মসৃণ, ঠোঁট ছোটো অথচ তীক্ষ্ণ এবং ল্যেজের কোনো বালাই নেই। প্রজনন ঋতুতে এদের মাথা ও গলার পালক গাঢ় বাদামী রঙ ধারণ করে এবং মুখগহ্বরের হলদে রঙ বেশ চোখে পড়ে। প্রায় প্রত্যেকটি পুকুর ও বিলের জলে ছোট্ট খেলনার হাঁসের মতো এই পাখিগুলিকে সাঁতরে বেড়াতে দেখা যায়। সন্দেহের এতটুকু কারণ ঘটলেই এরা চট করে ডুব দেয় জলের তলায়। ছোটোখাট পুকুরে এরা একসঙ্গে দু-তিনটির বেশি থাকে না কিন্তু বড়ো বড়ো ঝিলে একসঙ্গে প্রায় 50টি পাখিকেও দল বেঁধে থাকতে দেখা যায়। ডুব সাঁতার কাটতে এদের জোড়া

নেই। জলের ওপর এতটুকুও তরঙ্গ না তুলে কী বিদ্যুৎগতিতে এরা জলের নিচে অদৃশ্য হয়ে যায় তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বন্দুকের গুলি এদের গায়ে লাগবার অনেক আগেই এরা অদৃশ্য হয়ে যায়। এই পাখিগুলি জলেই থাকতে ভালোবাসে, নেহাত বিরক্ত করলে খানিকদূর ঠিক জলের ওপর দিয়েই ডানা ঝাপটে এগিয়ে গিয়ে আবার ঝুপ করে জলেই নেমে পড়বে।

ডানাগুলি ছোটো হলেও এই পাখিরা কিন্তু বেশ ভালোই উড়তে পারে, এক পুকুরের জল শুকিয়ে গেলে এরা প্রায়ই বহুদূর উড়ে অন্য পুকুরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সন্ধ্যাবেলায় যখন ওদের চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে ডানা ঝটপট করতে করতে কিছুটা উড়ে ,আর কিছুটা দৌড়ে পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করতে করতে ওরা বিশ্রামের জন্য আশ্রয় নেয় তখন ওদের কণ্ঠে শোনা যায়, তীক্ষ্ণ সুরেলা ডাক। জলজ কীটপতঙ্গ ও তাদের ডিম, ব্যাঙাচি, শামুক, গুগলি, ছোটো মাছ এই-সবই ওদের খাদ্য। জলজ উদ্ভিদের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ওরা সারাদিন খাবার খোঁজে, মাঝে মাঝে ডুব দিয়ে জলের তলা থেকেও খাদ্য খুঁজে আনে। জলের ওপর বা কিছুটা জলে-ডোবা গাছপালার ওপরে জলজ তৃণের নরম আস্তরণ বিছিয়ে এই ড্যাবচিক বা ডুবুরী হাঁসেরা বাসা বানায়। এরা ডিম পাড়ে সাধারণত 3টি থেকে 5টি পর্যন্ত। ডিমগুলির রঙ প্রথমে সাদাই থাকে কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই এগুলোর চেহারা হয়ে পড়ে বেশ নোংরা, কারণ এই পাখিরা প্রত্যেকবার বাসা থেকে বের হবার সময় ডিমগুলিকে ভিজে ঘাস চাপা দিয়ে লুকিয়ে রেখে যায়। এদের ছোটো ছোটো বাচ্চাগুলির গায়ে ডোরা কাটা দাগ থাকে।

প্রায়ই দেখা যায় ড্যাবচিকের বাচ্চারা ওদের মা-বাবার পিঠে চড়ে আরামে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পেলিক্যানিফর্মিস (Pelecaniformes) বর্গের পাখিদের প্রতিনিধি প্রধানত পেলিক্যানিডি (Pelecanidae) গোষ্ঠীর পেলিক্যান ও ডার্টার পাখিরা এবং ফ্যালাক্রোকোরাসিডি (Phalacrocoracidae) গোষ্ঠীর পানকৌড়িরা।

পেলিক্যানরা বেশ বড়োসড়ো ভারী গড়নের পাখি, পাগুলি এদের ছোটো অথচ মজবুত, পায়ের আঙুলের ফাঁকগুলি চামড়া দিয়ে জোড়া এবং বিশেষ লক্ষণীয় হচ্ছে এদের ঠোঁট। বিরাট আকৃতি চ্যাপ্টা ঠোঁটের নিচের দিকে আছে একটি রবারের মতো স্থিতিস্থাপক চামড়ার থলি। খাবার জন্য মাছ ধরে এরা ঐ থলির মধ্যে জমা করে। মাছই এদের প্রধান খাদ্য। দেখতে অতিকায় হলেও পেলিক্যানদের হাড় খুব হাল্কা আর সেই কারণেই ওরা উড়তে পারে খুব সাবলীলভাবে। শকুন আর স্টর্কদের মতো জাতের পাখিরাও আকাশে উষ্ণকায় স্রোতে উড়ে বেড়াতে ভালোবাসে। প্রায়ই রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে দেখা যায় আকাশের অনেক উঁচুতে নিশ্চলভাবে দুপাশে ডানা মেলে দিয়ে ওরা ভেসে বেড়াচ্ছে। ভারতে সাধারণত এই জাতের তিন রকম পাখি দেখা যায়। এদের মধ্যে প্রথমে নাম করা যায় ছিটদার ঠোঁটওয়ালা অর্থাৎ স্পটেড্-বিলড্ বা গ্রে পেলিক্যানদের (Pelecanus philippensis)
চিত্র নং 2—

এদের হিন্দী নাম— হাওয়াসিল বা কুরের।

বাংলায় বলা হয়— গগনবেড়।

এই ধূসর পেলিক্যান বা গগনবেড় পাখিরা ভারতেরই বাসিন্দা, আর এই জাতের অন্য দুরকম পাখি সাধারণত শীতকালেই এদেশে আসে। গগনবেড় পাখির ঠোঁটের উপরিভাগ নীল আর কালো কৌটাকাটা, ঠোঁটের নিচের চামড়ার থলিটির রঙ ফিকে বেগুনী। পূর্ণবয়স্ক পাখিদের রঙ সাদাটে ধূসর কিন্তু অপেক্ষাকৃত তরুণ পাখিদের গায়ের রঙ বাদামী ধরনের। এই পাখিরা যখন ওড়ে, ওদের ডানার প্রান্তভাগের কালচে পালকগুলি বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ে, তা ছাড়া ওদের লেজের পালকের রঙও ধূসর বাদামী— এই চিহ্নগুলি দেখে ওদের চেনা সহজ। ছোটো ছোটো বা বড়ো দল বেঁধে এরা ঝিলের জলে সাঁতার কেটে মাছ খুঁজে বেড়ায়, কখনো বা শুধু জলে গা ভাসিয়ে বিশ্রাম করে। যখন পেট ভরা থাকে তখন অনেক সময় ডাঙায় উঠে ঠোঁট দিয়ে ঘষে মেজে ওদের নিজেদের পালক পরিষ্কার করতে দেখা যায়। ক্ষুধা এদের প্রচণ্ড এবং মাছ খায় এরা প্রচুর পরিমাণে। পানকৌড়িদের মতো এরাও দল বেঁধে শিকার করে কিন্তু শিকারের পেছনে তাড়া করে জলের নিচে ডুব দেয় না। ওরা একদল পাখি একসঙ্গে প্রবল বিক্রমে ডানা ঝাপটে অর্ধচন্দ্রাকারে মাছের ঝাঁককে ঘিরে ধরে, তাড়া করে নিয়ে যায় তীরের কাছে এমন জায়গায় যেখানে জল খুব কম। তারপর সবাই মিলে বিরাট হাঁ করে মাছের ঝাঁকের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং চটপট প্রচুর মাছ ধরে নিজেদের মুখের থলি বোঝাই করে নেয়। পেলিক্যানরা খুব অনায়াসে জল ছেড়ে আকাশে উঠে পড়ে তারপর অনেকটা চ্যাপ্টা বা এস্ অক্ষরের মতো করে পিছনদিকে ঘাড় হেলিয়ে উড়তে থাকে। ওদের একটানা ডানার আওয়াজ শুনতে লাগে অনেকটা শিস্ দেওয়ার শব্দের মতো আর উড়ন্ত অবস্থায়

ওদের দেহটা দেখায় একটা ভাসমান নৌকার তলদেশের মতো। এই ধূসর পেলিক্যান বা গগনবেড় পাখিদের জন্মস্থান হচ্ছে প্রধানত অন্ধ্র প্রদেশের পূর্ব-গোদাবরী জেলা। অবশ্য দাক্ষিণাত্যের অন্যত্রও অল্প সংখ্যায় এদের দেখা যায়। এরা যেখানে বাসা বাঁধে সেখানে বেশ বিস্তৃত এলাকা জুড়ে রীতিমতো নিজেদের একটা উপনিবেশ গড়ে তোলে। বড়ো বড়ো ঝাঁকড়া পাতাওয়ালা গাছ এবং তাল নারকেল জাতীয় গাছের মাথায় বাসা বাঁধতে ভালোবাসে এরা। বাসাগুলোর একেবারেই কোনো শ্রী থাকে না, কোনোরকমে কাঠ-কুটি দিয়ে একটা আস্তানা বানায়, আর একই গাছে একেবারে ঘেঁষাঘেঁষি করে একাধিক পাখি বাসা বেঁধে থাকে। সাধারণত এক এক বারে তিনটি করে ডিম পাড়ে। ডিমগুলোর রঙ প্রথমে থাকে খড়ির মতো সাদা, কিন্তু তা দিতে দিতে ক্রমশ এগুলো বাদামী রঙ ধারণ ধরে।

ফ্যালাক্রোকোরাসিডি (Phalacrocoracidae) গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে ডার্টার বা সাপপাখিরা এবং পানকৌড়িরা।

ডার্টার (Anhinga ruta)—চিত্র নং 3 : হিন্দী নাম— বান্‌বে, বাংলায় বলে— গয়ার। এগুলি হচ্ছে কালো রঙের জলচর পাখি, এদের সাপের মতো সরু লম্বা বাদামী রঙের গলাটি মখমলের মতো নরম, মাথাটি সরু এবং ঠোঁট ছুরির মতো তীক্ষ্ণ। পিঠের ওপর রুপালি লম্বা লম্বা দাগ আর দীর্ঘ শক্ত ও গোল গড়নের লেজ দেখে এদের চিনতে হয়। গ্রামাঞ্চলের পুকুরে, ঝিলে নদীতে এবং কখনো কখনো জোয়ার-ভাঁটা খেলে এমন সব নদীর মোহানাতেও একক বা সদলে এদের দেখা যায়। ওরা যখন সাঁতার কাটে, শরীরের

অর্ধেকটা, কখনো বা সমস্ত শরীরটাই থাকে জলের তলায়, জলের উপর শুধু সাপের মতো লম্বা গলা আর মাথাটি এধার ওধার নড়তে দেখা যায়। এদেরও প্রধান খাদ্য মাছ। এরা সুদক্ষ ডুবুরী পাখি আর ডুব-সাঁতার কাটতেও ওস্তাদ। আধখোলা ডানা মেলে, এরা যখন মাছের পিছনে তাড়া ক'রে তীরবেগে জলে ডুব দেয় তখন এদের সাপের মতো লম্বা গলাটি যেভাবে সামনে পিছনে আন্দোলিত হয় তা দেখলে মনে হয় যেন কোনো সুদক্ষ খেলোয়াড় বর্শা ছোঁড়ার আগে লক্ষ্যস্থির করছে। এদের গলার পেশী এমন ভাবে তৈরি যে এরা বিদ্যুৎগতিতে ছুরির মতো তীক্ষ্ণ ঠোঁটে মাছকে গেঁথে ফেলতে পারে। তারপর সেই ঠোঁট-বিদ্ধ মাছটিকে নিয়ে সাপের মতো লম্বা গলাটা জলের বাইরে বেরিয়ে আসে এবং চমৎকার কায়দায় মাছটাকে ছুঁড়ে দেয় শূন্যে, পরমুহূর্তেই আবার শূন্য থেকে মাছটাকে মুখের মধ্যে লুফে নিয়ে মাছটার মাথার দিক থেকে গিলে ফেলে। এই পাখিদের মাথা এবং গলা যদিও বেশ সরু কিন্তু বেশ বড়ো বড়ো মাপের মাছও এরা অবলীলাক্রমে গিলে ফেলতে পারে। বিশ্রামের সময় উঁচু গাছের ডালে বসে থাকে সোজা হয়ে, আর নয়তো ভিজে শরীর শুকিয়ে নেবার জন্য ডানা আর লেজ সম্পূর্ণ মেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কারণ যদিও এরা জলচর পাখি কিন্তু হাঁসেদের মতো এদের পালক তৈলাক্ত নয়, জলে এদের পালক একেবারে চুপচুপে হয়ে ভিজে যায় তাই ডানার সাবলীল গতি বজায় রাখতে এদের ক্রমাগতই ডানা আর পালক শুকিয়ে নিতে হয়। এই ডার্টার বা গয়ার পাখিদের ডাক দ্বিস্বর-বিশিষ্ট একটা ধাতব আওয়াজ, আওয়াজটা অনেকটা চি-গী, চি-গী ধরনের শুনতে লাগে। ওড়ার ভঙ্গীতে এবং চাল-

চলনের দিক থেকে পানকৌড়িদের সঙ্গে এদের অনেক মিল আছে। গয়ার পাখিরা সাধারণত বক, স্টর্ক প্রভৃতি পাখিদের সঙ্গে একই অঞ্চলে বাসা বেঁধে থাকে। এদেরও বাসা একেবারেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়, কোনোরকমে কতকগুলি কাঠি জড়ো করে এরা, জলের মধ্যবর্তী অথবা জলের ধারের কোনো গাছে বাসা বাঁধে। একেবারে 3টি থেকে 4টি ডিম পাড়ে, ডিমগুলির চেহারা সরু ও লম্বা ধরনের আর রঙ ফিকে সবুজ ও নীলের মাঝামাঝি, তার ওপর আবার সাদা খড়ির গুঁড়োর মতো একটা আস্তরণ থাকে।

ছোটো করমোর‍্যান্ট (Phalacrocorax niger) চিত্র নং 4 : হিন্দী নাম— পান কৌয়া, ছোটা গানহিল। বাংলা নাম— পান-কৌড়ি। এই ছোটো করমোর‍্যান্ট বা পানকৌড়িরা আকারে দাঁড়কাকের থেকে একটু বড়ো। কুচকুচে কালো রঙের হাঁসের মতো এই জলচর পাখিগুলি দেখতে বিশেষ ভালো নয়। এদের লেজ লম্বাটে শক্ত গড়নের এবং ঠোঁট সরু ও চ্যাপ্টা, ঠোঁটের শেষ প্রান্ত বাঁকা ও তীক্ষ্ণ। এদের গলায় একটুখানি সাদা রঙের ছোপ থাকে আর মাথার ওপর পেছন দিকে থাকে একটু ঝুঁটির আভাস।

গ্রামাঞ্চলের পুকুর ঝিল ও জলাভূমিতে এরা ছোটো বা বড়ো বড়ো দল বেঁধেও থাকে, আবার একলাও থাকে, তা ছাড়া সমুদ্রতীরে ছোটো ছোটো লবণাক্ত জলের হ্রদগুলিতে এবং সমুদ্রের খাঁড়ির মধ্যেও এদের দেখা পাওয়া যায়। জলের ধারের বড়ো বড়ো পাথরের ওপর, ময়লা মাছধরা জালের লম্বা খুঁটিতে অথবা জলের ওপর ঝুঁকে-পড়া গাছের ডালে ডানা মেলে দিয়ে এরা রোদ পোহায়।

পানকৌড়িদেরও প্রধান খাদ্য মাছ। সাঁতার আর জলের তলায় ডুব দেওয়ায় এদের দক্ষতা অসামান্য, এরা যা-কিছু মাছ ধরে সবই ঐ জলের তলায় ডুব দিয়ে। কখনো কখনো দল বেঁধেও শিকারে নামতে দেখা যায়। একঝাঁক মাছকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে তাড়া ক'রে আর বার বার ডুব দিয়ে জলের মধ্যে দারুণ ছুটোপাটি ক'রে ওরা প্রচুর মাছ ধরে ফেলে। এক-একটা মাছকে আড়াআড়ি ভাবে ঠোঁটে চেপে ধরে ওরা জলের ওপর ভেসে ওঠে তারপর এমন কায়দায় মাছটাকে ওপর দিকে ছুঁড়ে দেয় যে মাছটি ঠিক মাথা নিচু দিকে ক'রে পড়তে থাকে যাতে পানকৌড়িদের টপ করে মাছটি গিলে ফেলতে কোনো অসুবিধা হয় না। পরমুহূর্তেই আবার ওরা ডুব দেয় পরবর্তী শিকারের খোঁজে। পানকৌড়িরা এই উপায়ে অনেক সময় এত বড়ো বড়ো মাছ ধরে যে দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। এদের ক্ষুধাও প্রচণ্ড, সহজে পেট ভরে না। এই ছোটো পানকৌড়িদের আশে-পাশেই আরো দুই প্রজাতির কালো রঙের পানকৌড়ি দেখতে পাওয়া যায়। এরা হল লার্জ করমোর‍্যাণ্ট বা বড়ো পানকৌড়ি (P. carbo) এবং ভারতীয় শ্যাগ (shag) (P. fuscicollis) এদের মধ্যে প্রথমটি আকারে প্রায় গৃহপালিত হাঁসের মতো, এদের মাথা ও গলায় ধূসরাভ সাদার ছোপ দেখা যায় প্রজনন ঋতুতে। তা ছাড়া এদের জঙ্ঘার কাছে আছে ডিম্বাকৃতি সাদা রঙের ছোপ যেটি উড়বার সময় খুব স্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ে। শ্যাগরা মাঝারি আকারের, তাই অন্য দুটি প্রজাতির সঙ্গে এদের গুলিয়ে ফেলার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, কিন্তু প্রজনন ঋতুতে এদের চেনা সহজ, কারণ এই সময় ওদের চোখের পিছনে গলায় সাদা

পালকের গুচ্ছ, তা ছাড়া মাথা আর গলায় সাদা সাদা কোঁটাও দেখা দেয়। সব জাতের পানকৌড়িরাই জলের ধারের গাছে কাঠিকুটি দিয়ে অগভীর পাটাতনের ধরনে বাসা বানায়। বক-জাতীয় পাখিদের কাছাকাছিই এদের থাকতে দেখা যায়। এরা একবারে 4/5টি করে ডিম পাড়ে, ডিমগুলির রঙ হয় নীলচে সবুজ এবং তার ওপর খড়ির গুড়োর মতো আস্তরণও থাকে। সব জাতের পানকৌড়িরই ডিমের রঙ প্রায় একই রকম, যা-কিছু পার্থক্য শুধু আকারে।

সিকোনিফর্মিস (Ciconiiformes) বর্গের অন্তর্গত চারটি বিভিন্ন গোষ্ঠীর (family) পাখি ভারতে দেখা যায়। এরা হল আরডেডি (Ardeidae) গোষ্ঠীর বক জাতীয় পাখিরা, সিকোনিডি (Ciconiidae) গোষ্ঠীর স্টর্ক জাতীয় পাখিরা, থ্রেস্‌কিওর্নিথিডি (Threskiornithidae) গোষ্ঠীর ইবিস্ (Ibises) জাতীয় পাখিরা এবং ফোনিকোপ্‌টেরিডি (Phoenicopteridae) গোষ্ঠীর ফ্লেমিংগো পাখিরা। হেরন (Heron) আর ইগ্রেট (Egret) বা বক জাতীয় পাখিদের প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে লম্বা পা, প্রায় মাংসহীন জঙ্ঘাস্থি এবং ছাড়া ছাড়া পায়ের আঙুল। এদের পায়ের লম্বা আঙুলের মাঝের ফাঁকগুলি চামড়া দিয়ে জোড়া থাকে না। ওদের ঠোঁট বর্শার মতো সূচালো, আর গলা সরু লম্বা গড়নের এবং নমনীয়। এই সবরকম বৈশিষ্ট্য খুব ভালো করে দেখা যায় গ্রে হেরনদের (Ardea cinerea) মধ্যে। হিন্দী নাম— নারি, কাবুদ বা অঞ্জন। চিত্র নং 5 : বাংলায় বলে— সাদা কাঁক। এই ল্যাগ্‌ব্যাগে মাংসহীন লম্বা অস্থিসার পা-ওয়ালা পাখিগুলিকে

জলাভূমি অঞ্চলে দেখা যায়, এদের শরীরের ওপর দিকটা ছাই রঙের কিন্তু মাথা আর গলার রঙ সাদা। শরীরের নিচের অংশ ধূসরাভ সাদা। গলাটি এদের সরু আর লম্বা, অনেকটা ইংরাজী এস্ অক্ষরের মতো, মাথা সরু এবং ঠোঁট ছুরির মতো শক্ত ও তীক্ষ্ণ। এই পাখিদের নির্ভুল ভাবে চেনবার আরও কয়েকটি বিশেষ চিহ্ন আছে। মাথার দিকে ঝোলানো কালো রঙ লম্বা ঝুঁটি, বুকের কাছে কালো দাগ দেওয়া সাদা পালকের সারি এবং গলার ঠিক মধ্য-ভাগ বরাবর কালো কালো ফোঁটার মতো দাগ এদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই জাতের স্ত্রীপাখিরাও একই রকম দেখতে শুধু তাদের ঝুঁটি আর বুকের পালকের বাহার একটু কম। এই 'গ্রে হেরন' বা ধূসর বকদের প্রায়ই দেখা যায়— পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে নিশ্চল ও নিঃসঙ্গ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, মাথাটি বুকের কাছে গুঁজে ঐভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওরা ঘুমোয়। কিন্তু কাছাকাছির মধ্যে ছোটো মাছ বা ব্যাঙের সাড়া পেলে চট করে শিকার ধরতে এদের এক মুহূর্তও দেরি হয় না। শিকার নজরে পড়লেই এই পাখিরা গলা বাড়িয়ে ঠোঁট দিয়ে তাক্ করে একেবারে স্থির হয়ে যায় তারপর বিদ্যুৎগতিতে শিকারকে ঠোঁটে গেঁথে ফেলে নয়তো চেপে ধরে। তারপর শূন্যে উৎক্ষিপ্ত মাছটি যখন মাথা নিচু করে পড়তে থাকে সেই সময় গিলে ফেলে। ওড়ার সময় এরা পক্ষসঞ্চালন করে বেশ দ্রুত গতিতে। সব বকজাতীয় পাখিরাই, যখন আকাশে ওড়ে তখন গলা গুটিয়ে মাথাটি দুই কাঁধের মাঝখানে শক্ত সটান রাখে। আর পা দুটি রাখে লেজের তলায় গুটিয়ে—(হেরন-জাতীয় পাখিদের এটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য)। এরা যখন ওড়ে, মাঝে মাঝে ডানার ঝাপটার

একটা গভীর কর্কশ ধরনের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যায় না। এরাও কাঠিকুটি দিয়ে মাচার মতো বাসা বানায় তবে এদের বাসার মাঝখানটা একটু গভীর হয় এবং তাতে থাকে ঘাসের আস্তরণ। সাধারণত জলের ধারের গাছেই এদের বাসা দেখা যায় আর নানান জাতের বক কাছাকাছি একসঙ্গে বাস করতেই ভালোবাসে। এই ধূসর বকেরা 3 থেকে 6টি ডিম পাড়ে, ডিমগুলোর রঙ হয় গাঢ় সামুদ্রিক সবুজ। লালচে হেরনরা (A. purpurea) আকারে ধূসর হেরনদের চেয়ে কিছু ছোটো, কিন্তু চেহারা আর চালচলনে প্রায় একই রকম। এরাও জলা অঞ্চলেরই বাসিন্দা। এদের শরীরের উপরের অংশের রঙ নীলচে বেগুনী ও ধূসরে মেশানো, মাথা আর গলা লালচে বাদামী এবং নিচের দিকটা বাদামী ও কালো রঙ মেশানো।

হেরনদের কাছাকাছিই তিনটি প্রজাতির সাদা ইগ্রেট (egret) দেরও দেখা পাওয়া যায়, কারণ এরাও জলাভূমিরই বাসিন্দা। এরা হচ্ছে বড়ো ইগ্রেট (Egretta alba), মাঝারি ইগ্রেট (E. Intermedia) আর ক্ষুদে ইগ্রেট (E. Garzetta)। (চিত্র 6) বড়ো-ইগ্রেটরা আকারে বেগুনী হেরনদের মতো, কিন্তু এদের রঙ ধপধপে সাদা, এরা সাধারণত নিঃসঙ্গ থাকতেই ভালোবাসে। মাঝারি-ইগ্রেটরা এদের চেয়ে আর একটু ছোটো আর ক্ষুদে-ইগ্রেটরা গৃহপালিত মুরগী বা গোবকদের মাপের। এই গোবক বা ক্যাটল ইগ্রেটদের কথা পরে বলা হচ্ছে। সব জাতের সাদা ইগ্রেটদেরই প্রজনন ঋতুতে পিঠের ওপর খুব সুন্দর বাহারী পালক গজায়। এই শতকের গোড়ার দিকে ইউরোপ ও আমেরিকার ফ্যাশানপ্রিয় মহিলাদের টুপিতে লাগাবার জন্য এই পালকের খুব কদর ছিল।

চিত্র 2
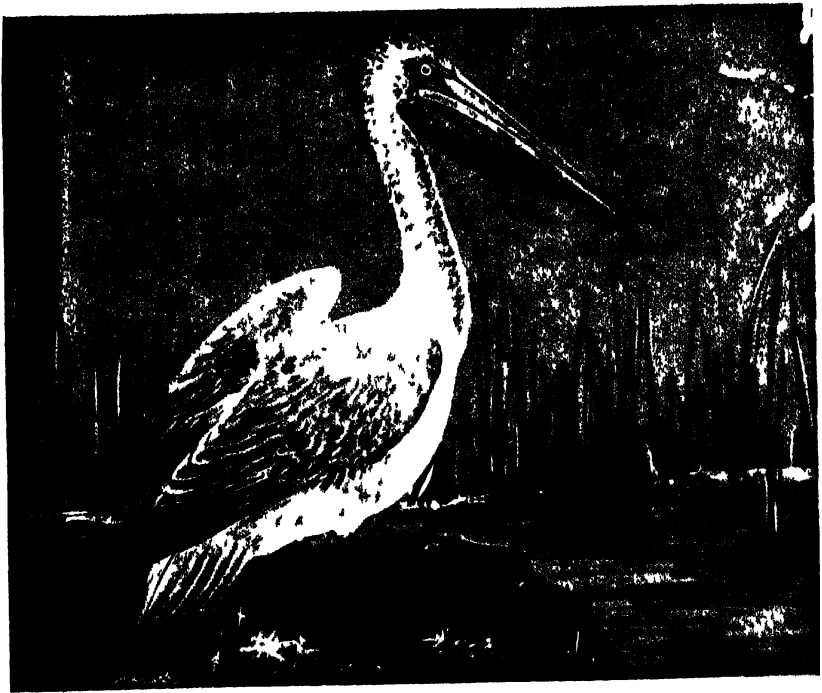
গগন বেড

(স্পটেড্, বিলড বা গ্রে পেলিকান)

(Pelecanus philippensis)

দ্রষ্টব্য পৃঃ 40

চিত্র 3

গয়ার

(ডার্টার)

(Anhinga rufa)

দ্রষ্টব্য পৃঃ 42
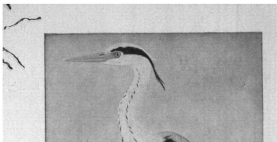
চিত্র 7
গোবক বা গাই বগ্‌লা
(ক্যাটল ইগ্রেট)
(*Bubulcus, ibis*)
দ্রষ্টব্য পৃঃ 49

চিত্র 9
সোনাজঙ্ঘা
(পেণ্টেড্ স্টর্ক)
(*Ibis ieucocephalus*)
দ্রষ্টব্য পৃঃ 53

চিত্র 13
খুন্তে বক
(স্পুনবিল্)
(Platalea leucorodia)

কাজেই এই পালকের ব্যবসা ছিল বেজায় লাভজনক, আর সেই কারণেই এই পাখিদের ঝাঁকে ঝাঁকে এমন নির্বিচারে হত্যা করা হত যে পৃথিবীর অনেক দেশেই এই পাখিদের বংশ প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। বুনো পাখির পালক আমদানী-রপ্তানীর ব্যাপারে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় এবং বিভিন্ন দেশে পাখি শিকার বন্ধ করার জন্য কিছু আইন প্রবর্তনের ফলে এই পাখিদের সমূল উৎখাতটা বন্ধ হয়েছে। তা ছাড়া, সৌভাগ্যক্রমে মহিলাদের ফ্যাশানেও এসেছে উন্নতিসূচক পরিবর্তন।

ক্যাট্‌ল ইগ্রেটদের (Bubulcus ibis)—চিত্র নং 7

হিন্দী নাম— সুরখীয়া বগ্‌লা বা গাই বগ্‌লা

বাংলা নাম— গোবক বা গাই বগ্‌লা। এই সাদা রঙের পাখিগুলি দেখতে অনেকটা ক্ষুদে ইগ্রেটদেরই মতো। তবে প্রজনন ঋতু ছাড়া অন্য সময়ে ক্ষুদে ইগ্রেটদের সঙ্গে এদের একমাত্র প্রভেদ হল এদের শক্ত হলুদবর্ণের ঠোঁট, ক্ষুদে ইগ্রেটদের ঠোঁট কালো। আর প্রজনন ঋতুতে এই গোবকদের আর কারো সঙ্গে ভুল করবার কোনো সম্ভাবনাই নেই, কারণ ঐ সময় এদের মাথা, গলা আর পিঠের ওপর দেখা দেয় কমলা আর সোনালি রঙের পালকের বাহার। ক্ষুদে ইগ্রেট আর ঐ জাতীয় অন্য জলচর পাখিদের মতো এই গোবকদের কাছে জলাভূমি অতটা অবশ্য-প্রয়োজনীয় নয়। এদের বহুসময়ে একাকী বা দলবদ্ধভাবে মাঠে-ঘাটে গোরু-মহিষদের আশেপাশে ঘুরতে দেখা যায়। এদের প্রধান খাদ্য, কীট-পতঙ্গ। এরা গবাদি পশুর পায়ের ফাঁক দিয়ে দিয়ে উড়ে পোকা খোঁজে, কখনো বা ভালো করে চারপাশটা দেখবার জন্য ওদের পিঠের ওপর চড়ে বসে। জীবজন্তুরা যখন চরে বেড়ায়

তখন ঘাসের ফাঁক থেকে যে-সব ফড়িং লাফিয়ে ওঠে তারাই গোবকদের শিকার। এই পাখিরা লম্বা গলা আর তীক্ষ্ণ ঠোঁটের সাহায্যে চটপট ঐ ফড়িংগুলোকে ধরে ফেলে। এরা গোরু-মহিষের শরীর এবং কানের মধ্যে থেকেও পরম তৃপ্তির সঙ্গে পোকা খুঁটে খায়। কাক, বক আরও অন্যান্য পাখিদের সঙ্গে এই গোবকরাও বড়ো বড়ো গাছের ডালেই বাস করে, প্রতিদিন সন্ধ্যায় এরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে আশ্রয় নেয় নিজেদের পরিচিত প্রিয় বৃক্ষের শাখায়। সূর্যাস্তের সময় ওরা যখন ঘরে ফেরে তখন প্রায়ই দেখা যায় ওরা কোণাকুণিভাবে লাইন বেঁধে কিম্বা ঝাঁক বেঁধে উড়ছে, পা দুটি লেজের তলা থেকে অল্প দেখা যাচ্ছে আর মাথাটি পিছনে হেলিয়ে গোঁজা রয়েছে দুই কাঁধের মধ্যে। ডিম পাড়ার সময়ও এরা দলবদ্ধ ভাবেই থাকে আর জলা ও পুকুরের বকেদেরও প্রায়ই এদের সঙ্গে থাকতে দেখা যায়। ডার্টার বা গয়ার, পানকৌড়ি আর সাদা ইগ্রেটদের মিশ্র পল্লীতেও একসঙ্গে মিলেমিশে এরা বসবাস করে থাকে। কাকেদের মতোই ভাঙাচোরা কাঠিকুটি দিয়ে অপরিষ্কার বাসা বানায় এরা। বাসার জন্য বড়ো গাছই এদের পছন্দ, তবে তার কাছাকাছি জল না থাকলেও চলে, অনেক সময়েই গ্রামে বা নগরে লোকালয়ের মধ্যে কোলাহলপূর্ণ বাজারের মাঝখানে ওদের আস্তানা দেখা যায়। এদের ডিমের সংখ্যা এক-একবারে 3 থেকে 5টি এবং ডিমের রঙ মাখন তোলা দুধের মতো নীলচে সাদা।

হেরন গোষ্ঠীর আর-একটি সভ্য (Pond Heron) পণ্ড্ হেরণ বা ধান পাখি (Paddy bird) (Ardeola grayii) চিত্র নং—8 :

হিন্দী নাম— অন্ধা বগ্‌লা বা বগ্‌লি।

বাংলা নাম— কোঁচ বক।

এই পাখিগুলি আকারে মুরগীর মত, ডানা মুড়ে যখন বসে থাকে তখন মনে হয় রঙ এদের ফিকে হলুদ কিন্তু উড়তে শুরু করলেই এদের ডানা আর লেজের ঝকঝকে সাদা পালকের বাহার পুরোপুরি দেখা যায়। আবার প্রজনন ঋতুতে এদের রূপ দেখবার মতো। তখন ওদের সারা পিঠ ভরে দেখা দেয় তামাটে লাল চুলের মতো নরম পালক আর মাথার পিছনে গজায় লম্বা সাদা ঝুঁটি। কাদা জলের ছোটোখাটো ডোবা বা পুকুরে, একলা বা দুটি তিনটি করে দলবেঁধে এই কোঁচবক বা ধান পাখিদের দেখা পাওয়া যায়। খুব ছোটো ছোটো মাছ, কাঁকড়া, ব্যাঙ প্রভৃতি ওদের প্রধান খাদ্য। জনবহুল শহরের মাঝখানে ছোটোখাটো পুকুর বা কাঁচাকুয়োর ধারেও এদের দেখা যায়। গরমের দিনে যখন পুকুর বা ডোবার জল একেবারে তলায় এসে ঠেকে তখন সারা পুকুরের ব্যাঙ এসে জমা হয় সেই তলানি জলটুকুতে, এই পাখিদের তখন শুরু হয় ভোজের মহোৎসব। ওরা কাদার মধ্যে নয়তো জলের ধারে সতর্ক হয়ে পিঠ কুঁজো করে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শিকারের খোঁজে। তারপর নাগালের মধ্যে ব্যাঙ বা মাছ এলেই গলা বাড়িয়ে, বর্শার মতো তীক্ষ্ণ ঠোঁটে শিকার ধরে ফেলে। মাঝে মাঝে ওরা খুব পা টিপে টিপে চুপিসাড়ে এক পা এক পা করে জলের মধ্যে এগোতে থাকে শিকারের খোঁজে, এই সময় শিকার ধরবার একাগ্রতায় গলাটি থাকে সামনের দিকে বাড়ানো, বর্শা-তীক্ষ্ণ ঠোঁটের লক্ষ্য থাকে স্থির। বিরক্ত না করলে এই পণ্ড হেরন বা ধানপাখিরা খুবই শান্ত ধরনের পাখি, প্রায়ই দেখা যায় গ্রামের ধোপা যেখানে কাপড় কাচছে কিম্বা গ্রামবধূরা জলের ঘাটে যেখানে গল্পে মেতেছে

তারই আশেপাশে কয়েক হাতের মধ্যেই এই পাখিরা দাঁড়িয়ে আছে চুপটি করে। কিন্তু হঠাৎ ভয় পেলে ডানায় একটা কর্কশ আওয়াজ তুলে হুশ করে ওরা তখনি উড়ে যাবে, বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠবে ওদের তুষারশুভ্র ডানা আর তারপরই সুষম ছন্দে পক্ষসঞ্চালন করতে করতে ভেসে পড়বে ওরা আকাশের বুকে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে ওরা দলবেঁধে আশ্রয় নেয় বৃহৎ বনস্পতির শাখায় শাখায়। এরাও বাসা বাঁধে বেশির ভাগ লোকালয়ের মাঝখানে, বড়ো গাছের ডালে, কাছাকাছি জল না থাকলের চলে, বাসা বাঁধায় কাকেদের মতো এদেরও কোনো শ্রী নেই। এদেরও প্রায়ই অন্যান্য জাতের বকেদের সঙ্গে মিশ্র পল্লীতে বাস করতে দেখা যায়। একটি গাছকে আশ্রয় করে ওরা কাটিয়ে দেয় বছরের পর বছর। এদের ডিমের সংখ্যা 3টি থেকে 5টি আর ডিমের রঙ ফিকে সবুজাভ নীল।

(Stork) স্টর্করা সিকোনিডি (Ciconidae) গোষ্ঠীর অন্তর্গত, বড়ো হেরনদের সঙ্গে এদের কিছু মিল' আছে, এদেরও পা লম্বা এবং জঙ্ঘাস্থি প্রায় মাংসহীন, গলার গড়ন লম্বাটে আর ঠোঁট ভারী অথচ তীক্ষ্ণ। এরা যখন আকাশে ওড়ে তখন হেরনদের সঙ্গে এদের তফাতটা বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ে। এরা গলাটা ঘাড়ের মধ্যে গুঁজে রাখে না, সামনের দিকে সম্পূর্ণ প্রসারিত করেই ওড়ে। স্টর্কদের গলার পেশী এমন যে এদের কণ্ঠে স্বর নেই, শুধু মাঝে মাঝে খুব অস্পষ্ট গোঙানির মতো আওয়াজ এরা করতে পারে। তবে প্রজনন ঋতুতে এই জাতের পুরুষ আর স্ত্রী দুই পাখিই ওদের লম্বা ঠোঁটে খট খট শব্দ ক'রে পরস্পরে

প্রচুর আলাপ করে থাকে। এই গোষ্ঠীর আরেকটি পাখি হচ্ছে **পেন্টেড বা চিত্রিত স্টর্ক** (Ibis leucocephalus)—চিত্র নং 9 :

হিন্দী নাম— ক্যাংঘিল, ডোম্, কংকারী,

বাংলা নাম— সোনাজঙ্ঘা

এই পাখিগুলি আকারে প্রায় শকুনের মতো এবং উচ্চতায় প্রায় এক মিটারের ওপর। এদের ধপধপে সাদা পালকের ওপর খুব ঘন সন্নিবিষ্ট উজ্জ্বল সবুজাভ কালো রঙের ছোপ আছে, তা ছাড়া বুকের তলায়ও দেখা যায় কালো রঙের বলয়াকৃতি দাগ। এর ওপর আবার লেজের কাছে কিছু কিছু পালকের (secondaries) রঙ সুন্দর গোলাপি, এই রঙের বাহারের জন্যই এদের নাম চিত্রিত স্টর্ক। মুখে এদের পালক নেই, হলদেটে মোমের মতো চকচকে মুখ, হলুদ রঙের ভারী গড়নের ঠোঁটের শেষ প্রান্ত একটু বাঁকানো। ঝিল আর জলাভূমিতে এদের ছোটো বা বড়ো বড়ো দলবেঁধে ঘুরতে দেখা যায়। অন্য সব স্টর্কদের মতোই এরাও সারাদিন নিশ্চলভাবে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে আর নয়তো অল্প জলে চুপিসাড়ে মাছ বা ব্যাঙ খুঁজে বেড়ায়। মাছ, ব্যাঙ ছাড়া জলজ কীটপতঙ্গ, কাঁকড়া, শামুক গুগলি এ-সবও এদের খাদ্য। লম্বা গলাটি নুইয়ে ঠোঁট আধখোলা অবস্থায় জলে ডুবিয়ে এরা অতি সন্তর্পণে এক-পা এক-পা করে জলের মধ্যে শিকার খুঁজে বেড়ায়; এইভাবে মাঝে মাঝে এদিক ওদিক ঠোঁট চালনা ক'রে বা পা দিয়ে জলের ভিতর সামান্য আলোড়ন তুলেও ওরা শিকারকে মুখের কাছে তাড়িয়ে আনবার চেষ্টা করে। যে দিকের পা-টি দিয়ে জল আলোড়িত করছে সেই দিকের ডানাটির সাহায্যেও আচমকা এক-একটা ঝাপটা মেরে শিকারকে একেবারে ঠোঁটের

সামনে এনে ফেলবার চেষ্টা করে। জলের ধারের উঁচু গাছের ডালে এরা বসতে ভালোবাসে। ওড়ার সময় কিছুক্ষণ পক্ষসঞ্চালনের পর খানিকক্ষণ করে শুধু হাওয়ায় ভেসে থাকে, তা ছাড়া এই জাতীয় অন্য সব পাখিদের মতোই, এদেরও দেখা যায়, দুপুরের প্রখর রৌদ্রে উর্ধ্বশ্বাসে দীর্ঘসময় ধরে বৃত্তাকারে ভেসে বেড়াতে। লম্বা লম্বা কাঠি দিয়ে মাচার মতো বাসা বানায় এরা, বাসার মধ্য ভাগটি একটু গভীর করে সেখানে বিছিয়ে দেয় জলজ উদ্ভিদের ডাঁটা আর পাতা। জলের মধ্যে অথবা জলের পাশে অবস্থিত গাছেই ওদের বাসা দেখা যাবে, কখনো কখনো একই গাছে থাকে একসঙ্গে 10/12টি বাসা। এরাও পানকৌড়ি, ইগ্রেট প্রভৃতি পাখিদের সঙ্গে একই জায়গায় মিলে মিশে থাকে। এদের ডিমের সংখ্যা 3 থেকে 5টি, ডিমের রঙ ফ্যাকাশে সাদা, কখনো কখনো ডিমের গায়ে ছিট্ ছিট্ দাগও দেখা যায়।

এই জাতের পাখিদের মধ্যে এদেশে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় **মুক্ত চঞ্চু (Openbilled) স্টর্ক (Anastomus oscitans)**

চিত্র নং 10 :

হিন্দী নাম— গুংগ্লা বা ঘুংগিল্।

বাংলা নাম— শামুক খোর।

এগুলির উচ্চতা এক মিটারের চেয়ে কম। এদের রঙে সাদা অথবা ধূসরাভ সাদা, তবে ডানায় আছে কালো রঙের ছোপ, দূর থেকে দেখলে অনেক সময় এদের যাযাবর সাদা স্টর্কদের সঙ্গে ভুল করবার সম্ভাবনা আছে। তবে এদের অদ্ভুত লালচে কালো রঙের খিলানের মতো ধনুকাকৃতি ঠোঁট, আর দুই ঠোঁটের মাঝখানে সরু ফাঁকটি দেখলে চিনতে ভুল হওয়ার কথা নয়। দুটি তিনটি

একসঙ্গে অথবা আরো বড়ো দল বেঁধে এই পাখিরা ঝিল আর জলাভূমিতে ঘুরে বেড়ায়। সাধারণভাবে এদের ব্যবহার আর চাল-চলন স্টর্ক গোষ্ঠীর অন্য পাখিদের মতোই কিন্তু ওদের ঐ অদ্ভুত গড়নের ঠোঁটের যে কী প্রয়োজন তা আজও ঠিক করে বোঝা যায় নি। এই পাখিদের একটা বিশেষ খাদ্য হচ্ছে বড়ো বড়ো শামুক, সেই শামুকগুলিকে ঠিকমতো বাগিয়ে ধরবার জন্য অবশ্য এইরকম ঠোঁটের দরকার হতে পারে। ঠোঁটের মাঝখানের ঐ ফাঁকটিতে রেখে ওরা শামুকের শক্ত খোলাটা ফাটিয়ে নেয়, তারপর ভিতরের নরম প্রাণীটিকে টেনে বার ক'রে আহার করে। তা ছাড়া ব্যাঙ, মাছ, কাঁকড়া, বড়ো বড়ো কীটপতঙ্গ এবং আরো নানা রকম ক্ষুদ্র প্রাণী এদের খাদ্যতালিকায় আছে। পানকৌড়ি বক প্রভৃতি জলচর পাখিদের সঙ্গে একই অঞ্চলে এই শামুকখোরদের বাস করতে দেখা যায় বড়ো বড়ো দল বেঁধে। গোলাকার মাচার মতো বাসা বানায় এরা, বাসার মাঝের গভীর জায়গাটিতে বিছিয়ে রাখে জলজ গাছপালার পাতা আর ডাঁটা। সাধারণত লোকালয়ের কাছাকাছি জলের ধারে বা জলের মধ্যে দাঁড়ানো গাছের ডালে একসঙ্গে অনেকগুলি করে এদের বাসা দেখা যায়। এরা ডিম পাড়ে 3টি বা 4টি, ডিমগুলির রঙ বিবর্ণ সাদা, ডিমের গায়ে কোনো ছিটে বা দাগ থাকে না।

এদেশের স্টর্কদের মধ্যে আকারে সবচেয়ে বড়ো হচ্ছে,

অ্যাডজুট্যান্ট স্টর্ক (Leptoptilos dubius) চিত্র নং 11 :

হিন্দী নাম— হাড়গিলা, গড়ুর বা ঢেঙ্ক্।

বাংলায়ও এদের বলে হাড়গিলে বা হাড়গিলা। উচ্চতায় এগুলি

প্রায় $1\frac{1}{2}$ মিটার। গায়ের রঙ ফ্যাকাশে কালো, ধূসর আর ময়লা ধরনের সাদায় মেশানো, ঠোঁট হলুদ রঙের চতুষ্কোণ ভারী গোঁজের আকৃতিবিশিষ্ট। এর প্রধান বিশেষত্ব হল বুকের কাছের পালকহীন চামড়ার লম্বা ঝুলন্ত থলিটি; এই থলিটির দৈর্ঘ্য প্রায় 30 সেন্টিমিটার। প্রায় শুষ্ক জলাভূমি অথবা লোকালয়ের আশেপাশে যেখানে আবর্জনা ফেলা হয় সেই-সব জায়গায় এদের দেখা পাওয়া যায়, অনেক সময় একলাই, কখনো একসঙ্গে কয়েকটি পাখিও থাকে, কিন্তু খুব বেশি সংখ্যায় এরা একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায় না। আহারের সন্ধানে এই পাখিরা যেভাবে ভারিক্কি চালে পায়চারি করে বেড়ায় তাই দেখেই ইংরাজীতে ওদের অ্যাড্‌জুট্যান্ট্ স্টর্ক নামটি দেওয়া হয়েছে। এদের গলার ঝুলন্ত থলিটির প্রয়োজনীয়তা কী সেটা ঠিক বোঝা যায় না, তবে এটি নাকের ছিদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত একটি হাওয়ার থলি, গলনালীর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অনেকে হয়তো ভাবেন ওটা ওদের খাবার জমা রাখার থলি কিন্তু আসলে খাওয়ার সঙ্গে ঐ থলিটির কোনোই সম্বন্ধ নেই। হাড়গিলেরা আবর্জনা, এঁটোকাঁটা ইত্যাদি তো খায়ই, তা ছাড়া যে-কোনো প্রাণীর মৃতদেহ পেলে এরাও শকুনদের সঙ্গেই ভোজে বসে যায়। মরা বা জ্যান্ত মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ, ছোটোখাটো জীবজন্তু, পঙ্গপাল প্রভৃতি বড়ো বড়ো পতঙ্গ কোনো কিছুতেই এদের অরুচি নেই, সব-কিছুই নির্বিকারে খেয়ে নেয়। এদের ওড়া খুব সচ্ছন্দ নয়, একটু ভারী ভাবে যথেষ্ট শব্দ ক'রে এরা ওড়ে আর আকাশে উঠবার আগে, প্রবলভাবে পক্ষ সঞ্চালন করে মাটির ওপর কিছুটা দৌড়ে যায়। এই জাতের অন্য পাখিদের মতো হাড়গিলেরাও উষ্ণতা ভালোবাসে এবং রৌদ্রালোকিত দিনে ঊর্ধ্ব আকাশে বৃত্তাকারে উড়ে বেড়ায়।

মাঝে মাঝে বিশ্রামের সময় এরা হাঁটু ভেঙে পা ছুটি সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মাথাটি ঘাড়ের মধ্যে গুঁজে এমন মজার ভঙ্গীতে বসে থাকে, দেখলে মনে হয় বেচারীদের দুঃখের বুঝি সীমা নেই। বড়ো পাথরের খাঁজে বা জঙ্গলের বড়ো কোনো গাছের ডালে এরা বিরাট আকারের বাসা বাঁধে, কখনো কখনো কাছাকাছি কয়েকটি বাসাও দেখা যায়। ডিম এদের হয় একেকবারে 3/4টি, ডিমের রঙ যদিও সাদা তবে বেশ ময়লা ধরনের।

কেরালা, লঙ্কাদ্বীপ ও আরো কোনো কোনো জায়গায় আর-এক ধরনের হাড়গিলে লেসার অ্যাডজুট্যাণ্ট (Lesser Adjutant) দেখা যায় (L. javanicus)। এগুলির ওপর দিকটা উজ্জ্বল চকচকে কালো এবং শরীরে নিচের অংশ সাদা, আর গলায় চামড়ার থলিও এদের থাকে না।

এদেশে থ্রেস্কিওর্নিথিডি (Threskiornithidae) গোষ্ঠীর পাখিদের প্রতিনিধি বলা হয়ে ইবিস্ (Ibises) আর স্পুনবিলদের (Spoonbill)। সাদা ইবিস্ (Threskiornis melanocephala) হিন্দীতে বলে মুণ্ডা বা সফেদ বাজা, বেশ বড়োসড়ো সাদা রঙের জলাভূমির পাখি, আকারে প্রায় বড়ো আকারের মুরগীর মতো, মাথা আর গলা কুচকুচে কালো, ঠোঁট লম্বা, শক্ত কালো রঙের এবং নিচের দিকে বাঁকানো। প্রজনন ঋতুতে ঘাড়ের কাছে আর ডানায় শ্লেট রঙের ছোপ দেখা দেয় এবং গলার নিচের অংশে গজায় বাহারী পালক। এরাও দলবদ্ধভাবেই থাকে, এবং অনেক সময়েই বহু পাখি থাকে এক-একটি দলে। ঝিল আর জলাভূমির আশেপাশেই ওদের দেখা পাওয়া যায়। স্পুনবিল, স্টর্ক আর

ঐ জাতীয় অন্য পাখিদের সঙ্গে এরাও জলা জায়গা বা জলকাদায় ভরা ধানক্ষেতের মধ্যে শিকার খুঁজে বেড়ায়, সাঁড়াশীর মতো আধ-খোলা ঠোঁটে কাদার মধ্যে চলে আহারের অনুসন্ধান। কাদাজলে এইভাবে খুঁজতে খুঁজতে অনেক সময় পুরা মাথাটাই এরা জলের তলায় ডুবিয়ে দেয়। শামুক, গুগলি, কাঁকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি শক্ত-খোলাবিশিষ্ট জীব, পোকামাকড়, ব্যাঙ এবং কখনো কখনো মাছও এরা খেয়ে থাকে। তাড়া খেলে উড়ে গিয়ে বসে গাছের ডালে, তা ছাড়া বিশ্রামের সময়ও গাছের ডালেই আশ্রয় নেয়। এরা বেশ জোরে এবং সোজাভাবে উড়তে পারে, ওড়ার সময় লম্বা ঠোঁট আর গলা থাকে সামনের দিকে প্রসারিত এবং পা দুটি দেখা যায় লেজের তলা দিয়ে। কিছুক্ষণ জোরে জোরে পক্ষসঞ্চালন করবার পর অল্প সময় এরা ডানা স্থির রেখে ভেসে যায়। তারপর আবার পক্ষ সঞ্চালন আরম্ভ করে। এই পাখিরা সারাদিন যেখানে চরে বেড়ায় সেখানে যাবার এবং সেখান থেকে ফেরার পথে আকাশে ইংরাজী ভি অক্ষরের মতো কোণ রচনা করে বা ঢেউ খেলানো কোণাকুণি রেখায় দল বেঁধে ওড়ে, এই ব্যাপারে এদের হাঁসেদের সঙ্গে খুব মিল আছে। স্টর্ক আর স্পুনবিলদের মতোই এদেরও কণ্ঠে স্বর-উৎপাদক পেশীর অভাব, কিন্তু প্রজনন ঋতুতে এরাও গলা থেকে একরকম আওয়াজ বার করে, শব্দটা খুব জোর নয় অবশ্য, তবে তাতে এক ধরনের কম্পন আছে, অনেক দূর থেকে শুনলে মনে হয় বহুলোক একসঙ্গে গুঞ্জনস্বরে কথা বললে যেমন শোনায় অনেকটা সেই ধরনের আওয়াজ।

সাদা ইবিসদের বাসাও কাঠি দিয়ে তৈরি মাচার মতো, তাতে আর কোনো আস্তরণও বিছিয়ে দেয় না এরা। সাধারণত গ্রাম বা

লোকালয়ের কাছাকাছি জলের মধ্যে অথবা জলের পাশে অবস্থিত বড়ো গাছে এরা বাসা বাঁধে এবং পানকৌড়ি, গয়ার প্রভৃতি পাখিদের সঙ্গে একই জায়গায় বসবাস করে। ডিমের সংখ্যা 2 থেকে 4টি এবং ডিমের রঙ নীলাভ বা সবুজাভ সাদা, কোনো কোনো ডিমে হলদে বাদামী ছিটও দেখা যায়।

কালো ইবিস (Pseudibis papillosa)— চিত্র নং—12 :
হিন্দী নাম—কালা বাজা বা করাঙ্কুল।
বাংলা নাম—কালো কাস্তেচরা বা দোচরা।

এই কালো রঙের পাখিগুলি আকারে বেশ বড়ো, অনেকটা সাদা ইবিস্‌দেরই মতো। এদের কাঁধের কাছে একটা বেশ চোখে পড়ার মতো সাদা ছোপ আছে আর পায়েব রঙ ইঁটের মতো লাল। পালকহীন ন্যাড়া কালো মাথাটিব ওপর লাল রঙের ত্রিকোণাকৃতি ছোপটি দেখে এদের অভ্রান্তভাবে চিনতে পারা যায়। চাষের জমির আশেপাশে খোলা মাঠে এদের দেখা পাওয়া যায়, 3/4টি থেকে 10টি পর্যন্ত পাখি একসঙ্গে কাছাকাছি চরে বেড়াতে দেখা কিছু আশ্চর্য নয়। সাদা ইবিস্‌দের মতো এবা জলের ওপর তত বেশি নির্ভরশীল নয়, জলা জায়গা আশেপাশে না থাকলেও এদের বিশেষ-কিছু অসুবিধা হয় না। শস্যের দানা আর কীটপতঙ্গই এই পাখিদের প্রধান খাদ্য কিন্তু ছোটোখাটো সাপ, কেন্নোজাতীয় জীব বা গিরগিটি ইত্যাদিও এরা বেশ তৃপ্তি সহকারেই খেয়ে থাকে। এই পাখিরা নিজেদের পছন্দমতো চরে বেড়াবার জায়গা পেলে রোজ নিয়মিত সেইখানেই আসে আর রাত্রের আশ্রয়ের জন্য ফিরে যায় নিজেদের নির্দিষ্ট বৃক্ষটির শাখায়। এরাও কিছুক্ষণ

পক্ষসঞ্চালনের পর অল্পসময় শুধু হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দেয় তারপর আবার পক্ষসঞ্চালন করে এবং আকাশে ওড়ে ইংরাজি ভি অক্ষরের মতো কোণ রচনা ক'রে। এই পাখিদেরও ডাকতে শোনা যায় না শুধু কখনো কখনো ওড়ার সময়, দুই বা তিন-স্বরবিশিষ্ট একটা তীক্ষ্ণ নাকীসুরে চিৎকার করতে শোনা যায়। এই চিৎকার শুনলে মনে পড়ে যায় ব্রাহ্মণী হাঁসের ডাক। এই কালো ইবিসরা অন্য জাতের পাখিদের সঙ্গে এক পাড়ায় বাসা বাঁধে না, তবে একই গাছে এদের নিজেদের 2/3টি বাসা একসঙ্গে দেখা যায়। এদের বাসার চেহারা অনেকটা বড়োসড়ো একটি বাটির মতো। কাঠিকুটি দিয়ে বাসা বানিয়ে তার মধ্যে ওরা বিছিয়ে দেয় খড় আর পালকের আস্তরণ। বড়ো গাছের একেবারে মগডালে আর নয়তো তাল, নারকেল জাতীয় গাছের মাথায়ই এরা বাসা বাঁধতে ভালোবাসে। কখনো কখনো ঈগল বা শকুনের পুরোনো পরিত্যক্ত বাসাও ওদের দখল করতে দেখা যায়। ডিমের সংখ্যা 2 থেকে 4টি, ডিমের রঙ উজ্জ্বল অথচ ফিকে সবুজ, কোনো কোনো ডিমে বাদামী রঙের ছিটও দেখা যায়।

ইবিস্‌দেরই কনিষ্ঠ জ্ঞাতি বলা চলে স্পুনবিল পাখিদের (Platalea leucorodia), চিত্র নং—13 :

হিন্দী নাম— চামচা বাজা বা ডাবিল্।

বাংলায় বলে— খুন্তে বক।

কিন্তু ইবিস্‌দের জ্ঞাতি হলেও এই স্পুনবিল বা খুন্তেবকদের ঠোঁটের গড়ন একেবারে আলাদা, এদের ঠোঁট কালো আর হলদে মেশানো চওড়া চ্যাপ্টা ধরনের এবং আগার দিকটা চামচের মাথার মতো চওড়া। আকারে এই পাখিগুলি গৃহপালিত হাঁসের চেয়ে

কিছুটা বড়ো, উচ্চতায় প্রায় 45 সেন্টিমিটার, পা এবং গলা লম্বা গড়নের, গায়ের রঙ ধপধপে সাদা। প্রজনন ঋতুতে এদের মাথায় ফিকে হলুদ রঙের লম্বা ঝুঁটি গজায় এবং গলার নিচের দিকে বুকের কাছে দেখা দেয় হলদে রঙের ছোপ। এই পাখিগুলি একলাও থাকে আবার 10টি বা 20টি বা তার চেয়েও বেশি পাখি একসঙ্গে দল বেঁধেও চরে বেড়ায়, অন্যান্য জলচর পাখিদের কাছা-কাছিই এদের দেখা পাওয়া যায়। এই প্রজাতিটি অবশ্য ভারতেরই বাসিন্দা, কিন্তু শীতকালে অন্য দেশ থেকেও এই জাতের পাখি এদেশে চলে এসে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ঝিল আর জলায়, কর্দমাক্ত নদীতীরে, নদীর মোহানার কাছে পলিজমা চরে এই পাখিদের প্রচুর সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যাবে। সকালে আর সন্ধ্যার দিকেই এই পাখিরা অল্প জলে খাবার খুঁজে বেড়ায়, দুপুর বেলাটা বেশিরভাগ ওরা বিশ্রাম করে বালির চড়ায়। দিনের বিচরণক্ষেত্র আর রাতের আশ্রয়স্থলের মধ্যে যাতায়াত করবার সময় ওরা দল বেঁধে অনেক উঁচু আকাশে কোণাকুণি রেখায় বা ইংরাজি ভি অক্ষরের আকৃতি রচনা ক'রে ওড়ে। সজোর পক্ষসঞ্চালন সত্ত্বেও গতি এদের একটু মন্থর। ওড়ার সময় এদের গ৹ ' আর পা প্রসারিত হয়ে থাকে। ব্যাঙ ব্যাঙাচি, শামুক, গুগলি, জলজ কীটপতঙ্গ এই-সবই এদের প্রধান খাদ্য কিন্তু এ সব ছাড়া শাকসব্জীও এদের খেতে দেখা যায়। এই পাখিদের খাবারের খোঁজে অল্প জলে ঝিলের তীর ঘেঁষে সাঁতার দিয়ে বেড়াতে দেখা যায়, গলাটি বাড়িয়ে আধখোলা ঠোঁটে জলের তলার কাদা ঘেঁটে এরা শিকার খোঁজে। যেখানে প্রচুর খাবারের সন্ধান পাওয়া যায় সেই জায়গাটা এরা দলবেঁধে বার বার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত

ঐ ভাবে প্রায় চষে ফেলে। মাঝে মাঝে নিচু গলায় একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করা ছাড়া আর কোনোরকম ডাক এদের কণ্ঠে শোনা যায় না। খুন্তে বক নিজেদের দলের সঙ্গেই এক জায়গায় বাসা বাঁধে আর নয়তো বক, পানকৌড়ি, স্টর্ক, ইবিস প্রভৃতি পাখিদের সঙ্গে মিলে মিশে একই এলাকায় বসবাস করে। এরাও ঝিলের ধারে বা ঝিলের মধ্যের বড়োগাছে কাঠি দিয়ে প্রকাণ্ড মাচার মতো বাসা বাঁধে আর লোকালয়ের কাছাকাছি থাকতেই ভালোবাসে। একবারে এরা সাধারণত 4টি করে ডিম পাড়ে, ডিমের রঙ আধময়লা সাদা, তাতে মাঝে মাঝে লালচে বাদামী রঙের ছিটও থাকে।

ভারতে ফোনিকপ্‌টেরিডি (Phoenicopteridae) গোষ্ঠীর পাখিদের একমাত্র প্রতিনিধি ফ্লেমিংগো (Phoenicopterus roseus) পাখিরা। চিত্র নং—14 :

হিন্দী নাম— বগ্‌ হংস বা চরজ বাগ্‌গো।

বাংলায় কোনো কোনো অঞ্চলে এদের নাম ধানঠুটি।

ফ্লেমিংগো পাখি আকারে প্রায় গৃহপালিত রাজহাঁসের সমান, গায়ের রঙ ফিকে-গোলাপি ও সাদা, মাংসহীন লম্বা সোনালি রঙের পা এবং গলা লম্বা ও বাঁকানো গড়নের। সোজা হয়ে দাঁড়ালে এই পাখিটির উচ্চতা প্রায় $1\frac{1}{2}$ মিটার। এদের ভারী গড়নের গোলাপি রঙের ঠোঁটটি হঠাৎ মাঝামাঝি জায়গা থেকে যেন মচকে ভেঙে নিচের দিকে নেমে গেছে, এটা এদের একটা বিশেষত্ব। তা ছাড়া এদের পায়ের আঙুলগুলিও হাঁসেদের মতো চামড়া দিয়ে জোড়া। যখন দলবেঁধে ওরা আকাশে ওড়ে ওদের কালো-পাড়-দেওয়া

উজ্জ্বল গোলাপি ডানা ছড়িয়ে পড়ে দুপাশে, সত্যিই সে একটা দেখবার মতো দৃশ্য। ফ্লেমিংগোরা ঝিল, সমুদ্রতীরের ছোটো ছোটো নোনাজলের হ্রদ বা জোয়ারের জল সরে যাওয়া কাদা জমিতে চরে বেড়ায়। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র এবং পাকিস্তান ও লঙ্কাদ্বীপেও এদের দেখা পাওয়া যায়। দেশের মধ্যেই এরা বিভিন্ন ঋতুতে স্থান পরিবর্তন করে। এই পাখিগুলি ছোটো বা বড়ো বড়ো দল বেঁধে ঘোরে, কোনো কোনো দলে, এমন-কি হাজার হাজার পাখিও থাকে। আহারের সন্ধানে এরা অল্প জলে গলা বাড়িয়ে মাথাটি জলের তলায় ডুবিয়ে ঘুরে বেড়ায়। অদ্ভুত গড়নের বাঁকানো ঠোঁটটির মাঝখানের উঁচু অংশটি দিয়ে জলের তলার কাদা ঘেঁটে ঘেঁটে ওরা শিকার খোঁজে। ওপরের ঠোঁটের ঐ উঁচু জায়গাটির সাহায্যে ওরা জলের তলার নরম মাটিতে একটা ছোটো গর্ত করে, সেখানে কাদাজল জমা হয় তারপর ওরা ওদের চিরুনির মতো খাঁজকাটা ঠোঁটের প্রান্তভাগ দিয়ে সেই কাদাজলের মধ্যে থেকে শিকারকে ছেঁকে তোলে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, শিকার আটকা পড়ে ফ্লেমিংগোর মুখের মধ্যে। এরা দরকার হলে বেশ ভালোই সাঁতার দিতে পারে, গভীর জলে সাঁতার দিয়ে যখন ওরা জলের তলা থেকে খাবার খোঁজে তখন জলের ওপর দেখা যায় শুধু ওদের লেজের ডগাটুকু। শামুক, গুগলি, পোকামাকড়, জলজ উদ্ভিদের বীজ প্রভৃতি এদের প্রধান খাদ্য। ফ্লেমিংগোরা ওড়ার সময় বেশ দ্রুত পক্ষসঞ্চালন করে। হাঁসেদের মতোই এরাও আকাশে কোণাকুণি ঢেউ-খেলানো রেখা বা ভি অক্ষরের মতো কোণ রচনা করে ওড়ে। ওড়ার সময় সরু লম্বা গলাটি থাকে সামনের দিকে প্রসারিত আর পা-দুটি পিছনের দিকে টান করে

ছড়ানো থাকে। এদের ডাক শোনা যায় না বললেই চলে, তবে মাঝে মাঝে অনেকটা রাজহাঁসের ডাকের মতো একটা শব্দ এরা করে থাকে। অবশ্য ঝাঁক বেঁধে যখন ওরা শিকার করে আর খায় তখন বেশ শব্দ হয়। আমাদের জানাশোনার মধ্যে একমাত্র কচ্ছের রাণেই এই ফ্লেমিংগো পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে জমা হয় ডিম পাড়ার জন্য। যদি জলের অবস্থা সন্তোষজনক হয় তা হলে অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত এই একটি জায়গায় অজস্র ফ্লেমিংগোর দেখা পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন এই সময় এখানে 5 থেকে 10 লক্ষ ফ্লেমিংগো এসে জমা হয় এবং তাই কচ্ছের এই প্রজনন-এলাকাটাই হয়ে ওঠে বিশ্বের বৃহত্তম ফ্ল্যামিংগো নগরী। নরম কাদা দিয়ে এরা উঁচু ঢিপির মতো বাসা বানায়, সূর্যের প্রখর উত্তাপে নরম কাদা দেখতে দেখতে শুকিয়ে শক্ত হয়ে ওঠে, সাধারণত এদের এই বাসাগুলির উচ্চতা হয় 30 সেন্টিমিটারের কাছাকাছি। বাসাটির ছাদের কাছাকাছি একটা সমতল চ্যাপ্টা জায়গাতে প্যানকেকের মতো ঈষৎ খাঁজ থাকে। সেই জায়গাটিতেই রাখা থাকে 2টি বা, কখনো একটি মাত্র ডিম। ফ্লেমিংগো বাসার মধ্যে পা মুড়ে বসে ডিমে তা দেয়। এই ঢিপির মতো বাসার মধ্যে ফ্লেমিংগো কখনো সোজা হয়ে কল্পকাহিনীর বিবরণের মতো, দাঁড়িয়ে ডিমে তা দেয় না।

অ্যানসেরিফর্মিস (Anseriformes) বর্গের পাখিরা খাদ্য এবং শিকার হিসেবে মানুষের কাছে বড়ো প্রিয়। রাজহাঁস, পাতিহাঁস প্রভৃতি নানা জাতের হাঁসেরা পড়ে এই বর্গের মধ্যে। টিল হচ্ছে একরকম খুব ছোটো হাঁস, যেমন ঘুঘু পাখি, ছোটোমাপের পায়রা

ছাড়া আর-কিছুই নয়, তেমনি টিলরাও শুধু নামেই আলাদা, আসলে ওরাও হাঁস, শুধু আকারে ছোটো।

সোয়ান (Swan)-জাতীয় ভ্রাম্যমাণ বড়ো রাজহাঁসরা খুব বেশি শীত পড়লে তবেই উত্তর ইউরোপ ও উত্তর এশিয়া থেকে এদেশে আসে। প্রতিবছর ওদের দেখা পাওয়া যায় না, তাই ওদের এ আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া যায়। গুজ (goose) বা রাজহাঁসদের যে-কটি প্রজাতি প্রতি শীতকালে আমাদের দেশে আসে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায় বারহেডেড্ গুজ বা মাথায় দাগওয়ালা রাজহাঁসদের (Anser indicus) চিত্র নং—15 :

হিন্দী নাম—হংস, সাওয়ান্, বিরোয়া।

বাংলা নাম—রাজহাঁস।

এগুলি আকারে গৃহপালিত রাজহাঁসদের মতোই বড়ো আর রঙ এদের প্রধানত ধূসর, বাদামী এবং সাদায় মেশানো। সাদাটে মাথা আর গলার দুপাশ, হলদে ঠোঁট আর মাথার পিছনের দিক ঘিরে দুটি সুস্পষ্ট কালো দাগ— এই হচ্ছে এদের চিনবার নির্ভুল চিহ্ন। গম আর ছোলার সবুজ ক্ষেতের পাশে, নদী বা ঝিলের জলে ওরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় প্যাঁক প্যাঁক শব্দে চারদিক মুখরিত ক'রে। সাধারণত 15/20টি হাঁস একসঙ্গে থাকে, কখনো ছোলা ও গমের ক্ষেতে ঢুকে কলরব করে খেতে শুরু করে দেয় আর নয়তো দুপুরের রৌদ্রে নদীর বালির চরে বসে বিশ্রাম করে। শিকারীদের উৎপাতে এই পাখিদের খুবই সতর্ক থাকতে হয়, সেইজন্যই ওরা বেশিরভাগ আহারের সন্ধানে বের হয় সন্ধ্যায় আর রাত্রে। সূর্যাস্তের সময়েই ওদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়, ঝাঁকে ঝাঁকে ওরা ডানা মেলে উঠে পড়ে আকাশে, তারপর অনেক উঁচু

দিয়ে ভি-এর মতো কোণ রচনা করে অথবা তির্যক রেখায় উড়ে চলে নিজেদের প্রিয় বিচরণ-ক্ষেত্রের দিকে। সব রাজহাঁসদের মতোই এরাও মাঠে মাঠে চরে বেড়ায় আর নয়তো অল্প জলে মুখ ডুবিয়ে ডুবুরীর মতো শিকার খোঁজে। রবিশস্যের কচি সবুজ চারা, শস্যের দানা, জলজ উদ্ভিদের বীজ প্রভৃতি এদের প্রধান খাদ্য। এই হাঁসেদের কণ্ঠস্বর বেশ সুরেলা, ডাকটা শুনতে লাগে অনেকটা অওঙ্, অওঙ্। যারা ফাঁদ পেতে পাখি ধরে তাদের কানে এ ডাক একবার পৌঁছলে উত্তেজনায় তারা অস্থির হয়ে ওঠে। এই মাথায় দাগওয়ালা বারহেড হাঁসেদের ধরা খুব কঠিন, এরা অসাধারণ রকমের ধূর্ত আর সাবধানী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যেখানে শিকারী আর পাখিধরাদের উৎপাত নেই সেখানে এই পাখিরাই খুব শান্ত আর পোষমানা স্বভাবের পরিচয় দেয়। তিব্বতে বৌদ্ধেরা এই পাখিদের বিরক্ত করে না, তাই সেখানে ওরা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায় লোকালয়ের আশেপাশে।

আমাদের দেশের সবচেয়ে কাছাকাছি বারহেডেড হাঁসেদের জন্মভূমি লাদাখ। অনেক উঁচুতে কোনো হ্রদের তীরে ওরা বাসা বাঁধে, বাসাটা একটু গর্তের মতো, নরম সরস গাছগাছড়া দিয়ে গড়া, তার মধ্যে থাকে পালক আর ঘাসের আস্তরণ। এরা ডিম পাড়ে 3টি বা 4টি, ডিমের রঙ হাতির দাঁতের মতো সাদা।

প্রব্রজনশীল রাজহাঁসেদের আর-একটি প্রজাতির নাম গ্রেল্যাগ (Greylag) (Anser anser) হিন্দী নাম— কাজ।

আমাদের দেশে যতরকম গৃহপালিত রাজহাঁস দেখা যায় তাদের সবাইকার পূর্বপুরুষ নাকি এরাই। এদের পশ্চাদ্দেশ ধূসর রঙের

এবং ঠোঁটের রঙ কাঁচা মাংসের মতো গোলাপি। এই হাঁসেরা ঝিলের জলেই থাকতে বেশি ভালোবাসে, বারহেডদের মতো নদী এদের অত প্রিয় নয়।

শীতের অতিথি প্রায় 20টি প্রজাতির বুনো হাঁসেদের মধ্যে মাত্র 5টি কি 6টি প্রজাতির জন্মভূমি ভারতেই, বাকিরা আসে বেশিরভাগ সাইবেরিয়া থেকে। যে-সব হাঁসেদের জন্মভূমি এদেশেই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় স্পটবিল বা গ্রে ডাকদের (Anas poecilorhyncha)। চিত্র নং— 16 :

হিন্দী নাম— গর্মপাই, গুগ্রাল বা লাড্ডিম।

বাংলা নাম— টিপঠুঁটো বা মেটে হাঁস।

আকারে স্পটবিলরা পোষা হাঁসের মতোই, এদের সারা গায়ের পালকে হালকা আর গাঢ় বাদামী রঙের ছোপ সুন্দর নকশার মতো দেখায়। তা ছাড়া ডানার প্রান্তভাগে সাদা কালো আর ধাতব-সবুজ রঙের ছোপ দেখেও এদের চিনতে কিছু অসুবিধা হয় না। আরও কয়েকটি সুস্পষ্ট চিহ্ন হচ্ছে উজ্জ্বল কমলা রঙের পা এবং হলুদ রঙের ডগাওয়ালা কালো ঠোঁট, সেই ঠোঁটের গোড়ার দিকে আবার কপালের দুপাশে দুটি উজ্জ্বল কমলা লাল রঙের দাগও আছে। জলজ গাছপালায় ভরা অগভীর ঝিলে এরা জোড়ায় জোড়ায় অথবা ছোটো ছোটো দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু শীতের অতিথি যাযাবর পাখিদের মতো একসঙ্গে প্রচুর সংখ্যায় এদের কখনো দেখা যাবে না। স্পটবিলরা হচ্ছে সেই দলের হাঁস যারা জমির ওপর থেকেই খাবার খোঁজে, জলাভূমি অঞ্চলে বা কাদাজল ভরা ধান-ক্ষেতে ওদের চরতে দেখা যায়। মাঝে মাঝে ওরা অবশ্য অগভীর জলের তলায় কাদা ঘেঁটেও খাবার খোঁজে, তখন ওদের মুখ থাকে

জলের তলায় আর দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্ত লেজের ডগা আর পা ছুটি জলের ওপর নড়তে থাকে বেশ মজার ভঙ্গিতে। এই হাঁসেরা প্রধানত নিরামিষভোজী, জলজ উদ্ভিদের ডাঁটা ও বীজ, ধান এই-সবই এদের খাদ্য। অবশ্য পোকা-মাকড় ও গুগ্‌লি শামুক একেবারে খায় না তা নয়। উড়বার শক্তি এদের অসীম, শিকারীদের কাছেও এরা বিশেষ লোভনীয় কারণ এদের মাংস অতি উপাদেয়। এই হাঁসেরা সাধারণত বিশেষ ডাকে না। এদের পুরুষ হাঁসের ডাক বেশ কর্কশ শিস দেওয়ার মতো আর স্ত্রী হাঁসেরা সাধারণত খুব ভয় পেলেই তারস্বরে প্যাঁক প্যাঁক করে ডেকে ওঠে। যদি জলের অবস্থা ও পরিবেশ সুবিধাজনক হয় তা হলে এই হাঁসেরা প্রায় সারা বছর ধরেই ডিম পাড়ে। পুকুর বা জলার ধারে ঝোপঝাড়ের আড়ালে এরা ঘাসপাতা দিয়ে নরম বাসা বানায় আর বাসার মধ্যে বিছিয়ে দেয় পালক। এক-এক বারে এরা 7টি—9টি, এমন কি কখনো 12টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে, ডিমের রঙ ধূসর নয়তো সবুজাভ সাদা, ডিমের গায়ে কোনো দাগ থাকে না।

ছোটো হুইস্‌লিং টিল (Dendrocygna javanica) চিত্র নং—17 :

হিন্দী নাম— সিল্লী বা ঝিলকাহি।

বাংলা নাম— মরাল।

এই পাখিগুলি স্পটবিলদের চেয়ে আকারে ছোটো এবং বাদামী রঙের। এই মাপের অন্য কোনো হাঁসের সঙ্গে এদের ভুল করবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ওড়ার সময় এদের মুখে যে সুতীক্ষ্ণ শিসের মতো ডাকটি শোনা যায়, সেটিও এদের চিনিয়ে দিতে সাহায্য

করে। জলজ গাছপালায় ভরা পুকুর আর বিলে, নয়তো জলভরা ধানের ক্ষেতে এরা 10-15টি পাখি একসঙ্গে দল বেঁধে ঘোরে। জলের আশেপাশে গাছ থাকলে এরা খুব খুশি, কারণ তা হলে মাঝে মাঝে গাছের ডালে বিশ্রাম নেওয়ার সুবিধা হয়। এই বৃক্ষপ্রীতির জন্য এদের আরেকটি নাম ট্রি ডাক্ বা গেছো হাঁস। অনাবৃষ্টির সময় জলের খোঁজে এই পাখিরা প্রায়ই স্থান পরিবর্তন করে। এরা উড়তে খুব পটু নয়, ওড়ার সময় সর্বক্ষণ মুখে একরকম তীক্ষ্ণ শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে যেটা শুনতে লাগে অনেকটা সি-সিক, সি-সিক এই ধরনের, ডাকটা অনেকটা সাদা-কালো খঞ্জন পাখিদের মতো। তবে উড়তে ভালো না পারলেও হাঁটতে পারে এরা খুব, আর জলে ডুব দিতেও বেশ ওস্তাদ। শামুক, পোকা-মাকড়, মাছ, ব্যাঙ্ এ-সব তো খায়ই, তা ছাড়া কচি ডাঁটা, চারা, ধান এ-সবও এদের খাদ্যতালিকাভুক্ত। এই হুইসলিং টিলদের বাসা দেখা যায় সাধারণত জলের ধারে ঝোপের মধ্যে, জমির ওপর ঘাসপাতা দিয়ে বেশ গদীর মতো নরম করে বাসা বানায় ওরা, আবার কখনো কখনো জল থেকে বেশ দূরে কোনো গাছের গুঁড়ির খাঁজে বা গাছের কোটরের মধ্যেও ওদের বাসা বাঁধতে দেখা যায়। চিল বা কাকের পরিত্যক্ত বাসাও কখনো কখনো ওরা ব্যবহার করে। এদের ডিম হয় 7 থেকে 12টি, তবে সাধারণত 10টি ডিমই দেখা যায়, প্রথমে ডিমগুলির রঙ থাকে দুধের মতো সাদা, কিন্তু তা দিতে দিতে ক্রমশ সেগুলি বাদামী রঙ ধারণ করে।

বড়ো হুইস্‌লিং টিলও (D. bicolor) ভারতেরই বাসিন্দা, আকারে এরা লেসারদের চেয়ে একটু বড়ো আর এদের লেজের শেষ প্রান্তের উপরিভাগ বাদামী না হয়ে, সাদা রঙের হয়।

এদেশের বাসিন্দা বুনো হাঁসেদের মধ্যে সব থেকে আকারে ছোটো হচ্ছে কট্‌ন টিল (Nettapus coromandelianus) চিত্র নং— 18 :

হিন্দী নাম— গিরিয়া, গুরগুরা বা মোনিয়া।

বাংলা নাম— বালি হাঁস।

কট্‌ন টিলরা আকারে সাধারণ মুরগীর চেয়ে বড়ো নয়, এদের পালকে সাদা রঙই বেশি। পুরুষ হাঁসের পিঠের ওপরটা চকচকে কালো, মাথা, গলা আর শরীরের নিচের অংশ সাদা, তা ছাড়া গলার চারপাশ ঘিরে কলারের মতো একটি কালো দাগ আর ডানাতেও সাদার ছোপ আছে, সেটা বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ে ওড়বার সময়। এদের স্ত্রী হাঁসের রঙ ফিকে বাদামী, তাদের গলায় কালো দাগও নেই আর ডানায়ও কোনো বিশেষত্ব নেই। প্রজনন ঋতু ছাড়া অন্য সময় স্ত্রী আর পুরুষ হাঁসের চেহারার খুব বেশি তফাত চোখে পড়ে না শুধু পুরুষ হাঁসেদের ডানার বিশেষ ছোপটি ছাড়া। এই কট্‌ন টিলরা শুধু যে সবথেকে ছোটো হাঁস তাই নয়, এদেশের বাসিন্দা হাঁসেদের মধ্যে এদেরই ভারতের সবচেয়ে বেশি অঞ্চলে দেখা যায়। স্পটবিলদের সঙ্গে এদিক থেকে এদের মিল আছে। সাধারণত 5 থেকে 15টি পাখি এক-এক দলে ঘোরাফেরা করে তবে একসঙ্গে 50টি পাখির দলও একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। যে-কোনো রকমের পুকুর, ডোবা, রাস্তার পাশের খানায় জমা জল বা ধানক্ষেতের মধ্যে এদের দেখা পাওয়া যাবে, কেবল সেই জলে প্রচুর পরিমাণে ভাসমান জলজ উদ্ভিদ থাকা চাই। মানুষ এদের উত্ত্যক্ত না করলে এরাও খুব শান্ত আর পোষমানা স্বভাবের হয় এবং প্রায়ই দেখা যায় গ্রামের

পুকুরে নিত্যকর্মরত নরনারীর আশেপাশেই এরা নিশ্চিন্তমনে সাঁতার দিচ্ছে বা আহার খুঁজছে। গাছপালার ডাঁটা, শস্যের দানা এ-সব ছাড়া পোকামাকড়, শামুক গুগলি ইত্যাদিও এরা খায়। এই পাখিরা বেশ উড়তে পারে, আর পালক নির্মোচনের ঋতুতে যখন ওদের উড়বার ক্ষমতা থাকে না তখন, জলে ডুব দিয়ে ওরা আততায়ীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করে। ওড়ার সময় একটা অদ্ভুত ধরনের আওয়াজ করা ছাড়া আর-কোনো রকম ডাক এদের মুখে শোনা যায় না। জলের ধারে বা জলের মধ্যের কোনো গাছের ফোকরে, সাধারণত মাটির 2 থেকে 10 মিটার ওপরে এরা বাসা বাঁধে। ডিমের সংখ্যা 6 থেকে 12টি ; ছিটবিহীন ডিমগুলি হাতির দাঁতের মতো সাদা হয়। অনেকের বিশ্বাস সদ্য-রোঁয়া-গজানো বাচ্চাগুলিকে ওদের মা-বাবারা পিঠে বহন করে বাসা থেকে বার করে আনে, কিন্তু এ বিশ্বাসের কোনো ভিত্তি নেই। কটন টিলদের বাচ্চারা নিজেরা কারো সাহায্য না নিয়েই মাটিতে বা জলে নামে।

ফ্যালকনিফর্মিস্ (Falconiformes) বর্গের শিকারী পাখিদের প্রতিনিধি অ্যাক্সিপিট্রিডি (Accipitridae) গোষ্ঠীর (বাজ, ঈগল, শকুন, ওস্প্রে) এবং ফ্যালকনিডি (Falconidae) গোষ্ঠীর (ফ্যালকন) পাখিরা। এই দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করবার কোনো সুনির্দিষ্ট উপায় নেই। দুই গোষ্ঠীরই কাঁচা মাংস টেনে ছিঁড়ে খাবার জন্য ছোটো অথচ শক্ত বাঁকানো ঠোঁট এবং শক্তিশালী আংটার মতো নখ আছে। প্রথম গোষ্ঠীর পাখিদের ডানা চওড়া এবং ডানার প্রান্তভাগ গোল গড়নের। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর পাখিদের ডানা সরু লম্বাগড়নের এবং ডানার প্রান্ত ভাগ

ছুঁচালো; শরীরের গড়নও এদের লম্বাটে ধরনের। শিকারের পিছনে বিদ্যুৎগতিতে তাড়া করে যাবার উপযুক্ত ভাবেই এদের দেহ গঠিত। এদের মধ্যে কোনো কোনো পাখি (চিল, শকুন প্রভৃতি) আবর্জনা আর মৃত প্রাণীর মাংস খায় কিন্তু অন্যান্যরা, যেমন শিকরা বাজ, চড়াই বাজ প্রভৃতি অতর্কিতে আড়াল থেকে জীবন্ত প্রাণীকে তাড়া ক'রে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে হত্যা করে খায়। আবার ফ্যাল্‌কনরা আকাশ থেকে বিদ্যুৎগতিতে নেমে এসে ছোঁ মেরে শিকারকে তুলে নিয়ে যায়। সেইজন্যই হক বা বাজ পাখিরা লুকিয়ে শিকারের প্রতীক্ষা করার জন্য জঙ্গলের আড়াল খোঁজে আর ফ্যালকনরা ছোঁ মারবার সুবিধার জন্য খোঁজে খোলামেলা জায়গা।

গোষ্ঠী হিসাবে, ঈগল, ফ্যাল্‌কন প্রভৃতি পাখিদের অনর্থক বদনামের ভাগী হতে হয়েছে, কারণ ওরা নাকি অন্য নিরীহ পাখি ও প্রাণীদের হত্যা করে। এদের বেশ বিপজ্জনক জীব বলেই গণ্য করা হয় এবং এদের রক্ষা করবার কোনো ব্যবস্থাও নেই। কিন্তু এদের খাদ্য এবং খাদ্যাভ্যাসের প্রতি নজর দিলে দেখা যাবে ওদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ইঁদুর ও আরো নানারকম ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ, যাদের শিকার ক'রে এই পাখিরা আমাদের উপকারই করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে এই শিকারী পাখিরা আমাদের ক্ষতি যতটা করে উপকার করে তার চেয়েও ঢের বেশি এবং সেইজন্যই এদের রক্ষার জন্যও উপযুক্ত আইনসম্মত ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

পারিয়া এবং ব্রাহ্মণী চিল (Kite) চিত্র নং 19, 20—এই দুটি পাখিকে লোকালয়ের আশেপাশে হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়,

লোকালয়ের মধ্যে থেকেই এরা আহার সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে। এদের মধ্যে প্রথমটি বিরাটাকৃতি পিঙ্গল বর্ণের বাজ-জাতীয় পাখি, এই জাতীয় অন্য সব পাখিদের থেকে একে আলাদা করে চিনবার চিহ্ন হল এর দ্বিধাবিভক্ত পুচ্ছ। লেজের এই বিশেষত্বটি আরো বেশি করে চোখে পড়ে যখন ওরা আকাশে ওড়ে। কসাইখানা, মাছ-মাংসের বাজার, ম্যুনিসিপ্যালিটির আবর্জনা ফেলার জায়গায় বা জাহাজঘাটায় এই চিলরা সর্বদাই হাজির থাকে খাবারের টুকরো-টাকরা সংগ্রহের আশায়। শহরের সংকীর্ণ জনবহুল বাজারের মধ্যে থেকে একটা মরা ইঁদুর বা ঐ জাতীয় কিছু, চিলেরা কী বিদ্যুৎগতিতে ছোঁ মেরে উঠিয়ে নিয়ে যায় দেখলে অবাক হতে হয়। আকাশ থেকে তীরের মতো বেগে নেমে আসে অথচ অদ্ভুত সাবলীল ক্ষিপ্রতায় এঁকে বেঁকে পথচারী আর গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় বাঁচিয়ে টেলিফোন আর বিজলির তার এড়িয়ে ঠিক নিজের লক্ষ্যবস্তুটি তুলে নিয়ে আবার আকাশে উঠে যায়। উড্ডয়ন-বিদ্যার এক অন্যতম প্রকর্ষ, সন্দেহ নেই। মুরগী পালকরা এই চিলেদের দৌরাত্ম্যে সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকে। কারণ নিজের বাচ্চাদের খাওয়াবার জন্য চিল প্রায়ই মুরগীর ছানা ছোঁ মেরে [illegible]য়ে যায়। এই চিলেদের তীক্ষ্ণ উঁচু সুরের ডাক শহরের অধিবাসীদের সবাই-কারই বিশেষ পরিচিত।

ব্রাহ্মণী চিলকে (Haliastur indus) হিন্দীতে খোবীয়া চিল বা খেমকর্ণীও বলে। বাংলা নাম শঙ্খচিল। এগুলি আকারে পারিয়া চিলদের মতো হলেও দেখতে অনেক ভালো। এদের শরীরের উপরিভাগের রঙ মরচে পড়া লোহার মতো লাল, মাথা, বুক আর

পেট সাদা রঙের। ব্রাহ্মণী চিলের বাচ্চাদের রঙ খয়েরী, দেখতে এরা অনেকটা পারিয়া চিল বা শকুনের বাচ্চাদের মতোই, কিন্তু লেজটির দিকে নজর দিলেই প্রভেদটা স্পষ্ট চোখে পড়ে। কারণ এদের লেজের গড়ন গোল ধরনের, দ্বিধাবিভক্তও নয়, গোঁজাকৃতিও নয়। নদী আর পুকুরের ধারে ব্রাহ্মণী চিলদের দেখা যায় তবে সমুদ্রোপকূলবর্তী গ্রামে, বন্দরে, মাছ ধরার আড্ডার আশেপাশেই এদের ভিড় বেশি। বর্ষাকালে যখন মাঠ ঘাট জলে ডুবে যায় তখন জলে ডোবা ধানক্ষেতেও এদের দেখা পাওয়া যায়। আবর্জনা আর এঁটো-কাঁটাই এদের প্রধান খাদ্য, কাক আর পারিয়া চিলদের সঙ্গে এরাও প্রায়ই লোকালয়ের মধ্যে ঢুকে ময়লার গাদায় খাবার খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু এরা জলের ওপর থেকে ছোঁ মেরে খাবার খেতেই ভালোবাসে তাই জাহাজঘাটা আর মাছ ধরার জায়গাতেই এদের দেখা যায় বেশি। ডাঙায় থাকলে এরা গিরগিটি, মাছ, ব্যাঙ কাঁকড়া, ছোটো সাপ, পোকামাকড় এই-সবই খায়। বৃষ্টির পব ভিজে মাটির তলার বাসা থেকে যখন ডানা-গজানো উইপোকারা ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে এসে আকাশে উড়তে থাকে তখন পারিয়া চিল এবং ব্রাহ্মণী চিলরা পরমানন্দে তাদের ধরে ধরে খায়। ব্রাহ্মণী চিলের ডাক বড়ো কর্কশ, মনে হয় যেন ওদের গলা ভেঙে গেছে। এই দুরকম চিলই বৃক্ষশাখায় কাঠিকুটি দিয়ে বেশ বড়োসড়ো বাসা বানায়, তবে ব্রাহ্মণী চিলরা জলের কাছে থাকতেই ভালোবাসে। এদের ডিমের রঙ ধূসর বা গোলাপি, তাতে সাদা সাদা দাগ এবং লালচে বাদামী ছিটও থাকে।

শিকরা (**Accipiter badius**) চিত্র নং 21, হিন্দী নাম—শিকরা, বাংলায়ও বলে শিকরা বা শিকরে বাজ। এগুলি ছোটো মাপের বাজ পাখি, আকারে প্রায় একটি পায়রার মতো, শরীরের উপরিভাগ ছাই রঙা নীলচে ধূসর, নীচের দিকটায় সাদার ওপর লালচে বাদামী ডোরার মতো দাগ আছে, আর লেজের ওপর আছে চওড়া কালো কালো দাগ। এদের স্ত্রী পাখির পিঠের অংশও বাদামী ধরনের এবং আকারেও তারা পুরুষ পাখির চেয়ে বড়ো। এই পাখির বাচ্চাদের পিঠের দিকের রঙ লালচে বাদামী আর পেটের দিকে থাকে বাদামী রঙের লম্বা লম্বা ডোরা (আড়াআড়ি ডোরা নয়)। গ্রাম এবং চাষের জমির কাছাকাছি জঙ্গলে গাছপালার মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় এই পাখিদের দেখা পাওয়া যায়। পঙ্গপাল, গিরগিটি, ব্যাঙ ইঁদুর প্রভৃতি এদের খাদ্য। শিকারকে অতর্কিতে আক্রমণ করাই এদের রীতি। ঝাঁকড়া পাতাওয়ালা গাছের ডালে ওরা সতর্ক সন্ধানী দৃষ্টি মেলে বসে থাকে স্থির হয়ে, তারপর শিকারের দেখা পেলে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে তীক্ষ্ণ বাঁকানো নখে শিকারকে গেঁথে তুলে নিয়ে আসে। খাবার আগে ধারালো চঞ্চুর সাহায্যে শিকারকে ওরা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে ছাতারে, বটের, ঘুঘু প্রভৃতি ছোটো ছোটো পাখিদেরও অনেক সময় এই শিকরা পাখিরা ঐভাবে অতর্কিতে আক্রমণ করে বা বিদ্যুৎবেগে তাড়া ক'রে শিকার করে। হতভাগ্য শিকার এত হঠাৎ আক্রান্ত হয় যে সাবধান হবার বা আত্মরক্ষার বিন্দুমাত্র সময় পায় না। শিকরা পাখিরা নিজেদের বাচ্চাদের খাওয়াবার জন্য বেপরোয়া ভাবে একেবারে ডাকাতের মতো মুরগীর ছানা চুরি করে। মুরগী-পালকরা সর্বদাই এই পাখিদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। এদের

কর্কশ ডাক ঠিক কালো ফিঙে পাখিদের মতোই, তবে তার চেয়ে আওয়াজটা আর-একটু জোরদার। প্রজনন ঋতুতে এরা খুব ডাকাডাকি করে, স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় পাখিই সমস্তক্ষণ একটা স্থির-বিশিষ্ট ডাক ডাকে, সেটা শুনতে লাগে অনেকটা টি-টুই, টি-টুই, আর সেইসঙ্গেই নানারকম কসরৎ করতে করতে সমস্তক্ষণ একজন আর একজনকে তাড়া করে বেড়ায়। এই শিকরা পাখিরা ঝাঁকড়া গাছের মাথায় কাকেদের মতোই কাঠি দিয়ে বাসা বানায়। গ্রাম বা লোকালয়ের কাছাকাছি থাকতেই ভালোবাসে এরা। এদের ডিমের সংখ্যা 3/4টি, ডিমের রঙ নীলচে সাদা, কখনো কখনো তাতে ধূসর রঙের ছিটেও থাকে।

শকুনদের যে প্রজাতিটি দেশের সর্বত্র দেখা যায় সেটির নাম সাদা পিঠওয়ালা শকুন। বেজল ভালচার বলা হয় একেই (Gyps bengalensis) চিত্র নং 22 :

হিন্দী নাম— গিধ্ (সংস্কৃতে গৃধ্র)

এগুলি বেশ ভারী গড়নের ময়লা কালচে বাদামী রঙের পাখি, মাথা আর গলায় রোঁয়া বা পালক নেই, সব মিলিয়ে এদের চেহারা বেশ ঘৃণা-উদ্রেক-কারী। যখন এরা বিশ্রাম করে বা হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় তখন ওদের পিঠের সাদা ছোপ স্পষ্ট চোখে পড়ে। মাথার ওপর দিয়ে যখন উড়ে যায় তখন বেশ দেখা যায় ডানার তলা দিয়ে একটা চওড়া সাদা দাগ এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত চলে গেছে, শুধু মাঝখানে সাদা দাগটা একবার ভেঙে গেছে, সেখানে রয়েছে ওদের কালো শরীরের অংশ। এই শকুনের বাচ্চাদের গায়ের রঙ বাদামী, আর তাদের

গায়ে সাদা দাগও থাকে না, তাই এদের বাচ্চাদের, দীর্ঘ চঞ্চু (Long billed) শকুনদের (G. Indicus) সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা আছে। আশ্চর্যের বিষয় লঙ্কাদ্বীপে কিন্তু এই-সব প্রজাতির শকুনদের দেখা যায় না। দক্ষিণ ভারতের সর্বত্রই এরা আছে কিন্তু আর্দ্র।চিরহরিৎ অরণ্য এরা পরিহার করে চলে। আকাশের অনেক উঁচুতে দুপাশে নিশ্চলভাবে ডানা মেলে ওরা ভেসে বেড়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ঐ ভাবে ওরা মাঠে প্রান্তরে কোথায় কী আহার্য পড়ে আছে তারও অনুসন্ধান চালায়। আবর্জনা সাফ করার ব্যাপারে শকুন মানুষের পরম বন্ধু। দৃষ্টি-শক্তি ওদের অসাধারণ রকম তীক্ষ্ণ কিন্তু ঘ্রাণশক্তি নেই বললেই চলে। আকাশে হয়তো কোথাও কোনো শকুনের চিহ্নমাত্র নেই কিন্তু ভাগাড়ে একটা কোনো জীবজন্তুর মৃতদেহ পড়লেই দেখতে দেখতে কোথা থেকে শকুনের পাল এসে হাজির হয় এবং কী অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের মধ্যে একটা বিরাট গোরু বা মহিষের মৃতদেহ খেয়ে শেষ করে ফেলে তা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। শকুনরা যখন মৃতদেহের ঐ বীভৎস অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় মেতে ওঠে তখন ওদের চেঁচামেচিতে মুখরিত হয়ে ওঠে জায়গাটি, সবাই মিলে টানাটানি করে মাংস ছিঁড়তে থাকে, তারই মধ্যে একজন আর-একজনকে ঝাপটা মেরে সরিয়ে মৃতদেহের ভালো জায়গা দখল করবার চেষ্টাও চলে, কখনো দেখা যায় একটুকরো মাংসকে দুদিক থেকে দুটি পাখি প্রাণপণে টেনে ছিঁড়ছে। পথের পাশে বা গ্রামের কাছে বড়ো গাছে ডালপালা ও কাঠি দিয়ে শকুনরা বিরাটাকৃতি মাচার মতো বাসা বাঁধে। এরা একটিমাত্র ডিম পাড়ে, ডিমের রঙ সাদা, কখনো কখনো তাতে লালচে বাদামী ছিটও থাকে।

দাক্ষিণাত্যের শুষ্ক অঞ্চলগুলিতে আর-একরকম ছোটো আকারের শকুন দেখা যায় এগুলিকে বলা হয় **সাদা বা গিন্নী শকুন** বা **মুদ্দোফরাস শকুন** (Scavenger Vulture)। **'ফ্যারাওজ চিকেন'** (Neophron percnopteurus) এই পাখিদেরই আর-একটি নাম। হিন্দী নাম— সফেদ গিধ বা গোবর গিধ। চিত্র নং—23, বাংলা না:— শ্বেত বা গিন্নী শকুন। এগুলি ময়লা সাদা রঙের চিলের মতো পাখি, এদের ডানায় কিছু কালো রঙের পালকও আছে, মাথায় রোঁয়া নেই, মাথা আর ঠোঁটের রঙ হলদে। এই প্রজাতির বাচা পাখিদের গায়ের রঙ বাদামী। তবে চিলেদের থেকে এদের আলাদা করে চিনতে হলে নজর দিতে হবে লেজের দিকে। চিলেদের লেজের প্রান্তভাগ দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে, এদের লেজ কিন্তু গোঁজাকৃতি, উড়বার সময় এই পার্থক্য বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। নগর, গ্রাম বা যাযাবর বেদেদের আস্তানার আশেপাশে, অর্থাৎ যে কোনো লোকবসতির কাছাকাছি খোলা মাঠে-প্রান্তরে একসঙ্গে 2/3টি করে এই পাখি দেখা যায়, আকাশের বহু ঊর্ধ্বে উঠে ওরা অনুসন্ধান করে মাটিতে কোথায় কী খাদ্যবস্তু পড়ে আছে। জমির ওপরের খাবাবের খোজে এদের লম্বা লম্বা পা ফেলে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতেও দেখা যায়। এই সাদা শকুনরা মুদ্দোফরাসের কাজটি খুব ভালোভাবেই করে। গ্রামাঞ্চলে যেখানে স্বাস্থ্যবিধি-সম্মত কোনো ব্যবস্থাই নেই এবং দরিদ্র জনসাধারণ যেখানে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাড়ির আশেপাশের মাঠ-ময়দান ও ঝোপঝাড়ই ব্যবহার করে থাকে সেখানে লোকালয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে প্রধান সহায়ক হচ্ছে এই শকুনরা, কারণ সবরকমের আবর্জনার সঙ্গে মানুষের বিষ্ঠাও এদের অন্যতম আহার্য বস্তু।

মাদ্রাজের কাছে থিরুকালিকুন্দ্রমে সুবিখ্যাত পক্ষীতীর্থে রোজ যে-ছুটি পাখি নির্দিষ্ট সময়ে এসে ভোগ খেয়ে যায় তারা এই প্রজাতিরই পাখি। ওখানকার পুরোহিতদের মতে ওরা নাকি রোজ বারাণসী থেকে আসে। কাঠকুটো দিয়ে যেমন-তেমন করে একটা বাসা বানায় এরা, তার মধ্যে থাকে না এমন জিনিস নেই, জন্তু জানোয়ারের চামড়ার টুকরো, চুল, আরো হাজার রকম জঞ্জাল এনে জড়ো করে ওরা বাসার মধ্যে। পুরোনো ভাঙা বাড়ির আলসের ফোকরে বা পাথরের খাঁজের মধ্যে সাধারণত এরা বাসা বানায়, গাছের গুঁড়ির খাঁজেও কখনো কখনো এই শকুনের বাসা দেখা যায়। সাধারণত ছুটি করে ডিম পাড়ে এরা। ডিমগুলো দেখতে ভারি সুন্দর, সাদা আর হালকা লালে মেশানো তাতে কালচে বাদামী অথবা কালোর ছোপ থাকে।

ছুঁচলো ডানাওয়ালা বাজপাখির ভালো নমুনা হচ্ছে **শাহী ফ্যালকন** (Falco peregrinator) চিত্র নং— 24 :

হিন্দী নাম— শাহীঁ, বাংলায় কেউ কেউ শাবাজ বলেন।

এগুলি আকারে প্রায় একটি দাঁড়কাকের সমান এদের কাঁধ বেশ চওড়া, দৃঢ়বদ্ধ শরীর এবং বেশ শক্তিশালী পাখি. পূর্ণবয়স্ক পাখিদের পিঠের দিকটা শ্লেট রঙের, মাথা কালো, মুখেব পাশেও কালো ছোপ আছে, বুক এবং শরীরের নিচের অংশ গোলাপি, সাদা ও লাল মেশানো। কোনো কোনো পাখির পেটের তলা কালো রঙেরও হয়। এদের স্ত্রী পাখিগুলিরও চেহারা এইরকমই, শুধু আকারে একটু বড়ো। পাহাড়ী জায়গায় পাথরের খাঁজে বা পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসা চওড়া প্রস্তরখণ্ডের উপর এই

পাখিরা একলা বা জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়ায় এবং ঐ-সব উঁচু জায়গা থেকে চারপাশে দৃষ্টি রেখে শিকার খোঁজে। শীতকালে উত্তরাঞ্চল থেকে আমাদের দেশে যে পেরিগ্রীন ফ্যালকন বা ভিরিরা (Bhyri) বেড়াতে আসে শাহী ফ্যালকনরা তাদেরই স্থানীয় প্রতিনিধি বলা চলে। পায়রা, টিয়া প্রভৃতি ছোটো ছোটো পাখিই এদের প্রধান শিকার। এরা খুব দ্রুতগতিতে উড়তে পারে, তীক্ষ্ণাগ্র ডানা কয়েকবার খুব তাড়াতাড়ি সঞ্চালন করে তারপরই তীব্র বেগে কিছুদূর ভেসে যায়। এরা শূন্য থেকেই শিকারকে নখে গেঁথে ফেলে তারপর মনের মতো একটি পর্বতচূড়ায় বসে পালক ইত্যাদি ছাড়িয়ে শিকারকে গিলে ফেলে। প্রজনন ঋতুতে এরা নিজেদের বাসাটির আশেপাশে শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে কতরকম কসরৎ যে দেখায় তার ইয়ত্তা নেই। স্ত্রী ও পুরুষ দুটি পাখিই বিদ্যুৎগতিতে পরস্পরকে তাড়া করে ও একজন অন্যজনের ঘাড়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উড়ে বেড়ায়। অতি দুর্গম পাহাড়ের গায়ে এরা বাসা বাঁধে। ডিমের সংখ্যা এদের 3 থেকে 4টি, ডিমের রঙ ফিকে ইঁটের মতো লাল তাতে লালচে বাদামীর ছোপ আছে। বছরের পর বছর ধরে ওরা একই জায়গায় বাসা বাঁধতে ভালোবাসে।

লালমাথাওয়ালা মার্লিন (Falco chicquera) চিত্র নং— 25 :

বাংলা ও হিন্দী নাম— তুরুমতি।

এগুলিও ছুঁচলো ডানাবিশিষ্ট ছোটোখাটো সুদর্শন ফ্যালকন, এদের পিঠের রঙ লালচে ধূসর, নিচের দিকটা সাদা, বুক আর পেটে আড়াআড়ি ভাবে কালো রঙের খুব ঘনসন্নিবিষ্ট ডোরা ডোরা দাগ আছে। মাথা আর ঘাড়ের রঙ বাদামী, তা ছাড়া দুই চোখের

চিত্র 17
মরাল
(লেসার হুইসলিং টিল)
(*Dendrocygna javanica*)
দ্রষ্টব্য পৃঃ 68

চিত্র 19
চিল
(পারিয়া কাইট)
(Milvus migrans)
দ্রষ্টব্য পৃঃ 72
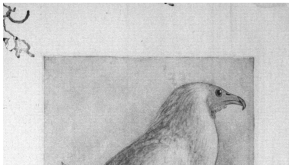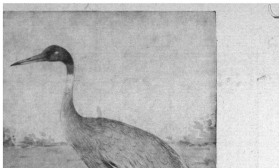
পাশ থেকে নিচের দিকে গোঁফের মতো দুটি বাদামী রঙের দাগও আছে, এই-সব চিহ্ন দেখে এই পাখিদের চেনা বিশেষ শক্ত নয়। উড়বার সময় এদের লেজের সাদা আর কালো পাড়ের মতো দাগও বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ে। সাধারণত এই পাখিরা জোড়ায় জোড়ায় খোলা মাঠে, চাষের জমির আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, উঁচু ঢিপিমতন জায়গায় বসে শিকারের সন্ধান করে এবং খুব নিচু দিয়ে তীব্রগতিতে উড়ে গিয়ে ছোটো পাখি, ইঁদুর, গিরগিটি, বড়ো বড়ো পতঙ্গ ইত্যাদি শিকার ধরে। সন্ধ্যাবেলা বাদুড়রা যখন বাসা ছেড়ে বেরিয়ে আসে তখন এই পাখিরা অনেকসময় অবিশ্বাস্য রকম দ্রুতগতিতে উড়ে গিয়ে বাদুড় শিকার করে। পুরুষ আর স্ত্রী পাখি দুজনে মিলেই শিকার করে, একজন শিকারকে তাড়িয়ে আনে আর-একজন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারকে হত্যা করে, তারপর দুজনে মিলে ভাগ করে খায়। এই জাতের বড়ো আকারের স্ত্রীপাখিকে অনেক সময় ময়না টিয়া প্রভৃতি পাখি শিকার করবার জন্য বিশেষভাবে তালিম দেওয়া হয়। চড়াই বাজদের মতো এরাও তীরের মতো সোজা তীব্রগতিতে উড়ে গিয়ে শিকারকে আক্রমণ করে। বেশ উচ্চৈঃস্বরে ডাকে এরা। প্রজনন ঋতুতে এরা বেপরোয়া রকম সাহসী হয়ে ওঠে এবং নিজে 'র বাসার ধারে কাছে কাক বা চিলদের মতো বড়ো বড়ো পাখিদের দেখলেও তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করে। খোলা মাঠের মাঝখানে ঝাঁকড়া পাতাওয়ালা বড়ো গাছের মাথায় এরা বাসা বাঁধে। কাঠকুটি দিয়ে মাচার মতো বাসা বানিয়ে তার মধ্যে 3 থেকে 4টি ডিম পাড়ে, ডিমের রঙ ফ্যাকাশে লালচে সাদা, তাতে লালচে বাদামী ছিট থাকে প্রচুর পরিমাণে।

আমাদের দেশে গ্যালিফর্মিস (Galliformes) বর্গের প্রতিনিধিত্ব করে ফ্যাসিয়ানিডি (Phasianidae) গোষ্ঠীর পাখিরা। বটের, তিতির, বনমুরগী প্রভৃতি যে-সব পাখিকে বলা হয় 'গেম বার্ড', অর্থাৎ মানুষ যাদের শিকার করতে ভালোবাসে তারাই পড়ে এই গোষ্ঠীতে। এই-সব পাখিরা প্রধানত শস্যভুক, এদের ঠোঁট মাঝারি আকারের এবং বেশ শক্ত, ডানার গড়ন গোল ধরনের, পা বেশ মজবুত, এবং ছোটো অথবা মাঝারি লম্বা (অনেক প্রজাতির পুরুষ পাখিদের পায়ে কাঁটার মতো থাকে)। তা ছাড়া মাটি খুঁড়ে খাবার খোঁজার জন্য এদের পায়ে ভোঁতা অথচ শক্ত নখও থাকে।

ব্ল্যাক পারট্রিজ (Francolinus francolinus) চিত্র নং—26 :
হিন্দীতে বলে কালা তিতর,
বাংলায় কালো তিতির।

সাধারণত ধূসর তিতিরই বেশি দেখা যায়, এই কালো তিতিররা আকারে ধূসর তিতিরদেরই মতো বড়ো, বেশ গোলগাল চেহারা, নাতিদীর্ঘ লেজ, কুচকুচে কালো রঙের ওপর প্রচুর সাদা ছিট এবং হলদে ও সাদা দাগ আছে। পুরুষ পাখিদের মুখের দুপাশে দুটি ঝকঝকে সাদা দাগ এবং গলাটি বেষ্টন ক'রে বাদামীরঙের পাড়ের মতো দাগ দেখলেই চেনা যায়। স্ত্রীপাখিদের রঙটা একটু ফ্যাকাশে, তার ওপর সাদা কালচে ছিট আছে আর ঘাড়ের কাছে আছে বাদামীরঙের ছোপ। উত্তর ভারত ও আসামের নদীগুলির ধারে ধারে ঝোপেঝাড়ে এবং ঘাসবনের মধ্যে এই সুদর্শন তিতির পাখিরা জোড়ায় জোড়ায় বা একা একাও ঘুরে বেড়ায়। আখ

বা জনারের ক্ষেতে এবং চা বাগানেও এদের দেখা পাওয়া যায়। ভোরবেলা আর সন্ধ্যার সময় এই পাখিরা আহারের চেষ্টায় ফসলের ক্ষেতে ঢুকে পড়ে, সেই সময় ক্ষেতের আলের ধারে ধারে ঠুকরে বেড়াতেও দেখা যায় ওদের। চরে বেড়াবার সময় ওরা প্রায়ই পুচ্ছটি খানিকটা উঁচু করে তুলে রাখে অনেকটা 'মুরহেন'দের মতো। ধূসর তিতিরদের কিন্তু এরকম লেজ তুলে ঘুরতে দেখা যায় না। এরা ভীষণ জোরে দৌড়তে পারে এবং পালাতে হলে সাধারণত পায়ের ওপরই নির্ভর করে বেশি, নেহাত আচমকা শিকারীর তাড়া খেলে তখনই শুধু উড়ে পালায়। এরা একটানা বেশিদূর উড়তে পারে না এবং মাটিব 3 থেকে 5 মিটার ওপর দিয়েই সাধারণত ওড়ে। শস্যের দানা, নানারকম ঘাসের বীজ, চারা-গাছেব ডাঁটা এই-সবই এদের প্রধান খাদ্য, তবে উইপোকা এবং অন্যান্য পোকামাকড়েও বিশেষ অরুচি নেই। পুরুষপাখিরা বেশ উঁচু গলায় উৎফুল্ল স্বরে ডাক দেয়, আওয়াজটা শুনতে লাগে, চিক ···চিক-চিক—কেরাকেক্— এই ধবনেব বেশ একটা কর্কশ অথচ সুরেলা বিচিত্র ডাক। কেউ বলে, ঐ ডাকে ওরা নাকি বলছে, "সুভান্ তেরী কুদরৎ" আবাব কেউ-বা শোনে ওরা ডাকছে 'লসন্ (রসুন)-পিয়াজ-আদ্রক'। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ...নিজেদের খুশিমতো ওদের ঐ বিচিত্র ডাকেব বিভিন্ন অর্থ বাব করেছে। সাধারণত ঝোপঝাড় বা বড়ো ঘাসের ঝোপের গোড়ার কাছে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে ঘাস বিছিয়ে এরা বাসা বানায়। কালো তিতিরদের ডিম হয় 6—8টি, রঙ ফিকে সবুজ মেশানো বাদামী বা গাঢ় খয়েরি বাদামী।

গ্রে পারট্রিজ (**Francolinus pondicerianus**) চিত্র নং-27 :

হিন্দী নাম— তিতর বা সফেদ তিতর।

বাংলায় বলে ধূসর বা খয়েরি তিতির।

এই পাখিগুলিও আকারে মুরগীর চেয়ে একটু ছোটো, কালো তিতিরের মতোই গোলগাল এবং পুচ্ছটিও ছোটো। এই পাখিদের গায়ের রঙ ধূসর খয়েরি, তার ওপর কালো আর হলুদ রঙের ঢেউ-খেলানো ডোরা আছে, লেজের রঙ বাদামী, গলাটি লালচে এবং গলা বেষ্টন করে একটি ভাঙা ভাঙা কালো দাগও আছে। পুরুষ পাখিরা স্ত্রী-পাখিদের চেয়ে অধিকতর বলশালী হয় এবং দুই পায়েই একটা করে তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো থাকে। খয়েরি তিতিররা ঘাস আর কাঁটা ঝোপে ভরা খোলা মাঠে থাকতেই ভালোবাসে, তবে কাছাকাছি গ্রাম এবং খেত-খামার থাকা চাই। গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন পাখির ডাকের মধ্যে এই তিতিরদের উঁচু গলার সুরেলা ডাকই সবচেয়ে বেশি শোনা যায়। প্রজনন ঋতুতেই কেবল এদের জোড়ায় জোড়ায় ঘুরতে দেখা যায়, অন্য সময় প্রায়ই 4 বা 6টি পাখি একসঙ্গে উড়ে বেড়ায় এবং মাটিতে ও গোবরের মধ্যে খাবার খোঁজে। নানারকম বীজ, ছোটো ছোটো কুল জাতীয় ফল, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি ওদের আহার্য, তা ছাড়া উইপোকা এবং মানুষ ও গোরুর বিষ্ঠার মধ্যে যে পোকা জন্মায় সেগুলিও ওরা বিশেষ তৃপ্তি করে খায়। হঠাৎ ভয় পেলে পুরো দলটি একসঙ্গে ছুটে গিয়ে এক ঝোপ থেকে অন্য ঝোপে বসে এবং প্রত্যেকটি পাখিই আত্মগোপন করে ঘন পাতার আড়ালে। এরা উড়তে মোটেই ভালোবাসে না। নেহাত বিপদগ্রস্ত হলে ডানায় একটা জোর ঝাপটা দিয়ে আকাশে ওঠে এবং দিশাহারা ভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে

এদিকে-ওদিক উড়ে যায়, কিন্তু শ'খানেক মিটার উড়েই আবার মাটিতে নেমে পড়ে। রাত্রে ওরা আশ্রয় নেয় ছোটো ছোটো কাঁটাওয়ালা ঝোপ-ঝাড়ের ডালে। পুরুষ তিতিরের ডাক বেশ জোরদার, কাতি-তার, কাত্তি-তার অথবা. পাত্তি-লা পাত্তি-লা এই ধরনের আওয়াজ এরা খুব দ্রুত পুনরাবৃত্তি করে এবং ধাপে ধাপে স্বর চড়াতে থাকে। বাচ্চা তিতিরকে পোষমানানো যায় খুব সহজেই আর এরা প্রভুকে ঠিক পোষা কুকুরের মতো অনুসরণ করে। প্রভু ডাকলেই ঠিক সাড়া দেয় আর যেখানেই থাক্ ঠিক প্রভুর কাছে এসে হাজির হয়। গ্রামাঞ্চলে বিশেষ বিশেষ পর্ব বা উৎসব উপলক্ষে বিপুল উৎসাহে তিতিরের লড়াই অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষ পাখিদের লড়ানো হয় এবং এই উপলক্ষে বেশ মোটারকম বাজি ধরার প্রচলন আছে। যে তিতির লড়াইয়ে জেতে তার দাম ওঠে অনেক দূর। অনাবাদী ঘাস-জমিতে কাঁটা ঝোপের তলায় মাটিতেই এরা বাসা বানায়। বাসার মধ্যে থাকে ঘাসের আস্তরণ। ধূসর বা খয়েরি তিতিরদের ডিমের সংখ্যা 4 থেকে 8টি, খয়েরি আভাযুক্ত ঘি রঙের ডিমগুলির গায়ে কোনোরকম দাগ থাকে না।

কৃষ্ণবক্ষ কোয়েল (Blackbreasted or Rain Quail) বা **রেন কোয়েল** (Coturnix coromandelica) চিত্র নং—28 :

হিন্দী নাম— চঁনক বা চিনা বটের।

বাংলায় এদের বলে বটের।

এই পাখিগুলি আকারে খয়েরি তিতিরদের প্রায় অর্ধেক এবং দেখতে অনেকটা ওদেরই মতো। এদেরও পালক বাদামী খয়েরি

তাতে পিঠের দিকে ছোটো বড়ো নানারকমের হালকা কালো রঙের ছোপ আছে। পুরুষ বটেরের বুক থেকে পেটের মাঝামাঝি পর্যন্ত কালো। কিন্তু স্ত্রী পাখিদের বুকেও কালো রঙ নেই, গলাতেও নেই সাদা-কালো দাগ।

অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার **ধূসর** বা **গ্রে কোয়েল** (C. coturnix) সব যা দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি শীতকালে প্রচুর সংখ্যায় উত্তর ভারত থেকে আসে। এই প্রজাতির পুরুষ পাখিদের গলায় থাকে একটি কালো দাগ, কিন্তু বুকে বা পেটে এদের কালোর ছোপ নেই। এদের স্ত্রী পাখিগুলির চেহারা অনেকটা কৃষ্ণবক্ষ বটেরদের মতোই তবে তাদের চেয়ে আকারে কিছুটা বড়ো। হাতের ওপর রেখে পরীক্ষা করবার সুযোগ পেলে কৃষ্ণবক্ষ বটেরদের থেকে এদের প্রভেদটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, ডানার প্রান্তের বড়ো পালকগুলির ধার দিয়ে হলদেটে বাদামী রঙের ডোরা দাগ এদের নিজস্ব বিশেষত্ব। এই দুটি প্রজাতিরই আচার-ব্যবহার একই রকম। এরা প্রধানত মাটির ওপরই ঘাসের মধ্যে বা কচি ফসলের ক্ষেতে ঘোরাঘুরি করে। দৌড়তে পারে এরা খুব জোরে, নেহাত বিপদে না পড়লে আকাশে ওঠে না। হঠাৎ তাড়া খেলে ওরা ডানায় একটা মৃদু শব্দ তুলে আকাশে উঠে পড়ে, সেইসঙ্গে শোনা যায় ওদের মৃদু শিস দেওয়ার মতো আওয়াজ, অল্প উঁচু দিয়ে মাত্র শ'খানেক মিটার উড়েই আবার ওরা নেমে পড়ে ঘাস বা ফসল ক্ষেতের মধ্যে। ওড়ার গতি ওদের বেশ দ্রুত এবং সোজা ওড়ার সময় ঘন ঘন পক্ষসঞ্চালনও করে। শস্যের দানা এবং সবরকম ঘাসের বীজই এদের প্রধান খাদ্য, তবে উইপোকা এবং অন্য নরম গোছের পোকা পেলে তাও ওরা খুশি হয়েই

খায়। 'রেন্ কোয়েল' বা কৃষ্ণবক্ষ বটেরদের ডাক বেশ সুরেলা, অনেকটা দুবার শিস দেওয়ার মতো। প্রজনন ঋতুতে বিশেষ করে ভোরবেলা আর সন্ধ্যার দিকে এই দ্বিস্বরবিশিষ্ট ডাক কেবলই শুনতে পাওয়া যায়, এটা শুনতে লাগে অনেকটা হু-ইচ্ হু-ইচ্। মেঘলা দিনে সারাদিন ধরে, এমন-কি রাত্রেও শোনা যায় ওদের ডাক। ধূসর বটেরদের ডাক কিন্তু এদের থেকে একেবারে আলাদা। ধূসর বটেররা একটা জোর শিস দেওয়া শব্দের পরই খুব দ্রুত দুবার স্বল্পস্থায়ী শিসের মতো আওয়াজ করে। এই দুই প্রজাতির পাখিই ঘাসবনে অথবা ফসলক্ষেতের মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘাসে ছাওয়া বাসা বানায়। ডিমের সংখ্যা সাধারণত 6 থেকে 9টি, ডিমের রঙ ফিকে হলুদ, তাতে একটু-আধটু বাদামীর ছোপ থাকে। দুই প্রজাতিরই ডিমের চেহারা একই রকম শুধু আকারে সামান্য প্রভেদ আছে।

চুনো বটের বা জাঙ্গল বুশ কোয়েল (Perdicula asiatica) চিত্র নং—29 :

হিন্দী নাম— লৌয়া।

বাংলায় বটের বলা হয়।

এরাও আকারে প্রকারে অন্য বটেরদের মতোই। এই জাতের পুরুষ পাখিদের শরীরের ওপর দিকটা হলদে আভাযুক্ত বাদামী, তার ওপর কালো ও হলদে দাগ আছে এবং পেটের দিকের রঙ সাদা, তাতে আছে কালো কালো ডোরা দাগ। স্ত্রী পাখিদের শরীরের নিচের অংশ গোলাপি ও লালে মেশানো। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় পাখিরই মাথা থেকে গলার দু পাশ পর্যন্ত দুটি

সুস্পষ্ট হলুদ বাদামী রেখার মতো লম্বা দাগ আছে। তা ছাড়া গলাতেও আছে গাঢ় বাদামী রঙের ছোপ। ঠিক এই ধরনেরই আর-একটি প্রজাতির নাম রক বুশ কোয়েল (P. argoondah), 'জাঙ্গল বুশ কোয়েল' বা বুনো বটেরদের কাছাকাছিই এদের দেখা যায়। এই জাতের পুরুষ পাখিদের গলার ছোপটি বাদামী নয়, ফ্যাকাশে লাল, আর স্ত্রী পাখিদের গলায় কোনোরকম ছোপই নেই। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের যে-সব অরণ্যে বছরে একবার করে গাছের পাতা ঝরে যায় সেই-সব উন্মুক্ত বনাঞ্চলে এবং শুকনো ঘাসের জঙ্গলে বুনো বটেরদের দেখতে পাওয়া যায়। এদের এক-একটি দলে 5 থেকে 20টি পর্যন্ত পাখি থাকে। রাত্রে এরা ঝোপঝাড়ের নিচে বা ঘাসবনের আড়ালে আশ্রয় নেয়, দিনের বেলাও কোনো কারণে ভয় পেলে ঐ-সব জায়গাতেই গা ঢাকা দিয়ে বসে থাকে দল বেঁধে, তবে প্রত্যেকটি পাখিরই মুখ থাকে বাইরের দিকে। হঠাৎ তাড়া খেলে ওরা ডানায় বেশ জোর আওয়াজ তুলে হুড়মুড় করে আকাশে উঠে পড়ে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক-ওদিক উড়ে যায়, কিন্তু অল্পদূর উড়েই আবার নেমে পড়ে ঘাসবনের মধ্যে, তারপর খুব নরম সুরে শিস দেওয়ার মতো হুই-হুই শব্দে ডাকাডাকি ক'রে পরস্পরের সাড়া নিতে নিতে আবার দলের সবকটি পাখি একত্রিত হয়। প্রতিদিন ভোরে এবং সন্ধ্যায় এরা নিয়মিত ভাবে একই পথ দিয়ে লাইন বেঁধে একই জলাশয়ে জলপান করতে যায়। শস্যের দানা, ঘাস ও ঘাসের বীজ, নরম ডাঁটা ইত্যাদি এদের প্রধান খাদ্য, অবশ্য উইপোকা এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গও ওরা খেয়ে থাকে। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ পাখিরা হয়ে ওঠে বেজায় কলহপ্রিয়, প্রায়ই দেখা যায় কর্কশস্বরে ডাকা-

ডাকি করে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে ওরা লড়াই বাধাবার চেষ্টা করছে। ঝোপঝাড়ের নিচে বা বড়ো বড়ো ঘাসে ভরা ঢিপির নিচের দিকে গর্তের মধ্যে ঘাস বিছিয়ে বাসা বানায় এরা। এদের ডিমের সংখ্যা ৪—৪টি, ডিমের রঙ হলদে আভাযুক্ত সাদা এবং গায়ে কোনোরকম ছিট নেই, রেন কোয়েলদের থেকে এদের ডিম একেবারে আলাদা।

গ্রে জাঙ্গল ফাউল (Gallus sonneratii) চিত্র নং ৩০ :

হিন্দী নাম— জংলি মুরগী।

বাংলায় এদেরই বলে বন মুরগী।

এই বন মোরগ বা বন মুরগীরা আকারে গৃহপালিত মোরগ ও মুরগীরই সমান। বন মোরগগুলির প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে এদের গায়ের রঙটায় ধূসরের ওপর নানারকম ছোপ আছে, আর আছে কাস্তের মতো একটি বাঁকানো নীলচে কালো রঙের পুচ্ছ। বন মুরগীদের শরীরের ওপর দিকটা বাদামী, নিচের দিকটা প্রায় সাদা, তার ওপর মাছের আঁশের মতো কালো কালো দাগ আছে। এরা একলাও ঘোরে, আবার জোড়ায় জোড়ায় বা ছোটোখাটো দল বেঁধেও থাকে। ছোটোখাটো পাহাড়ের পাদদেশে বাঁশের জঙ্গলে এবং অরণ্যের প্রান্তদেশে পুটুস প্রভৃতি কাঁটাঝোপের .নে এদের দেখতে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম অংশেই প্রধানত এদের বাস, বাঁশবনে এবং কারভি ঝোপে যখন ফল ধরে তখন সেই ফল খেতে এরা দলে দলে এসে জোটে। ধূসর এবং লাল দুই জাতের বনমুরগীই খুব ভীরু আর নিরীহ পাখি। ভোরে আর সন্ধ্যায় এরা মাটি আঁচড়ে খাবার খুঁজতে বার হয়, কিন্তু আত্মগোপনের উপযুক্ত আশ্রয় ছেড়ে কখনই খুব বেশি দূরে যায় না।

এতটুকু কিছু সন্দেহের কারণ ঘটলেই লেজ নিচু করে গলা বাড়িয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে দৌড়ে পালায়। শস্যের দানা, কচি চারা গাছ, পুট্‌স ফল, বুনো কুল প্রভৃতি এদের প্রধান খাদ্য, তা ছাড়া ডুমুর, বটফল ইত্যাদি পেকে যখন গাছ থেকে মাটিতে পড়ে তখন সেগুলিও এরা খুবই তৃপ্তি করে খায়, ছোটোখাটো পোকা-মাকড় কীট পতঙ্গও বাদ দেয় না। এই জাতের মোরগদের ডাক শুনতে লাগে অনেকটা, কঁক্‌-কঁয়া কঁক্‌-কঁয়া—এই ধরনের। ডাকাডাকি যখন শেষ হয়ে আসে তখন গলা নামিয়ে নরম সুরে ওরা আওয়াজ করে, কিউকুন-কিউকুন, অল্প দূর থেকে শোনা যায় ওদের সেই মৃদু গুঞ্জন ধ্বনিব মতো আওয়াজ। উঁচু টিলা বা ভূপাতিত বড়ো গাছের গুঁড়ি অথবা ঐ ধরনের কোনো চোখে পড়বার মতো উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ওরা জোর গলায় ডাক শুরু করে। ডাকবার আগে ডানা ঝটপট করাও ওদের একটি বিশেষত্ব। একটি মোরগের ডাক শুনলেই এদিক-ওদিক থেকে আরো অন্য মোরগেরা সাড়া দিয়ে ওঠে। বনমোরগেরা একটি মুরগীর প্রেমেই সন্তুষ্ট থাকে, না নবাব-বাদশাদের মতো গোটা একটি হারেম পুষতে ভালোবাসে সেটা এখনো সঠিকভাবে জানা যায় নি। অরণ্যের ঘন ঝোপঝাড়ের নিচে অগভীর গর্তের মধ্যে শুকনো পাতা বিছিয়ে ওরা বাসা বানায়। বনমুরগী এক-একবারে 4—7টি ডিম পাড়ে, ডিমের রঙ হলদেটে, অনেকটা দেশী মুরগীর ডিমের মতোই।

'রেড জাঙ্গ্‌ল ফাউল' বা লাল বনমুরগীই (G. gallus) হচ্ছে সবরকম গৃহপালিত মুরগীদের পূর্বজ। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে এবং হিমালয়ের পাদদেশের ছোটো ছোটো পর্বতসংকুল

অরণ্যে এই মুরগীদের দেখা পাওয়া যায় প্রচুর, তা ছাড়া যেখানে যেখানে শালবন আছে সেখানেই এই লাল মুরগীরাও আছে, তাই মধ্য ভারতের পূর্বাঞ্চলে এই মুরগী যথেষ্ট দেখা যায়। হালকা ব্যান্টাম জাতের গৃহপালিত মুরগীদের সঙ্গে এদের চেহারায় খুব মিল আছে এবং এই মোরগদের ডাকও ঠিক পোষা মোরগের মতো।

ভারতের মোরগ গোষ্ঠীর সবচেয়ে দর্শনীয় পাখি হচ্ছে সাধারণ **পী ফাউল বা ময়ূর** (Pavo cristatus)—চিত্র নং 31। হিন্দীতে বলে মোর বা ময়ূয়। ময়ূব আমাদের 'জাতীয় পক্ষী' হিসাবে সম্মানিত। ময়ুর এতই স্বনামধন্য পাখি যে বিশেষ করে এব বর্ণনা দেবার কোনোই প্রয়োজন নেই। তবে এটা হয়তো অনেকেই জানেন না যে ময়ূরের সুচিত্রিত বিশাল পেখমটি আসলে তার পুচ্ছ নয়, ওটি হচ্ছে পুচ্ছের ওপরের অতিরিক্ত লম্বা একটি ঢাকনা। ময়ূরীরও মাথায় ঝুঁটি থাকে ময়ূরের মতোই, কিন্তু পেখম থাকে না। ময়ূরীর গায়ের রঙও অতটা উজ্জ্বল নয়, বাদামী রঙের ওপর গলা ও বুকের কাছে নীলচে সবুজের ছোপ আছে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পত্রবিরল অরণ্যে এবং অনতিউচ্চ পার্বত্য অঞ্চলেব বনে ময়ূরেরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। কোনো কোনো ঋতুতে ময়ূর এবং ময়ূরীরা আলাদা আলাদা থাকে। সকালে এবং সন্ধ্যায় ওরা বন থেকে বার হয়ে খোলা মাঠে বা চাষের জমিতে খাবার খুঁজতে আসে। রাজস্থান, গুজরাত প্রভৃতি রাজ্যে ধর্মীয় কারণে ময়ূরদের সুরক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাই এই-সব জায়গায় ময়ূরেরা অনেকটা পোষমানা নিরীহ প্রকৃতির। কিন্তু একেবারে আরণ্য পরিবেশে

ময়ূর কী অসাধারণ ধূর্ত শিকারী পাখি তা কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না। দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তি এদের অদ্ভুত তীক্ষ্ণ, এতটুকু সন্দেহের কারণ ঘটলেই, ঝোপঝাড়ের তলা দিয়ে এমন নিঃশব্দে ওরা পালিয়ে যায় যে অতর্কিতে ওদের ধরে ফেলা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার বলা চলে। কিন্তু হঠাৎ তাড়া খেলে ওরা প্রবল বেগে ডানা ঝাপটে একেবারে রকেটের মতো সোজা আকাশে উঠে যায় আর অতবড়ো একখানা পেখম নিয়েও বেশ দ্রুত-গতিতেই কিছুদূর উড়ে যায়। রাত্রে ওরা আশ্রয় নেয় উঁচু গাছের ডালে। ভোর না হতেই ওদের কেকা ধ্বনিতে সারা অরণ্য মুখরিত হয়ে ওঠে, তবে চেহারাটা ওদের যেমন সুন্দর, ডাকটা তেমন সুশ্রাব্য মোটেই নয়। প্রধানত শস্যের দানা, কন্দ, মূল, শাকসবজীর ডাঁটা এই-সবই ওরা খায় বটে কিন্তু আমিষ আহারেও ওদের কিছুমাত্র অরুচি নেই। কীটপতঙ্গ, গিরগিটি, ছোটো ছোটো সাপ এ-সবও ওদের খাদ্যতালিকাভুক্ত। অনেক জায়গায় ময়ূর মারা নিষিদ্ধ, সে-সব জায়গায় ময়ূরেরা গ্রামের আশেপাশে কৃষিক্ষেত্রের যথেষ্ট ক্ষতি করে, ক্ষেতের ফসল বা মাটি খুঁড়ে চিনেবাদাম ইত্যাদি তুলেও খায়। এরাও ঝোপের আড়ালে মাটিতেই গর্ত ক'রে তার মধ্যে কাঠিকুটি ও পাতা বিছিয়ে বাসা বানায়। ডিমের সংখ্যা 3 থেকে 5টি, ডিমের রঙ অনেকটা দুধ মেশানো কফির মতো।

ভারতীয় উপমহাদেশে গ্রুইফর্মিস্ (Gruiformes) বর্গের অন্তর্গত বেশ কয়েকটি গোষ্ঠীর পাখিই দেখা যায়, যেমন গ্রুইডি (Gruidae) গোষ্ঠীর ক্রেন বা সারস ইত্যাদি, র‍্যালিডি (Rallidæ) গোষ্ঠীর রেইল এবং ওটিডিডি (Otididæ) গোষ্ঠীর বাস্টার্ড ইত্যাদি।

ক্রেনদের বলা হয় সারস ক্রেন (Grus antigone)—

চিত্র নং 32 : হিন্দী ও বাংলাতে বলে সারস।

এগুলি বিরাট আকৃতি ধূসর বর্ণের পাখি, আকারে শকুনদের মতো এবং দাঁড়ালে প্রায় মানুষের সমান লম্বা। পাগুলি লম্বা, অস্থি-সর্বস্ব, লাল রঙের, ন্যাড়া মাথাটি এবং গলার ওপরদিকটাও লাল। চাষের জমি বা জলাভূমিতে ওদের জোড়ায় জোড়ায় ঘুরতে দেখা যায়, বিশেষ ঋতুতে সঙ্গে দুটি-একটি বাচ্চাও থাকে। সাধারণত ঝাঁক বেঁধে এরা ঘোরে না, কিন্তু কখনো কখনো একসঙ্গে শ খানেক পাখিও দেখা গেছে। সারা জীবনে এরা জোড় ভাঙে না, সারসদের দাম্পত্য প্রেম অনেক গল্পে-উপকথায় অমর হয়ে রয়েছে, প্রেমের একনিষ্ঠতার জন্য অনেকেই সারস-পাখিদের প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল। গ্রামের মানুষ কখনো সারস পাখিদের মারে না বা বিরক্ত করে না, তাই ওরাও খুব শান্ত, নিরীহ ব্যবহার করে, কিন্তু ওদেরই যে-সব আত্মীয় গোষ্ঠীর পাখিরা প্রব্রজন বৃত্তি নিয়ে এদেশে বেড়াতে আসে তাদের সুস্বাদু মাংসের লোভে মানুষ সমস্তক্ষণ তাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, আর সেই কারণেই তারাও সদাসতর্ক, তাদের পোষ মানানো প্রায় অসম্ভব। ভারী দেহের জন্য সারসের মাটি ছেড়ে আকাশে উঠতে একটু সময় লাগে, কিন্তু একবা. উঠে পড়লে ওরা সুষম ছন্দে পক্ষসঞ্চালন ক'রে বেশ দ্রুতই উড়তে পারে, ওড়ার সময় গলাটি সামনের দিকে এবং পা দুটি পিছন দিকে প্রসারিত থাকে। সারসপাখিরা ডাকে বেশ জোরে, এদের ভরাট গম্ভীর স্বর অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যায়, মাটির ওপর হেঁটে বেড়াবার সময় তো ডাকেই, আকাশে ওড়ার সময়ও ডাকে। প্রজনন ঋতুতে এবং কখনো কখনো অন্য সময়েও স্ত্রী এবং পুরুষ পক্ষী দুজনে

মিলে বেশ মজার নাচ জুড়ে দেয়, ডানা মেলে, মাথা নত করে পরস্পরের দিকে ছুটে যায় আবার পরমুহূর্তেই শূন্যে আত্মহারা হয়ে লাফ দেয়। এদের প্রধান খাদ্য শস্যের দানা, কন্দ, মূল, শাকসবজী, পোকামাকড়, সাপ, ব্যাঙ এবং কখনো কখনো মাছও। এরা নির্ভয়ে মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পায় বলে প্রায়ই চিনেবাদাম ও অন্যান্য ফসলক্ষেতের যথেষ্ট ক্ষতি করে। জলজ তৃণ, ঘাস খড় ইত্যাদি দিয়ে এরা বিরাটাকৃতি বাসা বাঁধে, জলেভরা ধানক্ষেতের মাঝখানে আর নয়তো জলাভূমির মধ্যে একটুখানি মাথাজাগানো ছোটো কোনো দ্বীপের ওপর। সাধারণত এরা 2টি করে ডিম পাড়ে, ডিমগুলি ফিকে সবুজ বা গোলাপি আভাযুক্ত সাদা, মাঝে মাঝে তাতে বাদামী বা বেগুনি রঙের ছিটেও দেখা যায়।

শীতকালে ভারতীয় উপমহাদেশে বেড়াতে আসে আরো দুরকমের ধূসর সারস, এদের মধ্যে ছোটোটির নাম **'ডমোয়াজেল'** (Demoisclle) (Anthropoides virgo)। হিন্দীতে বলে কর্করা বা কুঞ্জ্।

এদের মাথায় পালক আছে এবং কানের কাছে আছে ঝকঝকে সাদা দাগ, গলা এবং বুকের রঙ কালো, এই চিহ্নগুলি দেখেই এদের চেনা যায়। অন্য প্রজাতিটির হিন্দী নাম কুলং, ইংরাজিতে বলে **'কমন ক্রেন'** (Grus grus)। এদের মাথাটি ন্যাড়া এবং কুচকুচে কালো, তা ছাড়া ঘাড়ের কাছে একটি সুস্পষ্ট লালের ছোপ আছে।

রেইলরা (rails, র‍্যালিডি গোষ্ঠী) ভীরু স্বভাবের এবং জলাভূমি অঞ্চলের পাখি, ছোট্টো থেকে মাঝারি আকারের, লেজটি হ্রস্ব, ডানা

গোল ধরনের এবং পা দুটি লম্বা ও অস্থিসর্বস্ব। পায়ের আঙুলও এদের বেশ লম্বা। **হোয়াইট ব্রেস্টেড্ ওয়াটারহেন্** বা শ্বেতবক্ষ জলমুরগী (Amaurornis phoenicurus) এই জাতের পাখির বেশ ভালো উদাহরণ। চিত্র নং—33। বাংলায় এদেরই বলে ডাহুক। এই পাখিদের রঙ ধূসর, লেজ ছোটো এবং পা অস্থিসর্বস্ব, জলাভূমি অঞ্চলেই এদের দেখা যায়। আকারে এরা প্রায় ধূসর বা খয়েরি তিতিরদেব মতো। ডাহুকদের মাথা আর বুক ধপধপে সাদা এবং উঁচুকরা লেজের নিচের অংশের রঙ মরচে পড়া লোহার মতো লাল। জল ছাড়া এই পাখিরা থাকতেই পারে না, গ্রামের পুকুর ও ঝিলের আশেপাশের ঝোপেঝাড়ে এরা একা বা জোড় বেঁধে ঘোরে। বর্ষায় যখন খানা খন্দ সব জলে ভরে ওঠে তখন ওদের রাস্তার পাশের নালার পাড়ে বা পথের ধারের ঝোপে দেখতে পাওয়া যায়। যখন ওরা আপনমনে ঘুরে বেড়ায় অথবা ঝোপের তলা দিয়ে দিয়ে গা ঢাকা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে, সমস্তক্ষণ ওদের বেঁটে খাটো লেজটি উঁচু করে তুলে রাখে, তাই লেজের নিচের দিকের লাল বঙ বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ে। ডাহুকরা লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতেই বেশি ভালোবাসে, একটু সন্দেহের কারণ ঘটলেই একেবারে লুকিয়ে পড়ে তবে জ্বালাতন । করলে ওরা আস্তে আস্তে পোষ মানে এবং কোনো অনিষ্ট হবার ভয় নেই বুঝতে পারলে, লোকের বাগানে ঢুকে বেড়ার ধারে ধারে বেশ আপনমনে ঘুরে বেড়ায়। কীটপতঙ্গ, পোকামাকড়, বিভিন্ন রকমের বীজ এবং শাকসবজী এদের খাদ্য। বর্ষাকাল এদেব প্রজননের ঋতু এবং এই সময় ছাড়া অন্য সময় এরা প্রায় নিঃশব্দেই থাকে। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ ডাহুক বেজায় কলহপ্রিয় হয়ে ওঠে, ঝোপ-

ঝাড়ের মাথায় উঠে গলা ছেড়ে ডাকাডাকি আরম্ভ করে দেয়। এদের ডাকটা মোটেই অন্য পাখিদের মতো সুরেলা নয়, একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ এবং তার সঙ্গে আরো কিছু আওয়াজ যা শুনতে অনেকটা লাগে— ক্রর্‌র্‌র্ কোয়াক্ কোয়াক্— এই ধরনের, মনে হয় যেন একটা ভালুক যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে একটানা কুক্ কুক্ করে ওরা ডেকেই চলে, সে ডাকটা শুনে মনে হয় ঠিক যেন কোথাও ময়দার কল চলছে, অবিকল ঐ রকম ফুক্ ফুক শব্দ। একটানা প্রায় 15 মিনিট ধরে ডাকবার পর ওরা একবার থামে। মেঘলা দিনে সারাদিন সারারাত ধরে শোনা যায় ওদের ডাক। ওরা সাধারণত বাসা বাঁধে মাটিতে, ঝোপের তলায় আর নয়তো ঘন ঝোপের ডালে মাটি থেকে সামান্য দু-এক মিটার উঁচুতে। কাঠিকুটি লতা-পাতা দিয়ে গড়া বাসাটির আকার অনেকটা বাটির মতো। জলের ধারেই বাসা বাঁধে ওরা। এদের ডিমের সংখ্যা 6/7টি, ডিমের রঙ ফিকে হলুদ বা গোলাপি মেশানো সাদা, তাতে লালচে বাদামীর ছিটেও থাকে।

রেইল গোষ্ঠীর আর-একটি পাখি হল পার্পল মুরহেন্ বা বেগুনি মুরহেন্ (Porphyrio porphyrio) চিত্র নং—34 :

হিন্দীতে বলে কাইম্, খারিম্ বা কলিম্।

বাংলা নাম— কামপাখি।

এই পাখিগুলি দেখতে সুন্দর কিন্তু বিশেষ চটপটে নয়। আকারে পোষা মুরগীর মতোই, গায়ের রঙ বেগুনি ও নীল মেশানো, পা লম্বা এবং মাংসহীন, পায়ের আঙুলগুলিও খুব লম্বা। এদের ঠোঁট লম্বা নয়। ভারী লাল রঙের ঠোঁট থেকে আরম্ভ করে

মাথা পর্যন্ত, লাল রঙের একটি ঢালের মতো কপাল আছে এদের। তা ছাড়া বেঁটে লেজের নিচের দিকে আছে সাদা রঙের ছোপ, প্রতি পদক্ষেপেই এই সাদা ছোপটি চোখে পড়ে এবং এইগুলি দেখেই ওদের সহজে চেনা যায়। জলজ উদ্ভিদে ভরা জলা জায়গায় দলবদ্ধভাবে দেখা যায় এদের, ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে ওরা লম্বা জলজ ঘাস লতা ইত্যাদির মধ্যে খাবার খুঁজে বেড়ায় কিন্তু ওদের ঘোরাফেরার মধ্যে সাবলীলতার যেন অভাব আছে। ভাসমান গাছপালা এবং পদ্মপাতার ওপরেও ওরা ঘুরে বেড়ায় লেজটি সর্বদা ওপর দিকে তুলে, এটি রেইল গোষ্ঠীর পাখিদের একটি বৈশিষ্ট্য। হঠাৎ ভয় পেলে এই পাখিরা চট করে লুকিয়ে পড়ে আড়ালে, কিন্তু নেহাৎ বাধ্য না হলে এরা আকাশে ওড়ে না। দেখলে মনে হয় ওড়ার ব্যাপারে এরা বিশেষ পটু নয়, ওড়ার সময় লম্বা পা দুটি পিছন দিকে লটপট করে ঝুলতে থাকে, তবে একবার উড়তে শুরু করলে ওরা বেশ অনেকদূর চলে যেতে পারে। ধানগাছ এবং জলজ উদ্ভিদ এদের প্রধান খাদ্য। এরা ধান যত না খায় তার চেয়ে বেশি ধানগাছ মাড়িয়ে নষ্ট করে। কীটপতঙ্গ আর শামুকগুগলিও যে ওরা খায় না, তা নয়। ওরা নানারকম কর্কশ আওয়াজ ক'রে সারাদিনই ডাকে, বিশেষ করে .মেঘলাদিন হলে তো কথাই নেই। বর্ষার দিনে জলজ উদ্ভিদের ভিতর থেকে ভেসে আসে ওদের ডাক। প্রজনন ঋতুতে ওদের ডাকাডাকির পালা খুব বেশি বেড়ে যায়। পুরুষপাখি ঠোঁটে জলজতৃণ নিয়ে নানারকম মজার অঙ্গভঙ্গি করে প্রেমিকার মন ভোলাতে চেষ্টা করে, মাথা নত করে নমস্কারের ভঙ্গিতে সঙ্গিনীর দিকে এগিয়ে যায় বার বার আর সেইসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে থাকে। অভিজাত

শিকারীরা অবশ্য বেগুনি মুরহেন্‌কে বিশেষ উঁচুদরের পাখি বলে মনে করেন না, কিন্তু গ্রাম্য শিকারীরা এদের যথেষ্ট শিকার করে এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষ এই পাখির মাংস বিশেষ তৃপ্তি সহকারে আহার করে। জলের ওপর ভাসমান জলজ উদ্ভিদের ডালপালার ওপর ধানগাছের পাতা ইত্যাদি দিয়ে বুনুনি করে বেশ গভীর মতো বাসা বানায় এই পাখিরা। এদের ডিমের সংখ্যা 3 থেকে 7টি, রঙ ফিকে হলুদ বা লালচে হলুদ, তাতে লালচে বাদামী ছিট থাকে।

বাস্টার্ডরা ওটিডিডি (Otididae) গোষ্ঠীর পাখি। এ দেশে এই পাখিদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রজাতির নাম **গ্রেট ইণ্ডিয়ান বাস্টার্ড** (Choriotis nigriceps) চিত্র নং— 35 :

হিন্দী নাম— তুকদার বা হুক্‌না।

বাংলা নামও ঐ একই।

এগুলি বেশ বিরাটাকৃতি ভূমিচর পাখি, আকারে প্রায় একটি শকুনের সমান, উচ্চতায় প্রায় একমিটার এবং ওজনে 15 কিলো-গ্রামের কাছাকাছি। এই পাখিদের দেখতে অনেকটা উটপাখি বা অস্ট্রিচের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা চলে। মজবুত মাংসহীন দুটি পায়ের ওপর এদের লম্বা গড়নের শরীরটি সমকোণ রচনা ক'রে অবস্থিত। এই বিশেষত্বটি লক্ষণীয়। পিঠের দিকের ফিকে বাদামী হলদে রঙের পালকের ওপর প্রচুর কালো ছিট আছে, শরীরের নিচের অংশ সাদা, তবে গলার নিচে সমস্ত বুকটি বেষ্টন করে একটি পাড়ের মতো কালো দাগ আছে। শুভ্র কণ্ঠ, মাথার ওপর কালো ছোপ আর ডানার প্রান্তভাগের সাদা রঙ এদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য,

ওড়ার সময় ডানার প্রান্তে ঐ সাদা ছোপটি খুব স্পষ্ট চোখে পড়ে। স্ত্রী পাখিগুলি আকারে ছোটো। কখনো কখনো এদের নিঃসঙ্গ অবস্থায় দেখা যায় বটে তবে সাধারণত দুটি তিনটি করে একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, অবশ্য একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে 25/30টি এইজাতীয় বাস্টার্ডের দেখা পাওয়ার কথাও শোনা গেছে। শুষ্ক, প্রায় মরুভূমির মতো জায়গা এবং উষর তৃণভূমি যার মাঝে মাঝে কাঁটাগাছের জঙ্গল এবং আশেপাশে অল্পস্বল্প কৃষিক্ষেত্র আছে সেই-সব স্থানই এই পাখিদের পছন্দ। লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকতে এরা ভালোবাসে, তাই সোজাসুজি এদের কাছে এগোনো মুস্কিল, কোনো গ্রামপথের গোরুরগাড়ি বা বিচরণশীল উটের পেছনে আত্মগোপন করে এদের অনুসরণ করতে হয়। দুঃখের বিষয় এইটেই যে, এই পাখিগুলির বুদ্ধিসুদ্ধি একটু কম, শিকারীদের জীপগাড়ি দেখেও এরা সাবধান হতে শেখে নি, ফলে, যদিও আইনত এই পাখি-শিকার নিষিদ্ধ কিন্তু হঠকারী শিকারীরা গত কয়েক বছরে এদের বংশ প্রায় নির্মূল করে ফেলেছে। ওড়ার সময় প্রথমটা আকাশে উঠতে এদের একটু অসুবিধা হয়, কিন্তু একবার উড়তে শুরু করলে এরা বেশ স্বচ্ছন্দে পক্ষসঞ্চালন করে একটানা বেশ কয়েক কিলোমিটার উড়ে যায়, অবশ্য খুব বেশি উঁচুতে এরা কখনই ওড়ে না। পঙ্গপাল, ফড়িং, বোলতা, মৌমাছি ইত্যাদি এবং শস্যের চারাগাছ ও দানা এদের প্রধান খাদ্য, গিরগিটি, ছোটো সাপ ও কেন্নোজাতীয় প্রাণীও এরা খেয়ে থাকে। ভয় পেলে ওরা 'হুক' শব্দ করে বেশ জোরে ডাকে। পুরুষ বাস্টার্ডের একাধিক প্রেমিকা থাকে এবং সে টার্কী পাখিদের মতোই নানারকম কায়দা-কানুন দেখিয়ে সঙ্গিনীদের মুগ্ধ করার চেষ্টা করে, সেইসঙ্গে গভীর স্বরে

একটা বিশেষ ধরনের ডাকও ডাকে। সাধারণত ওরা ডিম দেয় একবারে 1টিই, তবে কচিৎ কখনো 2টি ডিমও দেখা যায়, কাঁটা-ঝোপের নিচে অগভীর গর্তে ওরা ডিম পাড়ে, ডিমের রঙ ফিকে অলিভ বাদামী তাতে মাঝে মাঝে গাঢ় বাদামীর ছোপও থাকে।

নানা ধরনের 13টি গোষ্ঠীর পাখি শারাড্রিফর্মিস (Charadriiformes) বর্গের অন্তর্গত। এরা সবাই জলচর বা জলের ধারেই বাস করতে ভালোবাসে। ভারতীয় উপমহাদেশ এইজাতীয় বহু পাখিরই স্বদেশ, তা ছাড়া প্রতিবছর বিদেশ থেকেও এই-সব গোষ্ঠীর অনেক পাখিই এ দেশে আসে। এইরকম একটি গোষ্ঠীর নাম জাকানিডি (Jacanidae)— জাকানা বা লিলিট্রটারদের দুটি প্রজাতিকে আমরা দেখতে পাই।

ব্রোন্জ্-উইংড্ জাকানা (Bronze winged Jacana) (Metopidius indicus) চিত্র নং— 36 :

বাংলায় এদের বলে জলপিপি। মস্তবড়ো পা-ওয়ালা এই পাখিটি জলাভূমি অঞ্চলেই থাকে, আকারে প্রায় খয়েরি তিতিরের মতো আর চাল-চলনে অনেকটা মুরহেন্দের সঙ্গে মিল আছে। এদের মাথা, গলা আর বুক উজ্জ্বল কালো রঙের, সবুজাভ ব্রোন্জের মতো রঙের পিঠ এবং ডানা, আর বেঁটে পুচ্ছটি বাদামী লাল। চোখের পাশ থেকে ঘাড় পর্যন্ত বিস্তৃত সাদা রেখাটি এই পাখিটিকে চিনিয়ে দেয় অভ্রান্তরূপে, পাখিটির সমস্ত দেহটা গাছপালার আড়ালে থাকলেও শুধু ঐ সাদা দাগটা দেখেই পাখিটিকে সনাক্ত করতে অসুবিধা হয় না। বাচ্চা পাখিদের গায়ের রঙ প্রধানত সাদা লাল ও বাদামী। বিরাটাকৃতি মাকড়শার দাঁড়ার মতো

পায়ের আঙুল জাসানাদের বিশেষত্ব, এই ধরনের পায়ের জন্য জলজ উদ্ভিদে ভরা পুকুর ও ঝিলের জলে ভাসমান লতা-পাতার ওপর ঘুরে বেড়াতে এদের খুব সুবিধা হয়, এইভাবে ঘুরে ঘুরেই ওরা জলের পোকা-মাকড় এবং জলজ গাছপালার বীজ ও ডাঁটা খায়। জ্বালাতন না করলে এই পাখিগুলি বেশ পোষ মানে এবং নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। গ্রামের ঘাটে যেখানে গ্রামবধূরা কলরব করে বাসন ধুতে বসেছে বা ধোপা সশব্দে কাপড় কাচছে তারই আশেপাশে এরা নিশ্চিন্ত মনে চরে বেড়াচ্ছে দেখা যায়। আমাদের দেশে যে দুটি প্রজাতি দেখা যায় তারা উভয়েই জলে ডুবুরীর মতো ডুব দিতে পারে এবং দরকার পড়লে সাঁতারও কাটতে পারে। তবে ওড়ার ভঙ্গি ওদের দুর্বল, খুব দ্রুত পক্ষসঞ্চালন ক'রে ওড়ে ওরা, ওড়ার সময় গলাটি সামনের দিকে বাড়ানো থাকে আর পাদুটি অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঝুলতে থাকে পিছনে। এই জলপিপিদের ডাকটা একটা তীক্ষ্ণ সিক্-সিক্-সিক্ এই ধরনের শুনতে লাগে। প্রজনন ঋতুতে এরা বেশ ঝগড়াটে স্বভাবের হয়ে ওঠে এবং ডাকাডাকির মাত্রাও বেড়ে যায়। একরকম হ্রস্ব ও কর্কশ ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দও করে এরা।

এদেরই আর-এক প্রজাতির নাম, ফেজাণ্টটেইলড্ জাসানা (Hydrophasianus chirurgus), এদের আচার অভ্যাস বাসস্থান সবই ব্রোনজ্-উইঙ্গ জাসানাদের মতোই, একই পুকুরে এই দুই প্রজাতির পাখিই দেখা যায়। এদের গায়ের রঙ সাদা আর খয়েরি মেশানো এবং লম্বা, কাস্তের গড়নের, মোরগদের মতো লেজ এদের বিশেষত্ব। এই জাতের স্ত্রী পাখিরা বহুবল্লভা।

একটি পাখিকে স্বামিত্বে বরণ ক'রে, ডিম পেড়ে সেই ডিমে তা দেওয়া এবং শাবকদের লালন-পালনের ভার সেই পুরুষ পাখিটির ওপরই ছেড়ে দিয়ে স্ত্রী পাখি আবার অন্য সঙ্গী খুঁজে নেয়, এই ভাবেই চলে বার বার। ভাসমান কচুরীপানা বা পানিফলের পাতার ওপর জলজ লতা দলা পাকিয়ে বাসা বানায় এরা। ব্রোন্‌জ-উইঙ্গ জাসানাদের সাধারণত 4/6টি ডিম হয়, ডিমের রঙ বাদামী ব্রোন্‌জ তাতে কালো রেখায় নানারকম চিত্রবিচিত্র করা থাকে। ফেজাণ্টটেইলড্‌ জাসানাদের ডিম ঝকঝকে উজ্জ্বল সবুজাভ ব্রোন্‌জ অথবা লালচে বাদামী রঙের, এদের গায়ে কোনো দাগ থাকে না।

শারাড্রিডি (Charadriidae) গোষ্ঠীর প্লোভার, স্যাণ্ডপাইপার প্রভৃতি পাখি এদেশেরই বাসিন্দা, তা ছাড়া এই গোষ্ঠীর কিছু পাখি উত্তরাঞ্চল থেকে প্রতি শীতকালে এখানে আসে হাওয়া বদলাতে। প্লোভারদের যে প্রজাতিটি এ দেশে সবচেয়ে সুলভ তার নাম রেড্‌ওয়াট্‌ল্‌ড্‌ ল্যাপউইঙ্‌ (Vanellus indicus) চিত্র নং—37 :

হিন্দী নাম— তিত্তিরী বা তেতুরী।

বাংলায় এদেরই বলে টিট্টিভ বা টিটিপাখি। আকারে এই পাখিগুলি খয়েরি তিতিরদের প্রায় সমান, পিঠের রঙ বাদামী ব্রোন্‌জ, পেটের দিকে সাদা, মাথা, বুক ও গলা কালো এবং দুই চোখের সামনে একটি করে লাল মাংসল ঝাঁচিলের মতো আছে। চোখের পাশ থেকে একটি চওড়া সাদা দাগ গলার ধার বরাবর নেমে গিয়ে পেটের কাছের সাদা অংশের সঙ্গে মিশে গেছে।

খোলা মাঠে, ঘাসজমিতে বা চষাক্ষেতে জোড়ায় জোড়ায় অথবা একসঙ্গে 3/4টি করে এই পাখি দেখা যায়। সাধারণত একটু ভিজে ভিজে জায়গা এবং পুকুর বা ডোবার আশেপাশেই ওরা থাকতে ভালোবাসে। প্লোভারদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ঠোঁটটি জমির দিকে বাগিয়ে ধরে ওরা ছুটোছুটি করে খাবার খুঁজে বেড়ায়, দিনে এবং রাতে সব সময়ই ওদের বেশ তৎপরতার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। শত্রু সম্পর্কে এরা অতিমাত্রায় সজাগ ও সতর্ক, নিজেদের এলাকার ধারেকাছে কোনো মানুষ বা অন্য কোনো মাংসাশী প্রাণীর সাড়া পেলে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ডাকাডাকি শুরু করে দেয়।

এদের বাসা আর শাবকেরা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে পক্ষীদম্পতি উত্তেজিত হয়ে প্রচণ্ড চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে শত্রুর মাথার ওপর চক্রাকারে উড়তে থাকে এবং নিচু হয়ে শত্রুকে ঠোকর মারবার চেষ্টা করে। এদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে পোকা-মাকড় ও কীট-পতঙ্গ। ওড়ার গতি এদের খুব দ্রুত নয় এবং বেশ জোর দিয়ে পক্ষসঞ্চালন করতে হয়। সাধারণত অল্প দূর উড়েই এরা মাটিতে নেমে পড়ে এবং মাটি ছোঁয়ার পর কিছুটা দৌড়ে গিয়ে তবে থামে। ওরা মাটিতে সামান্য গর্ত করে বাসা বানায় এবং গর্তের সীমানা বরাবর নুড়ি পাথর সাজিয়ে রাখে। গর্তের ভিতর কোনো আস্তরণ বিছায় না। গ্রাম্য জলাশয়ের শুষ্ক তলদেশ বা রৌদ্রদগ্ধ ফাটলধরা মাঠ ওদের মনের মতো বাসা বানাবার স্থান। অনেক সময় ওদের পাকাবাড়ির ছাতে বা রেল লাইনের ফাঁকেও বাসা বানাতে দেখা গেছে। সাধারণত এক-একবারে ওরা ডিম দেয় 3-4টি করে, ডিমের

রঙ কিছুটা ধূসর খয়েরি, তাতে কালো ছোপও থাকে। এই ডিমগুলি এবং সদ্যোজাত বাচ্চাদের রঙ এমন নিখুঁত ভাবে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিশে যায় যে অনেক সময় একেবারে চোখের সামনে থাকলেও সহজে নজরে পড়ে না।

সাধারণ স্যাণ্ডপাইপার (Tringa hypoleucos) চিত্র নং— 38 :

এদের বাংলায় বলা হয় কাদাখোঁচা।

মাংসহীন পা এবং সরু ঠোঁট বিশিষ্ট যে-সব জলাভূমি অঞ্চলের পাখিকে সাধারণত স্নিপেট্ বলা হয় তাদেরই মধ্যে একটি হচ্ছে এই কাদাখোঁচা পাখি। এগুলি আকারে বটের পাখির মতো, পিঠের দিকের রঙ অলিভ বাদামী, পেটের দিকটা সাদা, বুকের কাছে ফিকে কাল্‌চে ছোপ এবং ঘাড়ের কাছে কয়েকটি গাঢ় রঙের দাগ আছে। ওড়ার সময় ওদের বাদামী পশ্চাদ্‌ভাগ, প্রান্তদেশে সাদা পালক-সম্বলিত বাদামী রঙের পুচ্ছ এবং ডানার সাদা দাগ 'উড্ স্যাণ্ডপাইপার'দের থেকে ওদের আলাদা করে চেনা যায়। এই সাধারণ কাদাখোঁচা পাখিরা মরশুমের শুরুতে সবাইকার আগে হাজির হয় এবং উত্তরাঞ্চলে নিজেদের জন্মভূমিতে ফিরে যায় সবাইকার শেষে। আমাদের সবচেয়ে কাছাকাছি এদের জন্মস্থান কাশ্মীর এবং গাড়ওয়াল অঞ্চল। এদের মধ্যে যে-সব পাখি প্রজননে উৎসাহী নয়, তারা অনেক সময় সারাবছরই সমতল ভূমিতে কাটায়। উড্ স্যাণ্ডপাইপারদের মতো এরা দলবেঁধে থাকে না। এদের সব সময় জলের ধারে একলা একলা ছুটোছুটি করে বেড়াতে দেখা যায়, ছোটার সময় শরীরের পশ্চাদ্-ভাগ প্রবল বেগে নাড়া দেয় এবং মাঝে মাঝে মাথা ও ঘাড়

ঝাঁকায়। হঠাৎ তাড়া খেলে ওরা দ্রুত পাখা নেড়ে জলের ওপর দিয়ে উড়ে যায়, সেই সময় ওদের কণ্ঠে শোনা যায় তীক্ষ্ণ সুরের ডাক— টি-টি-টি। যখন বেশ শান্তিতে চরে বেড়ায় তখন কিন্তু ওদের ডাকের ধরন অন্য রকম। বেশ মিষ্টি দীর্ঘ টানা সুরে তখন ওরা ডাকে হুই—ট, হুই—ট, এইভাবে। কোনো কোনো পাখি পরিচিত জায়গা ছেড়ে নড়তে চায় না, একই জায়গায় ঘুরেফিরে কাটিয়ে দেয় দিনের পর দিন। কাদাখোঁচাদের সাধারণ খাদ্য হচ্ছে কীট-পতঙ্গ, শামুক ইত্যাদি জলের ধারেকাছের পোকা-মাকড়। ঝর্না বা নদীর স্রোতের মধ্যের কোনো ছোট্ট দ্বীপে বা নদীর তীরে গর্তের মধ্যে পাতা বিছিয়ে বাসা বাঁধে এরা। ডিমের সংখ্যা সাধারণতঃ ৪টি, রঙ ফিকে হলুদ বা পাথুরে, তাতে লালচে বাদামীর ছিটও থাকে।

উড্ বা স্পটেড্ স্যাণ্ডপাইপার-রা (Tringa glareola) শীতকালে এ দেশে আসে সুদূর সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে। এরা থাকে দলবদ্ধ ভাবে এবং উড়ন্ত অবস্থায় সাদা পশ্চাদ্‌ভাগ ও সাদা পুচ্ছ দেখে সহজেই এদের চেনা যায়। উড়ে যাবার সময় ওদের কণ্ঠে শোনা যায় তীক্ষ্ণ সুরের ডাক, সেটা শুনতে লাগে অনেকটা চিক্-চিক্-চিক্-চিক্ এই ধরনের।

লিট্‌ল রিঙ্‌ড্ প্লোভার (Charadrius dubius) চিত্র নং—39:

হিন্দী নাম— জিরিয়া বা মেরোয়া।

বাংলা নাম— ক্ষুদে বট্টান।

এই পাখিগুলি বটেরদের চেয়ে আকারে একটু ছোটো। প্লোভারদের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই দেখা যায় এই পাখিগুলির মধ্যে,

পিঠের রঙ বালুকণার মতো বাদামী, পেটের দিকে সাদা, মাথাটি গোলগাল, মাংসহীন সরু পা এবং পায়রার মতো ছোটো অথচ মজবুত ঠোঁট। এদের কপালটি সাদা, তার ওপর মাথার কাছে কালো ছোপ, কান এবং চোখের চারপাশও সেই কালো ছোপের মধ্যেই পড়ে, তা ছাড়া সারা গলা জুড়ে রয়েছে একটি কালো বেষ্টনী। গলার সামনের দিকের সাদা আর পিঠের দিকের বাদামী রঙের মাঝখানে এই কালো বেষ্টনীটি যেন একটি বিভাজক রেখা। **কেন্টিশ প্লোভারের** (C. alexandrinus) সঙ্গে এদের গুলিয়ে ফেলার যথেষ্ট সম্ভাবনা, তবে এরা যখন ওড়ে তখনই দেখা যায় কেন্টিশ প্লোভারদের মতো এদের ডানায় সাদা দাগ নেই। স্যাঁতসেঁতে জলাশয়ের পাড়ে, নদীর তীরে বা জোয়ারের জল সরে যাওয়া কর্দমাক্ত ভূমিতে এই পাখিরা জোড়ায় জোড়ায় বা ছোটো ছোটো দল বেঁধে চরে বেড়ায়। দ্রুত পদক্ষেপে ওরা জমির ওপর ছুটোছুটি করে খাবার খোঁজে, খাদ্যবস্তু কিছু নজরে পড়লেই হঠাৎ থেমে গিয়ে মাথা নিচু করে চট করে শিকার ধরে। শিকার ধরার সময় শরীরটা একটা বিশেষ ভঙ্গিতে বাঁকাতে পারে ওরা, এটা সব প্লোভারদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। আরো একটা অদ্ভুত অভ্যাস আছে ওদের। নরম কাদার মধ্যে খাবার খোঁজার সময় পায়ের আঙুল দিয়ে এমন ভাবে কাদা ঘাঁটে যাতে পোকামাকড় চট করে কাদার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। এইভাবেই ছোটোখাটো ফড়িং, কাঁকড়া প্রভৃতি ধরে ওরা আর ঐগুলিই ওদের প্রধান খাদ্য। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এদের গায়ের রঙ অনেক সময়ই এমন অদ্ভুতভাবে মিশে থাকে যে নড়াচড়া না করলে ওদের দেখতেই

পাওয়া যায় না। খাবার খোঁজার সময় ওরা অবশ্য পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবেই ঘোরাফেরা করে, কিন্তু কোনো কারণে ভয় পেলে একটি পাখি যদি আকাশে উঠে পড়ে তা হলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরাও ঝাঁক বেঁধে উড়তে শুরু করবে তীব্রগতিতে, সবাই মিলে একসঙ্গে ঘনসন্নিবিষ্ট ভাবে ওরা এদিক-ওদিক মোড় নিয়ে যখন ওড়ে ওদের পেটের তলার সাদা রঙ তখন মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠে। তীক্ষ্ণাগ্র ডানাগুলি দ্রুত সঞ্চালন করে ওরা ওড়ে বেশ জোরেই কিন্তু মাটি থেকে 4/5 মিটারের বেশি উঁচুতে কখনই ওঠে না। প্রায় সর্বদাই ওরা 4টি করে ডিম পাড়ে, নুড়ি-পাথর-ছড়ানো সমুদ্রতীর অথবা নদীর চরই, ডিম পাড়ার জন্য ওদের মনের মতো স্থান। প্লোভারদের ডিমের বিশেষত্ব হচ্ছে এগুলি মাথার দিকে সরু, হলদে বা সবুজাভ ধূসর রঙের ওপর গাঢ় বাদামী বা বেগুনি আঁকুবুঁকি কাটা থাকে। এই ডিমগুলির রঙও এদের পরিবেশের সঙ্গে এমন নিখুঁতভাবে মিলে থাকে যে এদের খুঁজে বার করা বেশ কঠিন কাজ।

বারহিনিডি (Burhinidae) গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হচ্ছে **স্টোন কার্লো** (Stone Curlew) বা **গগ্‌ল আইড্‌ প্লোভার** (Burhinus oedicnemus) চিত্র নং— 40 :

হিন্দী নাম— কারোয়ানক্‌ বা বাঁরসিরি।

বাংলা নাম— হট্টিমা পাখি বা নুড়ি কাঠচূড়।

এগুলি বাদামী রঙ ডোরা দাগওয়ালা প্লোভার জাতীয় ভূমিচর পাখি, খয়েরি তিতিরদের চেয়ে আকারেও বড়ো এবং পা-দুটিও বেশি লম্বা। চওড়া গোল মাথা, মাংসহীন হলুদ রঙের পায়ের

হাঁটু দুটি বেশ চওড়া আর হলদে রঙের গোল চক্ষু এদের বিশেষত্ব। উড়ন্ত অবস্থায় ডানার ওপর দিকের দুটি সরু সরু সাদা দাগ এবং বড়ো কালো পালকগুলির প্রান্তভাগে চওড়া সাদা ছোপ দেখে এদের চেনা সহজ। সাধারণত কাঁটাঝোপে ভরা প্রান্তর, চষাক্ষেত বা নুড়ি ছড়ানো শুষ্ক নদীগর্ভে এই পাখিদের দেখা যায়। তবে কখনো কখনো অগভীর পত্রবিরল অরণ্যে বা গ্রামের পাশের আমবাগানেও এদের দেখা পাওয়া অসম্ভব নয়। এক জোড়া অথবা 4/5টি পাখি একসঙ্গে ঘোরে। এদের বড়ো বড়ো চোখ দেখেই বোঝা যায় এরা প্রধানত গোধূলির আলো-আঁধারিতে এবং রাতের অন্ধকারেই চরে বেড়ায়, দিনের বেলা ঘোরাঘুরি এদের বিশেষ পছন্দ নয়। হঠাৎ ভয় পেলে এরা দ্রুতগতিতে দৌড়ে পালায়, দৌড়বার সময় মাথা নিচু করে গলাটি এমনভাবে সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয় যে শরীরের সঙ্গে গলাটি একই রেখায় এসে যায়। ছুটতে ছুটতে কোনো ঝোঁপ বা বড়ো পাথর পেলে তারই গা ঘেঁষে একেবারে নিশ্চল হয়ে বসে পড়ে, শরীরটা প্রায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে, গলাটি সামনে বাড়িয়ে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকে। এই অবস্থায় পরিবেশের সঙ্গে ওদের গায়ের রঙ এবং দেহের গড়ন এমন বেমালুম মিশে যায় যে খুব কাছ থেকেও চট করে ওদের দেখা যায় না। সাধারণত পোকা-মাকড়, কেঁচো, শামুক-গুগলি, ছোটো ছোটো সাপ এই সবই এদের খাদ্য, তবে খাবার সময় খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ছোটো ছোটো নুড়ি পাথরও এরা গিলে ফেলে। ভোরে, সাঁঝবেলায় এবং চাঁদনী রাতে এই পাখিদের ডাক শোনা যায়। বেশ স্পষ্ট তীক্ষ্ণ শিস দেওয়ার মতো সুরে ওরা ডাকে পিক্-পিক্-পিক্-পিক্…

পিক-উইক, পিক-উইক, দ্বিতীয় স্বরের ওপরই জোরটা পড়ে বেশি। এই ডাকটি প্রায় সবাই কোনো-না-কোনো সময়ে শোনেন, কিন্তু এটা যে এই বিশেষ পাখিটিরই ডাক তা হয়তো অনেকে জানেন না। ঝোপঝাড় বা ঘাসে ঢাকা টিপির তলায়, শুকনো নদীর বুকে, আমবাগানে অথবা কাঁটা গাছে ভরা মাঠে পাথুরে জমিতে সামান্য গর্ত করে এরা বাসা বানায়। সাধারণত একসঙ্গে 2টি ডিম দেখা যায়, ডিমের রঙ ফিকে হলদে বা অলিভ সবুজ তাতে বেশ স্পষ্ট বাদামী বা বেগুনি ছোপ থাকে। চারপাশের পাথর-ভরা জমির মধ্যে ডিমগুলিরও রঙ এমনভাবে মিশে যায় যে খুঁজে বার করা মুস্কিল।

আমাদের দীর্ঘবিস্তৃত সমুদ্রতীর বরাবর ল্যারিডি (Laridae) গোষ্ঠীর গাল্ আর টার্ন জাতীয় পাখিদের দেখা পাওয়া যায়। এদের মধ্যে এদেশী পাখিও রয়েছে আসার কিছু যাযাবর পাখিও আসে। টার্নদের চেয়ে গাল্‌দের গড়ন একটু ভারী, ডানা বেশি চওড়া এবং কম তীক্ষ্ণাগ্র।

এদের মধ্যে যে প্রজাতিটিকে খুব বেশি দেখা যায় সেটির নাম **ব্রাউনহেডেড্ গাল্** (Larus brunnicepl .lus) চিত্র নং— 41 :

হিন্দী নাম ধোম্‌রা, বাংলায় এদেরই বলে গাঙ-চিল। আকারে এরা দাঁড়কাকদের চেয়ে একটু বড়ো, ওপর দিকটা ধূসর এবং পেটের দিকে সাদা, গরমের সময় এদের মাথার রঙ কফির মতো গাঢ়। শীতকালে, যখন আমাদের দেশে এদেব দেখা যায় সে-সময় মাথার রঙ থাকে ধূসরাভ সাদা, অনেক সময় কানের পেছনে একটি

চন্দ্রকলার মতো বাঁকা কালো দাগও থাকে। ব্ল্যাকহেডেড্ গাল্-রা (L. ridibundus) দেখতে এদেরই মতো শুধু আকারে একটু ছোটো, তবে ব্রাউনহেডড্দের ডানার প্রথম বড়ো কালো পালকটির শেষ প্রান্তের দিকে আছে সাদা রঙের ছোপ আর ব্ল্যাকহেডেড্দের ডানার প্রথম বড়ো পালকটি সাদা রঙের, তার প্রান্তভাগে আছে কালো ছোপ। দুই প্রজাতিরই বাচ্চা পাখিদের সাদা লেজের প্রান্তভাগে কালো দাগ দেখা যায়। এই দুই প্রজাতির পাখিই দেখা যায় প্রধানত সমুদ্রতীরে। দেশের অভ্যন্তরে এদের দেখা যায় কম। এই গাল্ বা গাঙ-চিলেরা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এদেশের সমুদ্রতীরে এবং হ্রদগুলিতে এসে উপস্থিত হয়, শীতকালটা এখানে কাটিয়ে আবার এপ্রিলের শেষে ফিরে যায়। বন্দরে, জাহাজঘাটায়, সমুদ্রতীরের মাছধরা গ্রামের আশে-পাশে এরা ঘোরে, বন্দরে নোঙ্গর-ফেলা জাহাজে ও অন্য ছোটো বড়ো যে-সব জাহাজ ও নৌকা বন্দরে আসা-যাওয়া করে সে-সবের পাশে পাশে উড়তে থাকে ফেলে দেওয়া খাবারের টুকরোর লোভে। এই-সব খাবার ছাড়াও জেলেনৌকা থেকে ফেলে দেওয়া মরা মাছ ওরা চিল আর শঙ্খচিলদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে খায়। এই গাঙ্-চিলেরা জলে ভাসমান খাদ্য ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায়, অনেক সময় ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ঠিক হাঁসেদের মতো ভাসতে দেখা যায় ওদের। দেশের অভ্যন্তরে ওরা পোকা-মাকড়, কীট এবং কিছু কিছু শাকসবজীও খায়। ব্রাউনহেডেড্ গাল্দের কণ্ঠস্বর বেশ জোরদার, এদের কর্কশ আওয়াজ শুনতে লাগে অনেকটা— কিই—য়াহ্ এই ধরনের, দাঁড়কাকের ডাকের সঙ্গে কিছুটা মিল আছে।

ভারতের কাছাকাছি অঞ্চলের মধ্যে লাদাখে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বহু উচ্চে অবস্থিত হ্রদগুলির তীরে এই পাখিদের জন্মভূমি। জলে ভাসমান মাটি ও ঘাসের চাপড়ার মধ্যে জলজ লতা গদীর মতো বিছিয়ে এরা বাসা বানায় এবং অনেকগুলি বাসা একই সঙ্গে কাছাকাছি থাকে। ডিমের সংখ্যা 2 বা 3টি, রঙে সবুজাভ সাদা থেকে ফিকে হলদের মধ্যে নানা রকমফের দেখা যায়, তার ওপর গাঢ় বা লালচে বাদামীর ছোপ এবং নানারকম রেখায় বিচিত্র দাগ কাটাও থাকে।

প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে ভারতীয় হুইস্‌কারড্ টার্ন-দের (Chlidonias hybrida) উল্লেখ করা যায়। চিত্র নং— 42 : হিন্দী নাম তেহারী। (সবরকম টার্নদেরই হিন্দীতে বলে কুর্‌রী)—বাংলাতেও অনেকে কুররী বলেন। এই সুন্দর ছিপ্‌ছিপে সাদা ও রুপোলি ধূসর রঙের পাখিটি আকারে একটি পায়রার সমান, কিন্তু পায়রার চেয়ে অনেক রোগা পাত্‌লা। এই প্রজাতিটি জলাভূমির টার্নদের দলে পড়ে, এদের প্রধান বিশেষত্ব, লেজটি সামান্য দ্বিধাবিভক্ত। ঠোঁটের রঙ লাল অথবা কালচে লাল। যখন এরা চুপ করে বসে থাকে তখন দেখা যায় মুড়ে থাকা ডানার প্রান্ত দুটি এত লম্বা যে লেজ পার হয়েও বেরিয়ে রয়েছে। গ্রীষ্মকালে (প্রজনন ঋতুতে) স্ত্রী এবং পুরুষ দুই পাখিরই মাথার ওপর টুপির মতো একটি ছোপ দেখা দেয় এবং পেটের কাছটিও লক্ষণীয়ভাবে কালো হয়ে ওঠে। জলাভূমি, জলেভরা ধানক্ষেত আর সমুদ্রতীরের কর্দমাক্ত সমতল ভূমিতে এই পাখিদের দেখা পাওয়া যায়, সরু লম্বা ডানায় ভর করে সুন্দর ভঙ্গিতে এরা এদিক-ওদিক উড়ে

বেড়ায়, কিন্তু ঠোঁট আর চোখ থাকে মাটি আর জলের দিকে একাগ্র, শিকার কিছুতেই যাতে ফস্‌কে না যায়। মাঝে মাঝেই ওরা তির্যক গতিতে নেমে এসে কাঁকড়া, পোকামাকড়, ব্যাঙাচি বা ছোটো মাছ ছোঁ-মেরে তুলে নিয়ে যায়। যে-সব জেলেনৌকা দূর সমুদ্র থেকে মাছ ধরে ফিরে আসে তাদের পাশে পাশেও এরা উড়তে থাকে মাছের লোভে। যদিও টার্নদের পায়ের আঙুল চামড়া দিয়ে জোড়া, সাঁতার কাটার উপযুক্ত কিন্তু ওরা গাঙ্‌-চিলদের মতো সাঁতার কাটে না। বেশিরভাগ সময়েই ওরা আকাশে ওড়ে আর নয়তো ছোট্ট ছোট্ট পায়ে ভর দিয়ে তীরে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করে। আকাশে ওড়ার সময় শোনা যায় ওদের ক্রীক্ ক্রীক্ শব্দের তীক্ষ্ণ কর্কশ ডাক।

টার্নদের আর-একটি প্রজাতির নাম **রিভার টার্ন** (Sterna aurantia)। জলাভূমির চেয়ে নদীতে থাকতেই এরা বেশি ভালোবাসে। এগুলিরও রঙ ধূসরে সাদায় মেশানো, মাথায় বাদামী ছিটদার টুপির মতো ছোপ আছে, তবে আকারে এরা একটু বড়ো, ঠোঁটের রঙ এদের হলদে এবং লেজটিও আরো বড়ো ও আরো বেশি চেরা। প্রজনন ঋতুতে এদের মাথার টুপিটির রঙ হয়ে যায় কুচকুচে কালো তবে শরীরের নিচের দিকের রঙ সাদাই থাকে।

হুইস্‌কারড্ টার্নদের জন্মস্থান কাশ্মীর এবং উত্তর-ভারতের আরো কোনো কোনো অঞ্চল। হ্রদ বা জলাভূমির জলে ভাসমান পানিফল জাতীয় গাছ-গাছড়ার ওপর জলজ তৃণ গোল করে পাকিয়ে গদীর মতো করে এরা বাসা বানায়। ডিমের সংখ্যা 2/3টি, ডিমের রঙ সবুজাভ, নীলাভ, বাদামী নানারকমই হয়ে থাকে, তাতে গাঢ় বাদামী আর বেগুনির ছিটেফোঁটাও দেখা যায়।
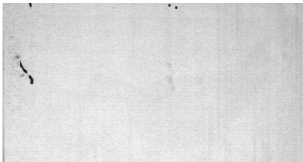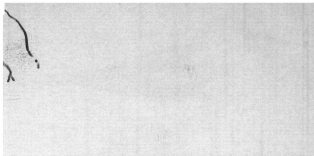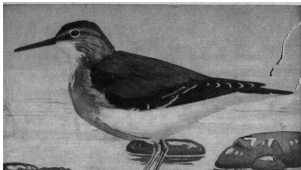
চিত্র 35
তুকদার বা হুকনা
(গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড)
(*Choriotis nigriceps*)
দ্রষ্টব্য পৃঃ 98

চিত্র 39
খুদে বাটান
(লিটল রিংড্ প্লোভার)
(*Charadrius dubius*)
দ্রষ্টব্য পৃঃ 105

চিত্র 45
পায়রা
(ব্লু রক পিজিয়ন)
(*Columba livia*)
দ্রষ্টব্য পৃঃ 117
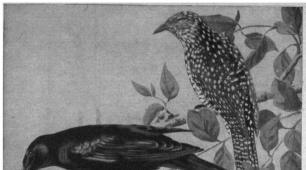
কলাম্বিফর্মিস্ (Columbiformes) বর্গের পাখিদের মধ্যে আমাদের দেশে পাওয়া যায় স্যাণ্ডগ্রৌজ (টারোক্লিডি গোষ্ঠী) (Pteroclidae), পায়রা এবং ঘুঘু পাখি (কোলাম্বিডি গোষ্ঠী)। এই দুই গোষ্ঠীরই বহু প্রজাতি আছে যেগুলি খাদ্য হিসাবে লোভনীয় এবং সেইজন্যই শিকারীদের কাছে এরা বিশেষ মূল্যবান পাখি। এদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অন্যতম প্রধান হল জল পান করার বিশেষ ভঙ্গিটি। মুরগীরা যেমন ঠোঁট ডুবিয়ে জল টেনে নেয় তারপর মাথা তুলে জলটা গিলে ফেলে, এরা তা করে না, এরা ঘোড়ার মতো জলে মুখ ডুবিয়ে জলপান করে, জল থেকে ঠোঁট একবারও তোলে না। স্যাণ্ডগ্রৌজরা অনেকটা পায়রার মতোই কিন্তু এদের পালকের বাহার খুব বিচিত্র এবং ঘনসন্নিবিষ্ট, তবে মোটামুটিভাবে পালকে বাদামী রঙটাই প্রধান। এদের গলা এবং পা বেশ ছোটো, লেজটি খুব সরু এবং কোনো কোনো প্রজাতির লেজের মাঝখানের পালকগুলি খুব লম্বা এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণাগ্র। মরুপ্রায় শুষ্ক অঞ্চলে এবং শস্যশূন্য চষা ক্ষেতে এরা ঝাঁক বেঁধে থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট জলাশয়ে প্রতিদিন ঠিক একই সময় ওদের জলপান করতে যেতে দেখা যায়।

সাধারণ স্যাণ্ডগ্রৌজ (Pterocles exustus) চিত্র নং—43 : হিন্দীতে বলে ভাট তীতর্। বাংলা নাম— ভাট তিত্তির।

আকারে এগুলি পায়রার চেয়ে ছোটো, গায়ের রঙ হলদেটে বাদামী, লেজ তীক্ষ্ণাগ্র, বুকের তলা বেষ্টন করে একটি কালো দাগ আছে এবং পেটের দিকের রঙ কালচে বাদামী। স্ত্রী পাখিদের ঠোঁটের তলায় চিবুকটুকু বাদ দিয়ে সারা দেহেই আছে বিচিত্র

ফোঁটা আর ডোরা দাগ এবং তা ছাড়াও বুকের তলায় কালো দাগটি আছে। উড়ন্ত অবস্থায় এদের তীক্ষ্ণাগ্র ডানা আর লেজ দেখে এবং দ্বিস্বরবিশিষ্ট ডাকটি শুনেই চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। শুষ্ক কর্ষিত ক্ষেত্রে একসঙ্গে এক ডজনেরও বেশি পাখির এক-একটি ঝাঁক ঘুরে বেড়ায় কিন্তু ওদের গায়ের রঙ আশেপাশের মাটির রঙে এমনভাবে মিশে যায় যে স্থিরভাবে বসে থাকলে ওদের দেখতে পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। জলাশয় বহুদূরে অবস্থিত হলেও ওরা প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় ঠিক একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি বিশেষ জলাশয়ে দলবদ্ধভাবে জলপান করতে আসবেই। এই জলপান করতে আসা এবং ফেরার পথেই ওরা শিকারীদের বন্দুকের লক্ষ্যস্থল হয়। এই পাখিরা উড়তে পারে বেশ জোরে আর ওড়ার সময় ওরা যে দ্বিস্বরবিশিষ্ট ডাকটি ডাকে সেটি শুনতে লাগে কুৎ-রো, কুৎ-রো— এই ধরনের। মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁক বেঁধে যখন ওরা উড়ে যায় তখন শুধু ঐ ডাকটি শুনেই ওদের চিনে ফেলা সম্ভব। ঘাস এবং বুনো গাছপালার বীজ, শস্যের দানা, ডাঁটা জাতীয় উদ্ভিদ এই-সবই ওদের খাদ্য, তবে ঐগুলির সঙ্গে প্রচুর নুড়ি পাথরও ওরা গিলে ফেলে। একেবারে খোলা মাটির ওপর আর নয়তো সামান্য গর্ত করে তার মধ্যে ওরা ডিম পেড়ে রাখে। সাধারণত ওরা এক-একবারে ৩টি করে ডিম দেয়, ডিমের রঙ ফিকে ধূসর বা হলদে পাথরের মতো, তাতে প্রচুর বাদামী রঙের ছিটও থাকে। এদের বাচ্চারা ডিম ফুটে বেরিয়েই তৎক্ষণাৎ ছুটোছুটি শুরু করে দেয়, বাচ্চাদের গায়ের রঙও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিশে গিয়ে ওদের অনেকটা নিরাপদে রাখে। পুরুষ পাখি যখন জলপান করতে যায় তখন

নিজের পেটের কাছের পালকগুলি বেশ ভালো করে ভিজিয়ে নিয়ে আসে, ওদের বাচ্চারা সেই ভিজে পালক চুষে তৃষ্ণা মেটায়।

হাঁস আর বালিহাঁস বা টিলদের মধ্যে যেমন আসলে কোনোই প্রভেদ নেই ঠিক তেমনিই পায়রা আর ঘুঘুরাও আসলে একই জাতের পাখি। পায়রাদের মধ্যে একদল সম্পূর্ণভাবে ফলাহারী। সবুজ পায়রা বা হরিয়াল্‌রা এই দলেরই অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় উপমহাদেশে এদের বহু প্রজাতি আছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় **'কমন গ্রীন পিজিয়ন্‌'** (Treron phoenicoptera) বা সাধারণ সবুজ পায়রা অর্থাৎ হরিয়ালদের। চিত্র নং— 44 ;

এই হরিয়ালরা বেশ গাঁট্টাগোট্টা মজবুত গড়নের পাখি, আকারে গৃহপালিত নীল পায়রাদের প্রায় সমান, গায়ের রঙ হলুদ, জলপাই বা অলিভ সবুজ এবং ছাই রঙা ধূসরের মিশ্রণ, ডানায় ঘাড়ের কাছে ফিকে গোলাপির ছোপও আছে তবে স্ত্রী হরিয়ালদের এই গোলাপি ছোপটি তেমন স্পষ্ট নয়, তা ছাড়া কালচে রঙের ডানা বেষ্টন করে একটি হলদে দাগও আছে। এদের পায়ের রঙ হলদে (লাল নয়), এবং এইখানেই ভারতীয় সবুজ পায়রাদের অন্য প্রজাতিগুলির সঙ্গে এদের প্রধান পার্থক্য। বনে জঙ্গলে এবং গ্রাম বা নগরের আশেপাশে ফলের বাগানে এই জাতের হরিয়ালদের ঝাঁক দেখা যায়। পাকাফলের লোভেই ওরা লোকালয়ের অত কাছে আসে। এরা সর্বদাই থাকে দলবদ্ধভাবে এবং গাছের ডালে ডালে, মাটিতে নামতে ওদের খুব কমই দেখা যায়। ফলে-ভরা ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে এই পাখিরা বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে ফল আহরণ করে, অনেক সময় দেখা যায় নাগালের বাইরের একটা বট বা অশ্বত্থের ফল খাবার জন্য, দুই পায়ে গাছের ডাল

আঁকড়ে ধরে সমস্ত শরীরটা ঝুলিয়ে দিয়ে ওরা বহু কসরৎ করে ফলটা ধরবার চেষ্টা করছে। এতটুকু সন্দেহজনক আওয়াজ পেলেই ওরা গাছের ডালে একেবারে নিশ্চল হয়ে যায়, আকারে বেশ বড়োসড়ো হলেও ওদের পালকের সবুজ রঙ গাছের পাতার সঙ্গে এমন বেমালুম মিশে যায় যে স্থির হয়ে বসে থাকলে এই হরিয়ালদের ধরে কার সাধ্য, একটু-আধটু নড়াচড়ার আওয়াজ হলে তবেই বোঝা যায় কোথায় ওরা লুকিয়ে আছে। হঠাৎ একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনে ফলে ভরা বটগাছ থেকে যখন হরিয়ালের ঝাঁক হঠাৎ ডানা ঝাপটে উড়তে শুরু করে তখন ওদের বিপুল সংখ্যা দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সারাদিন ধরে ওরা ফল খায় আর মাঝে মাঝে গাছের একেবারে মগডালে বসে বিশ্রাম নেয়। খুব ভোরে আর সূর্যাস্তের সময় নিয়মিতভাবে দেখা যায় এই হরিয়ালরা পত্রবিহীন গাছের মাথায় পালক ফুলিয়ে বসে বসে রোদ পোহাচ্ছে। এরা ওড়ে সোজা এবং তীব্র গতিতে, ওড়ার সময় ডানায় একরকম অদ্ভুত ধাতব শব্দ শোনা যায়। হরিয়ালরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে ফল খেয়েই জীবনধারণ করে, নানা জাতের বুনো ডুমুর জাতীয় ফলই ওদের প্রধান খাদ্য। এই পাখিদের শিস দেওয়ার মতো নরম সুরেলা ডাক ভারি মিষ্টি শোনায়, মানুষের মতো ওদের কণ্ঠস্বর বিভিন্ন পর্দায় ওঠানামা করতে পারে। মাঝারি ধরনের গাছে, পাতার আড়ালে কাঠিকুটি দিয়ে ওরা মাচার মতো বাসা বানায়। পায়রা গোষ্ঠীর অন্যসব প্রজাতিদের মতোই এদেরও ডিমের সংখ্যা 2টি এবং ডিমের রঙ ঝকঝকে সাদা।

ব্লু রক পিজিয়ন (Columba livia) চিত্র নং— 45 :

হিন্দী আর বাংলায় এদের বলে কবুতর।

এই সর্বজন-পরিচিত পাখিগুলির গায়ের রঙ স্লেটের মতো ধূসর, গলায় এবং বুকের ওপরের অংশে নীলচে সবুজ, বেগুনি আর ম্যাজেণ্টার মিশ্রিত আভাস, ডানায় দুটি এবং লেজের ওপর একটি চওড়া কালো রঙের পাড় থাকে। কাক আর চড়াইদের মতো এই কবুতর বা নীল পায়রাদেরও আমরা সব সময়ই বাড়ির আশেপাশে দেখতে পাই। অবশ্য যে বন্য প্রজাতিটি এই গৃহপালিত পায়রাদের পূর্বজ, তাদের বাস পার্বত্য খোলামেলা অঞ্চলে, পাথরের ফাঁকে ফোকরেই তারা থাকে, গভীর অরণ্য ওদের বিশেষ পছন্দ নয়। কিন্তু বেশির ভাগ অঞ্চলেই গৃহপালিত পায়রাদের সঙ্গে এই বন্য প্রজাতির অবাধ মিলন ঘটে এবং প্রচুর বংশবৃদ্ধিও হয়, ফলে বুনো পায়রাদের বন্যত্ব আর বিশেষ নেই, ওরাও আমাদের ঘরের লোক হয়ে গেছে। প্রত্যেকটি ভারতীয় শহরে প্রচুর সংখ্যায় স্থায়ী বাসিন্দা পায়রা আছে। ঘন বসতিপূর্ণ শহর-বাজারের হৈ-হট্টগোলে এই পায়রাদের কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না, ওরা পরম আনন্দে বড়ো বড়ো অট্টালিকার কার্নিসে বা ভিতরে বাসা বেঁধে বসবাস করে। কল-কারখানায়, গুদাম ঘরে, মসজিদ, রেলস্টেশন প্রভৃতি জায়গায় আস্তানা গাড়তে পায়রারা ভালোবাসে এবং এই-সমস্ত জায়গা পায়রার বিষ্ঠায় প্রায়ই অত্যন্ত নোংরা হয়ে থাকে। পুরোনো পরিত্যক্ত জনপদে ভেঙে-পড়া ঘর-বাড়ির মধ্যে, পুরোনো কুয়োর দেওয়ালের ফোকরে, প্রাচীন দুর্গের আনাচে-কানাচে এবং পাথরের ফাঁকে বুনো পায়রারা বাসা বাঁধে।

সেখান থেকে রোজ আহারের সন্ধানে ওরা উড়ে যায় আশে-পাশের সদ্যোরোপিত অথবা সদ্য ফসল-কেটে-নেওয়া কৃষিক্ষেত্রে শস্যের দানা খুঁজতে। ধান, গম, ডাল, চিনেবাদাম সবই ওদের খাদ্য। এদের গভীর সুরে গুটুর্-গু, গুটুর্-গু ডাকটির সঙ্গে সবাই পরিচিত। পুরুষ পাখি তার সঙ্গিনীর সামনে গলা ফুলিয়ে ঐভাবে ডেকে ডেকে ঘুরে বেড়ায়। ওরা বাসা বানায় খড় আর কাঠি-কুটি দিয়ে, এদেরও ডিমের সংখ্যা 2টি এবং ডিমের রঙ পরিষ্কার সাদা।

স্পটেড্ ডোভ্ (Streptopelia chinensis) চিত্র নং— 46 (ওপরের পাখিটি) :

হিন্দী নাম— চিত্রকা ফাখ্তা বা পারকি।

বাংলায় এদের বলে ছিট ঘুঘু।

আকারে এই পাখিগুলি ময়না আর কবুতরের মাঝামাঝি। এই ছোট্ট ছিপছিপে পায়রা জাতীয় পাখিটির গায়ে গোলাপি বাদামী রঙের ওপর সাদা সাদা ফুটকি আছে এবং শরীরের নিচের অংশ ধূসর। ঘাড়ের কাছে কালোর ওপর সাদা ছককাটা, দেখলে মনে হয় যেন একখানি দাবাখেলার ছক। ক্ষেতখামারের আশেপাশে যেখানে জলের অভাব নেই এবং গাছপালাও কিছু কিছু আছে এইরকম জায়গাতে এই ছিট ঘুঘুরা জোড়া বেঁধে অথবা ছোটো ছোটো দল বেঁধে চরে বেড়ায়। মেঠো পথের ধারে এবং ফসল কেটে নেওয়া মাঠেও ওদের দেখা যায়। জ্বালাতন না করলে এই পাখিরা বেশ পোষ মানে, নির্ভয়ে বাগানে ঘুরে বেড়ায়, বাংলোবাড়ির বারান্দায় কড়ি-বরগার ফাঁকে ফাঁকে বাসা বাঁধে,

লোকজনের আনাগোনায় ভ্রূক্ষেপও করে না। এদের ডাকটি শুনতে মধুর, কিন্তু তাতে কেমন একটা করুণ সুরের রেশ আছে, ক্রু-ক্রুক-ক্রুক ক্রু······ক্রু-ক্রু-ক্রু এমনি করে ওরা কেবলই একই সুরে পুনরাবৃত্তি করে চলে, সাধারণত 3 থেকে 6 বার পর্যন্ত। বাড়ির কার্নিসে বা ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে কাঠিকুটি দিয়ে ওরা বাসা বানায় আর 2টি করে সাদা রঙের ডিম পাড়ে।

'রেড টার্ট্‌ল ডাভ্‌' হচ্ছে আর এক জাতের ঘুঘুপাখি, চিত্র নং—46 (নিচের পাখিটি) (**Streptopelia tranquebarica**) :

হিন্দী নাম—মেরোতি ফাখ্‌তা, গিবোই ফাখ্‌তা বা ইটোয়া।

বাংলায় বলে কণ্ঠি ঘুঘু।

স্ত্রী পাখিদের গায়ের রঙ ফিকে বাদামী ধূসর কিন্তু পুরুষ পাখিদের গায়ের রঙ উজ্জ্বল গোলাপি আভাযুক্ত ইঁটের মতো লাল। স্ত্রী পাখিটি দেখতে অনেকটা রিঙডাভ্‌দের ক্ষুদে সংস্করণ। খোলা-মেলা কৃষিক্ষেত্রে এবং শুষ্ক, প্রায় মরুভূমির মতো অঞ্চলে এই পাখিদের অল্প সংখ্যায় দেখা যায়। অন্য জাতের ঘুঘুদের তুলনায় এদের সংখ্যা কম এবং এরা অন্য প্রজাতিদের মতো লোকালয়ের বেশি কাছে থাকতে ভালোও বাসে না। এদের ডাক বেশ কর্কশ, গ্‌্‌-গুর-গু, গ্‌্‌-গুর-গু এইভাবে খুব তাড়াতাড়ি একসঙ্গে কয়েকবার ওরা ডেকে ওঠে। গাছের ডালে, মাটির 3 থেকে 6 মিটার ওপরে কাঠিকুটি দিয়ে ওরা বাসা বানায়। অন্য ঘুঘুদের মতোই এদেরও ডিমের সংখ্যা 2টি এবং রঙ সাদা, ওদের বাসার পাতলা খড়কুটোর আড়াল থেকে ধপধপে সাদা ডিম প্রায়ই দূর থেকে দেখা যায়।

সিট্টাসিফর্মিস্ (Psittaciformes) বর্গের একটি গোষ্ঠীই আছে, সিটাসিডি গোষ্ঠী (Psittacidae)— প্যারট বা টিয়াপাখিরা এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। এই পাখিদের বিশেষত্ব হচ্ছে ছোটো, মজবুত এবং বাঁকানো ঠোঁট আর বেঁটে অথচ গাছে চড়ার উপযুক্ত পা। গাছের ডাল আঁকড়ে ধরার জন্য এদের পায়ের ছুটি আঙুল সামনের দিকে এবং ছুটি আঙুল পিছনের দিকে ছড়ানো। এই জাতের সব পাখিরই পালক স্থন্দর সবুজ রঙের। ক্ষেতের ফসল এবং বাগানের ফল নষ্ট করতে এদের জুড়ি নেই, অবশ্য কিছু উপকারও এরা করে এটা ঠিক। আমাদের দেশে যে প্রজাতিটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায় সেটির নাম রোজ রিংড্ প্যারাকিট (Psittacula krameri) চিত্র নং— 47 :

হিন্দী নাম— তোতা বা লিবার তোতা।

বাংলায় বলা হয় টিয়াপাখি।

আকারে এরা ময়নার চেয়ে সামান্য বড়ো এবং লেজটি লম্বা ও তীক্ষাগ্র, দেহ ঘাস-রঙা সবুজ। ছোটো মজবুত এবং গভীর ভাবে বাঁকানো লাল টুকটুকে ঠোঁট আর গলার কাছে কালো ও গোলাপি রঙের একটি বেষ্টনী এই হচ্ছে এদের বৈশিষ্ট্য। স্ত্রী টিয়াদের গলায় শুধু বেষ্টনীটি থাকে না, তা ছাড়া আর-সব পুরুষ টিয়াদের মতোই। কাক, চড়াই, ময়না, পায়রা প্রভৃতির মতো এই গোলাপি কণ্ঠীপরা টিয়াও আমাদের খুবই স্থপরিচিত পাখি। গ্রামের কৃষিক্ষেত্রে এবং নগরেও যেখানে খাবার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানেই এই টিয়াদের বিরাট ঝাঁক দেখা যায়, চাষী আর ফল-বাগানের মালিকরা এদের উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত থাকে, কারণ এরা ফল আর শস্য যত না খায় তার চেয়ে বেশি নষ্ট করে আঁচড়ে

কামড়ে। ট্রেনে যেতে যেতে প্রায়ই চোখে পড়ে কোনো কোনো স্টেশনে শস্য, চিনেবাদাম ইত্যাদির বস্তা স্তূপীকৃতভাবে রাখা রয়েছে চালান যাবার জন্য, আর টিয়ার ঝাঁক পরমানন্দে ঠুকরে ঠুকরে চটের বস্তা ছিঁড়ে তার ভিতরের জিনিস সাবাড় করেছে। ঘন বসতিপূর্ণ শহর-বাজারের কাছাকাছি বড়ো বড়ো গাছে টিয়ারা দলবেঁধে বাস করে, প্রতি সন্ধ্যায় দেখা যায়, সারাদিন ধরে আশেপাশের ক্ষেতখামার লুটপাট করে খেয়ে ঝাঁকের পর ঝাঁক টিয়া বহু দূর থেকে নিজেদের আস্তানায় ফিরে আসছে। টিয়াদের তীক্ষ্নস্বরের কিয়াক্-কিয়াক্ ডাকটি সব সময়ই শোনা যায়, উড়বার সময়ও ডাকে, আবার চুপ করে বসে বসেও ডাকে ওরা। এই প্রজাতিটি এবং এর চেয়ে বড়ো জাতের, যেগুলিকে রায়-তোতা বা হীরামন্ তোতা বলা হয়, এই দুই জাতের টিয়াই লোকে শখ করে খাঁচায় পোষে এবং কথা বলতে শেখায়। শেখালে এরা কিছু কিছু বুলি অস্পষ্টভাবে বলতে পারে। তা ছাড়া বন্দুকে বারুদ ভরে খেলনার বন্দুক, কামান ছোঁড়া প্রভৃতি নানারকম খেলাও টিয়াপাখিদের শেখানো হয়ে থাকে। টিয়াপাখিরা সাধারণত এক-একবারে 4 থেকে 6টি ডিম দেয়, ডিমগুলি সাদা ও গোল ধরনের, সাধারণত কাঠঠোকরাদের তৈরি ফোকরের মধ্যে বা পোড়ো বাড়ির দেওয়াল বা পাথরের ফাঁকফোকরে ওরা ডিম পেড়ে রাখে, বেশ কয়েক জোড়া টিয়া একসঙ্গে একই জায়গায় ঘর বাঁধে।

বড়ো ভারতীয় টিয়া বা **আলেকজাণ্ড্রাইন প্যারাকিট**-দের (Psittacula cupatria) বৃহৎ আকার এবং বড়ো ঠোঁট দেখেই চেনা যায়, তা ছাড়া এই জাতের পুরুষ পাখির ঘাড়ের কাছে কালচে লাল রঙের ছোপ থাকে। স্ত্রী পাখির কিন্তু ঐ কালচে

লাল ছোপ বা গলা বেষ্টন করে গোলাপি কালো দাগ এ-সব কিছুই থাকে না। এই পাখিগুলি লোকালয়ের চেয়ে বনজঙ্গলই বেশি পছন্দ করে। পাখি বেচাকেনার বাজারে এই দুই জাতের টিয়ার বাচ্চাই প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়।

কুকুলিফর্মিস্ (Cuculiformes) বর্গের মধ্যে কোকিল জাতীয় পাখিরা পড়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তেই এদের দেখা যায়। পুরোনো দুনিয়ার প্রজাতিদের মধ্যে অনেকগুলোর কুখ্যাতি আছে যে ওরা পরগাছার মতো পরের বাসায় মানুষ হয়। ওরা চুপচাপ অন্য পাখির বাসায় গিয়ে ডিম পেড়ে আসে, ফলে ওদের ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটানোর দায়িত্ব বহন করে অন্য পাখিরা। এই পরজীবী কোকিলের সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ হচ্ছে, ইউরোপীয় কাক্কু (Cuculus canorus)। কাশ্মীর এবং পশ্চিম হিমালয়ের কোনো কোনো অঞ্চলে এদের দেখা যায়, তা ছাড়া এদের একটি দল আসামের বাসিন্দা। তবে এই উপমহাদেশে সবচেয়ে পরিচিত হচ্ছে **কোয়েল** (Eudynamys scolopacea) চিত্র নং—48 :

হিন্দীতেও এদের নাম কোয়েল, বাংলাতে কোকিল।

এগুলি আকারে প্রায় কাকের সমান, তবে আরো পাতলা গড়নের আর পুচ্ছটিও কাকের চেয়ে বড়ো। পুরুষ কোকিলের দেহটি ঝকঝকে উজ্জ্বল কালো, হলদেটে সবুজ ঠোঁট এবং চোখ দুটি রক্তের মতো লাল। স্ত্রী কোকিলের দেহের রঙ বাদামী, তার ওপর সাদা ছিট ছিট দাগ আছে। কোকিলরা আমাদের আশেপাশেই বাগানে গাছপালার মধ্যে থাকলেও ওদের কণ্ঠস্বরই আমাদের বেশি পরিচিত, কোকিলকে চাক্ষুষ দেখার সুযোগ খুব

বেশি হয় না। এরা সমস্তক্ষণই থাকে গাছের ডালে, মাটিতে নামেই না। শীতকালে ওদের কণ্ঠ থাকে নীরব, তাই অনেকেই ভুল করে ভাবেন ওরা বুঝি শীতকালে এদেশ ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু গ্রীষ্মের আবির্ভাবের সূচনাতেই ওদেরও প্রজনন ঋতু শুরু হয়ে যায়, তখন কণ্ঠস্বর ফিরে পেয়েই ওরা ডাকাডাকি আরম্ভ করে দেয়। প্রখর গ্রীষ্মে সারাদিন, এমন-কি রাত্রেও বহুক্ষণ ধরে পুরুষ কোকিলের ক্রমোচ্চ কুহুধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়ে থাকে। ওদের প্রথম ডাকটি শুরু হয় বেশ নীচু পর্দায়— তারপর পর্দায় পর্দায় সুর চড়তে থাকে, শেষপর্যন্ত সপ্তম বা অষ্টমবারে কণ্ঠস্বর একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছে তারপর আচমকা থেমে যায়। একটু পরেই আবার শুরু হয় কুউ, কুউ করে ডাক, আবার ঠিক ঐ রকম ধাপে ধাপে সুর চড়িয়ে হঠাৎ থেমে যাওয়া, সারাদিন এই চলতে থাকে। কোকিলের কুহুধ্বনি নিয়ে কবিরা বিশেষত হিন্দী কাব্যে অনেক বাড়াবাড়ি করেছেন, অবশ্য অল্পস্বল্প কুহুধ্বনি শুনতে মন্দ লাগে না, কিন্তু ওরা যেভাবে সারাদিন তারস্বরে ডাকাডাকি করে তা অনেক সময় সত্যিই অসহ্য হয়ে ওঠে, তাই কেউ কেউ কোকিলকেই ভুল করে মাথা ধরানো পাখি বা ব্রেন ফীভার বার্ড বলে থাকেন, আসলে কিন্তু হক্ কুকু (Hawk Cuckoo) বা পাপিয়াকেই ব্রেন ফীভার বার্ড বলা হয়। স্ত্রী কোকিল গাইতে পারে না। গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে বেড়াবার সময় স্ত্রী কোকিলের কণ্ঠে শোনা যায় কিক্-কিক্ করে একটা তীক্ষ্ণ ডাক। এদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে বটফল এবং ডুমুর ও কুলজাতীয় অন্য ফল আর শুঁয়োপোকা। সাধারণ কাক ও দাঁড়কাকেরা যখন বাসা বাঁধে, এই কোকিলরাও ডিম পাড়ে সেই

সময়েই, কারণ ঐ কাকেদের বাসাতেই এরা ডিম পেড়ে রাখে। সব জাতের পরজীবী কুকুদের মতোই এই কোকিলরাও নিজেরা কোনো বাসা বানায় না, এদের ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটানোর কাজটা কাকেরাই করে দেয়, এদের বাচ্চারা বড়োও হয় ঐ পরের ঘরেই। এরা সব কটি ডিম একই কাকের বাসায় রাখে না, বিভিন্ন বাসায় ভাগাভাগি করে রাখে, ডিমগুলির রঙ বাদামী সবুজ তাতে লালচে বাদামী ছিট থাকে, ডিমগুলি দেখতে অনেকটা কাকের ডিমের মতোই শুধু আকারে কিছুটা ছোটো।

যে-সব কুকুরা পরজীবী নয়, নিজেরা বাসা বাঁধে ও বাচ্চা প্রতিপালন করে তাদের উদাহরণ হিসাবে নাম করা যেতে পারে **ক্রো ফেজাণ্ট** বা **কুকাল**-দের (Centropus sinensis) চিত্র নং— 49 :

হিন্দীতে এদের বলে মাহোকা বা কুকা।

বাংলা নাম— কুকা বা কুকো।

এগুলি আকারে দাঁড়কাকের সমান। এরা খুব চটপটে নয় বটে কিন্তু বেশ চোখে পড়ার মতো রঙের বাহার আছে এদের, উজ্জ্বল চক্‌চকে কালো দেহে বাদামী রঙের ডানা আর দীর্ঘ কালো ঝুলে পড়া পুচ্ছ দেখতে সুন্দর। আগাছাময় প্রান্তর, উঁচু ঘাসের জঙ্গল, চাষের জমি, একটু-আধটু গাছপালা— এই-সবই এই পাখিদের পছন্দ। লোকালয়ের কাছে, বাড়ির বাগানেও এদের প্রায়ই দেখা যায়। এই প্রজাতিটি মাটির ওপর ঘোরাঘুরি করতেই ভালোবাসে, ঝোপের তলায় তলায় ঘুরে ওরা যখন খাবার খোঁজে তখন দীর্ঘ পুচ্ছটি প্রায় মাটি ছুঁয়েই থাকে, কীট-পতঙ্গকে তাড়া দেবার জন্ম প্রায়ই ওরা ঘুরতে ঘুরতে জোরে ডানা ঝাপটা

দেয়। খাবার খোঁজার তাগিদে ওরা ঝোপের মাথায়ও ওঠে এবং বেশ দক্ষতার সঙ্গে গাছের ডালে ডালেও লাফিয়ে বেড়ায়। এই পাখিরা বেশ গভীর সুরেলা কণ্ঠে ধীরে ধীরে উক-উক্ করে ডাকে এবং নিয়মিত বিরতির পর আবার ডাকটির পুনরাবৃত্তি করে, গরমের দিনে বহুদূর থেকেও ওদের ডাক শোনা যায়। অবশ্য আর-একটা অন্যরকম ডাকও এদের কণ্ঠে শোনা যায়। মাঝে মাঝে খুব দ্রুত সংগীতের ঝংকারের মতো কুপ্-কুপ্-কুপ্-কুপ করে 6/7 বার, এমন-কি কখনো কখনো 20 বার পর্যন্ত ওরা ডেকে ওঠে, প্রতি সেকেণ্ডে 2/3টি করে কুপ্ উচ্চারিত হয়। একটি পাখি এইরকম ডাক শুরু করলেই দেখতে দেখতে দূর থেকে আর-একটি পাখি সাড়া দিয়ে ওঠে এবং তারপর দ্বৈতকণ্ঠে এ সংগীত চলতে থাকে। এ ছাড়াও আরো নানারকম অদ্ভুত আওয়াজ এই পাখিটির গলায় শোনা যায়। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ পাখিটি তার সঙ্গিনীর সামনে নানারকম কায়দায় কসরৎ দেখাতে থাকে, পিঠের কাছে পুচ্ছটি তুলে নানা ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এবং ডানা দুটি দুপাশে ঝুলিয়ে রাশভারী চালে পায়চারি করে প্রেমিকার মনোহরণ করবার চেষ্টা করে। ওড়ার ব্যাপারে এরা বিশেষ পটু নয় এবং বেশিদূর উড়তেও পারে না। ফড়িং ও অন্যান্য পতঙ্গ, শুঁয়োপোকা, ইঁদুর, গিরগিটি, ছোটো ছোটো সাপ প্রভৃতি এদের খাদ্য। এই পাখিরা অন্য ছোটো পাখিদের শত্রু, এরা মাটিতে ও ঝোপের মধ্যে ছোটো ছোটো পাখির বাসা খুঁজে বার করে তাদের ডিম আর বাচ্চা খেয়ে ফেলে। হাতুড়ে বদ্যিদের কাছে এই কুকালের মাংসের খুব আদর কারণ এতে নাকি অনেক রকম বুকের আর শ্বাসযন্ত্রের ব্যাধি সারে।

কোকিলদের জাতভাই হলেও এরা পরজীবী নয়, নিজেরা বাসা বাঁধে ও শাবকদের প্রতিপালন করে। পাতা আর কাঠিকুটি দিয়ে মস্তবড়ো গোলাকৃতি বাসা বানায় এরা, তাতে প্রবেশপথ থাকে পাশের দিকে। কাঁটা গাছের বেশ নিচের দিকের ডালেই সাধারণত ওদের বাসা দেখা যায়। এদের ডিমের সংখ্যা 3/4টি, ডিমের রঙ সাদা তবে খড়ির গুঁড়োর মতো একটা আস্তরণ থাকে।

স্ট্রিগিফর্মিস (Strigiformes) বর্গের অর্থাৎ পেঁচাদের প্রতিনিধিত্ব করে দুটি গোষ্ঠী, টাইটোনিডি (Tytonidae) (বার্ন আউল), আর স্ট্রিগিডি (Strigidae) (ট্রু আউল)। প্রথমটির বিশেষত্ব হচ্ছে বাঁদরের মতো মুখের ছাঁদ, আমাদের পরিচিত বার্ন পেঁচাদের (Tyto alba) মুখ এই ধরনের. পৃথিবীর প্রায় সব অঞ্চলেই এই ধরনের পেঁচা দেখা যায়। প্রকৃত পেঁচাদের মাথা প্রকাণ্ড ও গোল আর চোখ দুটিও খুব বড়ো গোল এবং ড্যাবা ড্যাবা। এদের কোনো কোনো প্রজাতির আবার চোখের ওপর পালকের উঁচু শিং-এর মতো থাকে। আমাদের অতি পরিচিত একটি প্রজাতির নাম হচ্ছে **স্পটেড আউলেট** (Athene brama) চিত্র নং— 50 :

হিন্দী নাম— খুসাট্টিয়া বা চুগদ্

বাংলায়— খুরলে পেঁচা।

এই পেঁচাগুলি আকারে ময়নাপাখির মতোই, কিন্তু আরো মোটাসোটা। এরা বেশ বেঁটে, ছোটোখাটো বাদামী রঙের ওপর সাদা ছিটদার পেঁচা, মাথাটি বড়ো ও গোল আর ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখদুটিতে কখনো পলক পড়ে না। পর্বতের সানুদেশে এবং খোলামেলা সমতল ভূমিতে এদের দেখা পাওয়া যায়, লোকালয়ের

মধ্যেও ঘোরাঘুরি করতে এরা কিছুমাত্র ভয় পায় না। সাধারণত প্রাচীন বট্‌গাছ বা আম জাতীয় বড়ো গাছের কোটরে ওরা বাস করে একজোড়া, দুজোড়া করে, গাছের গুঁড়িতে কেউ ধাক্কা দিলেই কোটরের মধ্যে থেকে মুখটি বাড়িয়ে দেখে। অনেক সময় ওরা উঁচু ডালে নিরিবিলিতে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চুপ করে বসে থাকে, গাছের গুঁড়ির কাছে কোনো আওয়াজ শুনলেই তৎক্ষণাৎ উড়ে যায় আর-এক ডালে, সেখান থেকে গোল গোল অপলক চোখ মেলে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে আগন্তুককে। এরা নিশাচর পাখি, সারাদিন লুকিয়েই থাকে, গোধূলির আবছা আলো-আঁধারিতে কোটর ছেড়ে বার হয়। সন্ধ্যার আবছা আলোয় অনেক সময় দেখা যায় কোনো উঁচু খোঁটা বা টেলিগ্রাফের তারের ওপর বসে পেঁচা মাটিতে চরে বেড়ানো ফড়িং পতঙ্গ ইত্যাদির দিকে নজর রাখছে এবং মাঝে মাঝে লাফিয়ে গিয়ে শিকার ধরছে। বৃষ্টিভেজা মাটি থেকে যখন ডানা-গজানো উইপোকারা আকাশে ওঠে বা রাস্তার আলোর চারপাশে যখন পতঙ্গ উড়ে বেড়ায় তখন ওদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে পেঁচা নখে গেঁথে ওদের ধরে, তারপর কোনো উঁচু জায়গায় বসে নখ আর ঠোঁটের সাহায্যে শিকারকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় অনেকটা টিয়াপাখির ভঙ্গিতে। কখনো কখনো ওরা শ্যেনপাখির মতো শিকারের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কীটপতঙ্গই এই পেঁচাদের প্রধান খাদ্য, তবে গিরগিটি, ছোটো ইঁদুর এবং পাখিও ওরা খায়। এই ছোটো পেঁচারা বেশ ডাকাডাকি করে, নানারকম কর্কশ আওয়াজ শোনা যায় ওদের কণ্ঠে এবং একজোড়া পেঁচা প্রায়ই পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডাকতে থাকে। এদেব ডিমের সংখ্যা 3/4টি, রঙ সাদা, আকার ডিম্বাকৃতি গোল। পুরোনো বাড়ির

কোটরে একটু-আধটু ঘাস আর পালক বিছিয়ে তার মধ্যে ওরা ডিম পাড়ে।

অন্য যে পেঁচা আমরা সচরাচর দেখতে পাই সেটির নাম **গ্রেট হর্নড্ আউল** (Bubo bubo) চিত্র নং— 51 :

হিন্দী নাম— ঘুঘু

বাংলায়— ভুতুম পেঁচা।

এগুলি আকারে প্রায় পারিয়া চিলদের সমান কিন্তু আরো শক্তপোক্ত গড়নের পাখি। এই বিশালকায় পেঁচাদের গায়ের রঙ গাঢ় বাদামী, তার ওপর কালো হলদে ছোপ ছোপ দাগ। তা ছাড়া এদের আর-একটি প্রধান বিশেষত্ব মাথার ওপরে কানের পাশে উঁচু ঝুঁটি বা কাল্চে রঙের দুটি 'শিং'। ব্রাউন ফিশ্-আউলদের (Bubo zeylonicus) সঙ্গে এদের গুলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা আছে, তবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই পেঁচারা বাদামী ফিশ আউলদের মতো অতটা লালচে রঙের নয়, এদের গায়ের রঙ প্রধানত হলদে বাদামী। এই পাখিগুলি দিনের বেলা কোনো ঝোপের তলায় বা নদী অথবা গভীর খাদের পাশে কোনো পাথরের খাঁজে বসে বিশ্রাম করে। কিন্তু ফিশ আউলদের মতো এরা সম্পূর্ণভাবে নিশাচর নয়, দিনের বেলাও প্রায়ই ওদের ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। তবে সাধারণত সূর্যাস্তের সময়ই এরা চারদিক প্রতিধ্বনিত ক'রে এক দীর্ঘ ডাক ডেকে নিভৃত আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে আসে, সে ডাকটি শুনতে লাগে অনেকটা 'বো বোও'— ডাকের দ্বিতীয় অংশটি দীর্ঘায়িত হয় অনেকক্ষণ ধরে। ওরা যে খুব জোরে ডাকে তা নয় কিন্তু ডাকটার মধ্যে একটা অদ্ভুত থমথমে গাম্ভীর্য আছে। বহু দূর থেকেও শোনা যায় ওদের

ডাক। তারপর হয়তো দেখা যায় উঁচু পাথর বা অন্য কোনো উঁচু জায়গায় পেঁচা বসে আছে, একটু পরেই শূন্যে ডানা মেলে ভেসে যাবে শিকারের সন্ধানে। স্বাভাবিক ডাক ছাড়াও বিশেষ উত্তেজনা বা আবেগের মুহূর্তে ওদের কণ্ঠে আরো নানারকম অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যায়। ছোটো ছোটো স্তন্যপায়ী জীব, পাখি, গিরগিটি, ছোটো ছোটো সাপ ইত্যাদি এই শিংওয়ালা পেঁচাদের প্রধান খাদ্য, তবে বড়ো বড়ো পতঙ্গ এবং কখনো মাছ, কাঁকড়া এ-সবও ওরা খেয়ে থাকে। চাষের জমির আশেপাশে ছোটো ইঁদুর এবং বড়ো বড়ো মেঠো ইঁদুরও ওরা যথেষ্ট খায়। এই-সব অপকারী জীবদের খেয়ে ফেলে ওরা কৃষকদের অনেক আর্থিক ক্ষতি থেকে বাঁচায়, কাজেই এই পেঁচাদের সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিত। এরা বাসা বাঁধার কোনো চেষ্টাই করে না, একেবারে মাটির ওপর নয়তো পাথরের খাঁজে বা কোনো খানা খোন্দলে 3/4টি ডিম পেড়ে রাখে। অন্য পেঁচাদের মতোই এদেরও ডিমের আকার ডিম্বাকৃতি গোল এবং রঙ হলদেটে সাদা।

ক্যাপরিমালগিফর্মিস (Caprimulgiformes) বর্গের যে দুটি গোষ্ঠীর পাখি ভারতীয় উপমহাদেশে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাইটজার পাখিরা (ক্যাপরিমালগিডি গোষ্ঠী, Caprimulgidae) নাইটজার বা তথাকথিত 'গোট সাকার'রা প্রধানত নিশাচর পাখি, এদের পালকের রঙ আত্মগোপনের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক, অনেকটা পেঁচাদেরই মতো। এই পাখিদের পা দুটি খুব ছোটো ছোটো আর দুর্বল। অন্ধকারে উড়ন্ত কীট-পতঙ্গ ধরে খেতে হয় বলে এদের মুখের হাঁ খুব বড়ো, তা ছাড়া

হাঁমুখের দুপাশ থেকে শক্ত খোঁচা খোঁচা পালক বেরিয়ে থাকে তাতেও কীট-পতঙ্গ ধরা পড়ে যায় সহজেই। নাইটজারদের কয়েকরকম প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে **ভারতীয় নাইটজার** (Caprimulgus asiaticus) চিত্র নং—52 :

হিন্দীতে এদের বলে— ছিপঁক বা দাব্‌চিরি।

বাংলা নাম— রাতচরা।

এই পাখিগুলি আকারে ময়নার মতো, ধূসর, বাদামী ও লালচে হলুদ নরম পালকে ঢাকা দেহ, তার ওপর কালো কালো ছোপ ছোপ দাগ আছে, এই পাঁচমিশেলী রঙের জন্য এরা খুব সহজেই গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে। এদের ডানার সাদা ছোপগুলি ওড়ার সময় স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। দিনের বেলা ওদের একা একা ঝোপঝাড়ের মধ্যে বসে থাকতে দেখা যায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে ওরা বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে উড়ন্ত পতঙ্গ ধরে খায় এবং মাঝে মাঝে মেঠো পথের ধারে বিশ্রাম নেয়। কীট-পতঙ্গ প্রজাপতি মথ এই-সবই ওদের প্রধান খাদ্য, প্রকাণ্ড বড়ো হাঁ করে উড়ন্ত অবস্থায়ই ঐ-সব পতঙ্গকে ওরা মুখে পুরে ফেলে। নাইটজাবরা একেবারে নিঃশব্দে মথ্ প্রজাপতিদের মতো উড়তে পারে, সবসময় দ্রুত ওড়ে না বটে কিন্তু শিকার ধরবার জন্য বা কোনো বাধাকে অতিক্রম করার জন্য ওরা উড়তে উড়তে বিদ্যুৎগতিতে মোড় ফিরতে পারে, বাঁক নিতে পারে উল্টোদিকে, শূন্যে ঘুরপাক খেতে পারে অথবা অবলীলাক্রমে ভেসে যেতে পারে যে-কোনো দিকে। যখন ওরা পথের পাশে বসে বিশ্রাম নেয়, তখন ধাবমান মোটরের আলো পড়লে ওদের চোখ দুটি ঠিক লাল চুনির মতো জ্বলে ওঠে, গাড়িটি যখন একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়বার উপক্রম

হয় তখনই ওরা চট করে স্থান পরিবর্তন করে সরে বসে। ওদের ডাকটা শুনতে লাগে চাক্-চাক্-চাক্-চাক্‌র্‌র্‌র— ঠিক যেন একটা পাথর বরফের ওপর গড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সন্ধ্যা থেকে শুরু করে সারারাত ধরে ওদের ডাক শোনা যায়, কখনো কোনো টিলার ওপর, কখনো বা কোনো গাছের কাটাগুঁড়ির ওপর বসে ডাকে ওরা। মাঝে মাঝে, বেশ অনেকক্ষণ ধরে শোনা যায় কাছাকাছি ছুটি পাখিতে মিলে ডাকের মধ্যে দিয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তরের পালা চলেছে। প্রজনন ঋতুতে এবং বিশেষ করে চাঁদনীরাতে ওদের ডাকাডাকি বেজায় রকম বেড়ে ওঠে। এরা বাসা বানায় না। ঝোপ-জঙ্গলেব মধ্যে মাটির ওপরেই ডিম পেড়ে রাখে। সাধারণত ওদের ডিমের সংখ্যা 2টি, ডিমগুলি লম্বাটে গড়নের, রঙ ফিকে গোলাপিও হয় আবার গাঢ় গোলাপিও দেখা যায়, তার ওপর লালচে বাদামী বা বেগুনিব ছোপও থাকে।

সুইফ্‌ট বা তালচোঁচ পাখিবা অ্যাপোডিফর্মিস্ বর্গের (Apodiformes) অন্তর্গত, লম্বা ছিপছিপে দেহ, ধনুকের মতো বাঁকানো সরু ডানা এবং তীব্রগতি এদের বিশেষত্ব। যতক্ষণ দিনের আলো থাকে ততক্ষণ এই পাখিরা সমানেই উড়ে বেড়ায়, উড়তে উড়তে ছো মেবে কীটপতঙ্গ পোকা-মাকড় ইত্যাদি ধরে খায়, হাঁ-মুখটিও এদের যথেষ্ট বড়ো। পা ছুটি এদের খুব ছোটো ছোটো এবং পায়ের চারটি আঙুলই সামনের দিকে বাড়ানো, সেইজন্য ওরা সোরালো পাখিদের মতো টেলিগ্রাফের তারে ঝুলতে পারে না, তবে খাড়া অথবা ঢালু জায়গায় ওদের ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ বাঁকা নখের সাহায্যে ওরা ঝুলে থাকতে পারে। অ্যাপোডিডি

(Apodidae) গোষ্ঠীতে আমাদের খুব পরিচিত পাখি **হাউস সুইফ্ট** (Apus affinis), চিত্র নং 53 (নিচের পাখিটি) :

এদের হিন্দী নাম— বাবিলা বা বাতাসি।

বাংলায় এদের বলে তালচোঁচ।

এই পাখিগুলি আকারে চড়াই-এর চেয়েও ছোটো, ধোঁয়াটে কালো রঙের পিঠ, সাদা গলা এবং পশ্চাদ্দেশও সাদা। এদের লেজ ছোটো ও চৌকো গড়নের আর ডানাছুটি বেশ সরু ও লম্বা। এই তালচোঁচ পাখিরা প্রাচীন ছুর্গ, ভাঙা মসজিদ ও বসত-বাড়িতে থাকে, অবশ্য লোকজন বাস করছে এমন বাড়িরও আশেপাশে ওদের দেখা যায়। সারাদিন ধরে ওরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে বেড়ায় এবং ছোটো ছোটো ডানাওয়ালা পতঙ্গ ধরে খায়। ওরা যে বেশ খোস্ মেজাজ, তা ওদের কিচ্‌মিচ্ সুরে ডাকাডাকি শুনেই বোঝা যায়। লম্বা সরলরেখার মতো ডানাছুটির সাহায্যে তালচোঁচ পাখিরা খুব দ্রুত উড়তে পারে। সন্ধ্যার আকাশে প্রায়ই দেখা যায় ওরা এলোমেলোভাবে দলবেঁধে বা নানারকম কায়দায় উড়ছে আর উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি করছে মনের আনন্দে। কাছাকাছি একসঙ্গে অনেক পাখি বাসা বাঁধে, খুব ঘন বসতিপূর্ণ বাজারের মধ্যেও কোনো বাড়ির দেওয়ালের খাঁজে বা ছাদের সিলিঙে অথবা বড়ো খিলানওয়ালা ফটকের খিলানের খাঁজে এই পাখিদের বাসা দেখা যায়। পালক ও খড় দিয়ে গোল বাটির মতো বাসা বানায় এরা তবে তাতে শ্রীছাঁদ বিশেষ থাকে না। ওরা নিজেদের মুখের লালা দিয়ে বাসার খড়, পালক ইত্যাদি জোড়া দেয়। দেওয়াল আর বাসার মাঝখানে একটি লম্বা সরু ফাঁক দিয়েই ওরা বাসায় প্রবেশ করে। এদের ডিমের সংখ্যা 2 থেকে 4টি, রঙ ধপধপে

সাদা। ডিমগুলি লম্বাটে গড়নের। ওদের জ্বালাতন না করলে, একই জায়গায় একসঙ্গে সমস্ত দলটি বছরের পর বছর বাসা বাঁধে।

কোরাসিফর্মিস (Coraciiformes) বর্গের মধ্যে পড়ে অ্যালসিডিনিডি (Alcedinidae) গোষ্ঠীব কিংফিশাররা, মেরোপিডি (Meropidae) গোষ্ঠীর বী-ঈটারবা, কোবাসিডি (Coraciidae) গোষ্ঠীর রোলাররা এবং বুসেরোটিডি (Bucerotidae) গোষ্ঠীর হর্নবিল পাখিরা।

ছোটো নীল কিংফিশার (Alcedo Atthis) চিত্র নং 54 :

হিন্দী নাম— ছোটা কিল্‌কিলা বা শরিফাঁ।

বাংলায় এদের বলে— ফট্‌কা মাছবাঙা।

এই পাখিগুলি চড়াইয়ের চেয়ে একটু বড়ো, সুন্দর নীল আর সবুজে মেশানো রঙেব পিঠ, শরীরেব নিচেব অংশ গাঢ় মরচে ধরা লোহাব মতো লাল, লেজটি ছোটো এবং ঠোঁট লম্বা, সোজা ও সুতীক্ষ্ণ। সাধাবণত নদী, পুকুব বা ডোবার জলে নুয়ে পড়া কোনো গাছেব ডালের ওপব একা একা ওদের বসে থাকতে দেখা যায়। প্রায় জল ছুঁয়ে খুব দ্রুতগতিতে ওপবেও উড়ে বেড়ায় ওবা। প্রস্তর-সমাকীর্ণ সমুদ্রতীবে ক্বচিৎ কখনো ওদের দেখা যায়। জলের ধাবে কোনো নিচু ডালে বসে ওবা সব সময় মাথাটি ওপর-নিচে বা এদিক-ওদিক নাড়াতে থাকে আর সেইসঙ্গেই ছোটো বেঁটে লেজটিতে এক-একটা ঝাঁকানি দিয়ে ক্লিক্ ক'রে একটা চাপা আওয়াজ করে। এইভাবে বসে বসে ওবা সমস্তক্ষণ জলের নীচে তীক্ষ্ণ নজর রেখে দেখতে থাকে কখনো কোনো মাছ বা ব্যাঙাচি ভেসে উঠেছে কি না। শিকার দেখতে পেলেই ওরা ঠোঁট বাগিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুব দেয়, মুহূর্তপরেই দেখা যায়

শিকারকে আড়াআড়িভাবে ঠোঁটে চেপে ধরে আবার ভেসে উঠেছে, তারপর কাছাকাছি কোনো ডালে বসে শিকারকে থেঁৎলে মেরে গিলে ফেলে। এই মাছরাঙা পাখিরা অনেক সময়েই জলের সামান্য ওপরে ডানা মেলে ভেসে বেড়ায় এবং শিকার দেখলেই দর্শনীয়ভাবে ডুব দিয়ে শিকারকে তাড়া করে বিদ্যুৎবেগে। এই সময় ও'দের কণ্ঠে চিঁ-চিঁ—চিঁ-চিঁ ক'রে একটা ডাক শোনা যায়। ছোটো মাছ আর ব্যাঙাচি ছাড়া এরা জলজ কীট-পতঙ্গ ও সে-সবের ডিমও খায়। নদী, পুকুর বা ডোবার তীরে মাটিতে লম্বা সুড়ঙ্গের মতো বাসা বানায় এরা। এই সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য এক মিটার বা তার চেয়ে বেশিও হয়ে থাকে। সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তটি একটু চওড়া একটা কুঠুরীর মতো, তারই মধ্যে ওদের ডিমগুলি সুরক্ষিত থাকে। বাসার ভিতর ওরা কিছু বিছায় না, কিন্তু সাধারণত বাসার মধ্যে ওদের ভুক্তাবশেষ মাছের কাঁটা, কীট-পতঙ্গের দেহের টুকরো-টাকরা ছড়ানো পড়ে থাকে। এক এক বারে 5/7টি ক'রে ডিম পাড়ে, ডিমগুলি ধপধপে সাদা, চকচকে ও গোলচে গড়নের।

আর-এক রকমের ব্লু কিংফিশার বা নীল মাছরাঙা দেখা যায়, এগুলির বুকের সাদা ছোপের জন্য এদের নাম **হোয়াইট ব্রেস্টেড্ কিংফিশার** (Halcyon Smyrnensis)। অন্য মাছরাঙাদের মতো এরা জলের ওপর অতটা নির্ভরশীল নয়। মাটিতে ঘুরে বেড়ায় এমন পোকামাকড়ই এদের প্রধান খাদ্য। আকারে এগুলি ময়না পাখির সমান, পিঠের দিকের রঙ উজ্জ্বল নীল; মাথা, গলা আর শরীরের নিচের অংশ খয়েরি বাদামী, বুকের কাছে কামিজের কলারের মতো সাদা ছোপ আর লম্বা ভারী গড়নের, তীক্ষ্ণ, লাল

ঠোঁট দেখে সহজেই এদের চেনা যায়। কালো ডানার ওপরও বেশ বড়ো সাদা ছোপ আছে, ওড়ার সময় সেগুলি দেখতে পাওয়া যায়।

পাইড্ কিংফিশার (Ceryle rudis) বেশ চোখে পড়বার মতো পাখি। চিত্র নং 55 :

হিন্দী নাম— কোরিয়ালা কিলকিলা বা কারোনা।

বাংলায় বলা হয়— সাদা-কালো মাছরাঙা।

আকারে এই পাখিগুলি ময়না আর পায়রার মাঝামাঝি। এদের পালক সাদা আর কালোয় ফোঁটা কাটা, ডোরা দাগও আছে তাতে। তা ছাড়া মাছরাঙাসুলভ ছোরার মতো ঠোঁট দেখেও চেনা যায় এদের। পুরুষ আর স্ত্রী দুটি পাখিই দেখতে প্রায় একই রকম, শুধু পুরুষ-পাখির গলা সম্পূর্ণ বেষ্টন ক'রে দুটি কালো রঙের দাগ থাকে আর স্ত্রী-পাখির গলায় থাকে একটি মাত্র দাগ, সেটিও মাঝখানে কিছুটা ভাঙা। নদী, ঝিল, পুকুর বা জোয়ারের জল জমে থাকা সরু খাড়িতে জলের ধারে পাথর বা গাছের ডালে বসে এই পাখিরা থেকে থেকে মাথা দোলাচ্ছে আর লেজ নাচাচ্ছে দেখতে পাওয়া যায়। উড়তে উড়তে বেশ উৎফুল্ল সুরে তীক্ষ্ণ গলায় ডাকে চিরাঁক্ চিরাঁক্, এ ডাকটি একবার শুনলে ভোলা সহজ নয়। এই পাইড কিংফিশারদের শিকার ধরবার প্রক্রিয়াটি একটি দর্শনীয় ব্যাপার। জলের ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে ওরা সমস্তক্ষণ নজর রাখে নাগালের মধ্যে কোনো ছোটো মাছ দেখা যাচ্ছে কি না। মাছের দেখা পেলেই ওড়া বন্ধ ক'রে শূন্যে একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, সমস্ত দেহটি খাড়া সোজা রেখে মনে হয় যেন লেজের ওপর ভর দিয়ে

শূন্যে ঝুলছে, এই সময় ওরা পক্ষ সঞ্চালন করে খুব দ্রুতবেগে এবং ঠোঁট একেবারে প্রস্তুত থাকে শিকার ধরবার জন্য। তারপর শিকার একটু নাগালের মধ্যে উঠে এলেই, পক্ষসঞ্চালন বন্ধ ক'রে প্রায় 6 থেকে 8 মিটার ওপর থেকে সোজা ডুব মারে জলের মধ্যে, পরমুহূর্তেই শিকারকে ঠোঁটে চেপে ধরে আবার ভেসে ওঠে এবং গা ঝাড়া দিয়ে পালকের জল ঝেড়ে ফেলে উড়ে গিয়ে বসে কাছাকাছি কোনো উঁচু জায়গায়, মুখের মৃতপ্রায় মাছটিকে সেখানে থেৎলে মেরে তারপর মাথার দিক থেকে গিলে ফেলে। মাছই এই মাছরাঙাদের প্রধান খাদ্য তবে ব্যাঙ, ব্যাঙাচি এবং জলজ কীট-পতঙ্গও ওরা খায়। জলের ধারে লম্বা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে এরা বাসা বানায়। বাসায় কোনো আস্তরণ থাকে না তবে ভুক্তাবশিষ্ট মাছের কাঁটা ছড়ানো থাকে প্রচুর। এদের ডিমের সংখ্যা 5/6টি, রঙ চকচকে সাদা এবং আকৃতি গোল ধরনের।

হিমালয়ান পাইড্ কিংফিশার-রা (Ceryle lugubris) আকারে আরো অনেকটা বড়ো এবং তাদের মাথায় বেশ বড়োসড়ো ঝুঁটিও থাকে। হিমালয়ে,.প্রায় 800 মিটার উচ্চতায়, এই পাখিগুলিকে দেখা যায়।

স্মল গ্রীন বী-ঈটার (Merops Orientalis) চিত্র নং 56 :
হিন্দী নাম— পত্রিঙ্গা।
বাংলায় এদের বলে— বাঁশপাতি।

এই ছিপছিপে রোগা, ঘাসরঙা সবুজ পাখিগুলি আকারে চড়াই পাখির মতো। এদের মাথা আর ঘাড়ে লালচে-বাদামীর ছোপ আছে এবং লেজের মাঝখানের লম্বা পালক দুটির প্রান্ত থেকে

ছুটি লম্বা ভোঁতা কাঁটা বেরিয়েছে। সরু লম্বা এবং অল্প বাঁকানো কালো রঙের ঠোঁট আর গলায় কালো মালার মতো দাগটি দেখেও এদের চেনা সহজ। জোড়ায় জোড়ায়, অথবা একসঙ্গে কয়েকটি পাখিকে উন্মুক্ত প্রান্তরে, আবাদী জমিতে, গ্রামের চারণ-ভূমিতে বা জঙ্গল সাফ-করা ফাঁকা জায়গায় ঘুবতে দেখা যায়। টেলিগ্রাফের তারে, বেড়াব খুঁটিতে অথবা ঝোপেব মাথায় ওরা বসে থাকে, উড়ন্ত কীট-পতঙ্গ দেখতে পেলে ক্ষিপ্র সাবলীল ভঙ্গিতে উড়ে গিয়ে শিকার ধরে তাবপর আবার ফিরে এসে ডানা মেলে বসে পূর্বের জায়গাটিতেই। সেখানে বসে শিকারকে আছড়ে মেরে তারপর গিলে ফেলে। ওড়ার সময় এবা সমস্তক্ষণ টিট্ টিট্ বা ট্রি-ট্রি-ট্রি ক'রে মিষ্টি সুবে ডাকতে থাকে। সূর্যাস্তেব সময় বিরাট দল বেঁধে ওদের আশ্রয় নিতে দেখা যায় ঝাঁকড়া পাতাওয়ালা গাছের ডালে। আশ্রয় নেবাব পরও বহুক্ষণ ধরে ডাকাডাকি চলতেই থাকে, মাঝে মাঝে বিনা কাবণেই ওবা এলোমেলো ঝাঁকে গাছের ডাল ছেড়ে উঠে পড়ে, গাছেব চাবপাশে একটু ঘুরপাক খেয়ে আবার এসে বসে। বেশ কিছুক্ষণ এইবকম চঞ্চলতার পব আস্তে আস্তে ওদের হৈচৈ শান্ত হয়ে আসে, বাত্রির মতো ওরা ঘুমিয়ে পড়ে। এক-একটি ডালে একসঙ্গে অনেকগুলি পাখি ঠাসাঠাসি ক'রে ওরা ঘুমোয়, ঘুমেব সময় পালক ফুলিয়ে মাথাটি ডানার মধ্যে গুঁজে রাখে। অন্য পাখিদের তুলনায় এদের ঘুম ভাঙে বেশ দেরিতে, সূর্য উঠে যাবাব অনেকক্ষণ পরে এবা রাতেব আশ্রয় ছেড়ে আকাশে ওড়ে। ডানাওয়ালা ফড়িং জাতীয় পতঙ্গ এই বাঁশপাতি পাখিদের প্রধান খাদ্য, তবে এবা মাঝে মাঝে মৌমাছির চাকও নষ্ট করে। মাটির খোয়াইয়ে অথবা বড়ো গর্তের

ধারে বালি-মাটির ঢালু জমিতে সুড়ঙ্গের মতো মাটি খুঁড়ে বাসা বানায় এরা, এদের বাসার সুড়ঙ্গ কখনো কখনো একমিটারের চেয়েও লম্বা হয়। সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তটি বেশ বড়োসড়ো একটি কুঠুরীর মতো, তার মধ্যেই ডিম পাড়ে ওরা, কিন্তু কুঠুরীতে কোনো আস্তরণ থাকে না। ডিমের সংখ্যা 5/7টি, আকৃতি গোল এবং রঙ সাদা।

এদেরই আত্মীয় আর-একটি পাখির নাম **ব্লু টেইলড্ বী-ঈটার** (Merops Philippinus) বা **নীলপুচ্ছ** বাঁশপাতি। এগুলি আকারে কিছু বড়ো. এদের চোখে আছে কালো দাগ, গলার রঙ বাদামী এবং লেজ নীল রঙের। এরাও খোলামেলা জায়গায় এবং পুকুর ও ঝিলের কাছে থাকতে ভালোবাসে। এরা বিভিন্ন ঋতুতে স্থান পরিবর্তন করে, কিন্তু এদের স্থান পরিবর্তনের সব কারণ আজও ঠিক বোঝা যায় নি।

কোরাসিডি (Coraciidae) গোষ্ঠীতে আমাদের সুপরিচিত পাখি **ভারতীয় রোলার** বা ব্লু-জে (Coracias benghalensis) চিত্র নং 57 :

হিন্দী নাম— সাব্জাক্ বা নীলকণ্ঠ্।

বাংলায় বলা হয়— নীলকণ্ঠ।

অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের ব্লেজারের মতো ফিকে নীল এবং গাঢ় উজ্জ্বল নীল রঙে মেশানো এই পাখিগুলি আকারে পায়রার মতো, মাথাটি বেশ বড়ো, ভারী ঠোঁট এবং বুকের রঙ লালচে বাদামী। পেট এবং ডানার তলার দিকের রঙ ফিকে নীল। ডানার ওপর-দিকের গাঢ় আর ফিকে নীল রঙ ওড়ার

সময় চমৎকার দেখায়। নীলকণ্ঠ পাখিরা সাধারণত খোলামেলা চাষ-আবাদের জমির আশেপাশেই থাকতে ভালোবাসে, ঘন জঙ্গল ওদের পছন্দ নয়। প্রায়ই দেখা যায় ওরা কাঁটা গাছের গুড়ির ওপর বা টেলিগ্রাফের তারে বসে চতুর্দিকে নজর রাখছে শিকারের খোঁজে। মাটিতে কোনো পোকা-মাকড় দেখতে পেলেই উড়ে গিয়ে ছোঁ মেরে সেটিকে তুলে নিয়ে এসে আবার ওরা উঁচু জায়গাতেই বসে তারপর পোকাটিকে থেঁৎলে মেরে খেয়ে ফেলে। ফড়িং, উচ্চিংড়ে, মৌমাছি-জাতীয় পতঙ্গই এদের প্রধান খাদ্য। এই-সব পোকা ও পতঙ্গ কৃষির যথেষ্ট ক্ষতি করে, কাজেই এদের খেয়ে নীলকণ্ঠ পাখি কৃষকদের পরম উপকার সাধন করে। কখনো কখনো ওরা গিরগিটি, ইঁদুর, ব্যাঙ ইত্যাদিও খেয়ে থাকে। এই রোলার বা নীলকণ্ঠ পাখিরা বেশ উঁচু স্বরে ডাকাডাকি করে, বিশেষ করে শূন্যে উড়ন্ত অবস্থায় যখন ওদের পূর্বরাগের পালা চলে তখনো ডাকাডাকির বিরাম থাকে না। পুরুষ পাখিটি শূন্যে ডিগ্‌বাজী খেয়ে, তীরের মতো বেগে ওঠা-নামা করে ও আরো নানারকম কসরৎ দেখিয়ে সঙ্গিনীর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ স্বরে জোর গলায ডাকতেও শোনা যায় আর ঐ-সব কসরৎ দেখাবার সময় সূর্যা কে ওদের উজ্জ্বল নীল পালকের বাহার বারবার ঝল্‌সে ওঠে সঙ্গিনীর চোখের সামনে। গাছের কোটরে খড়, পালক ও নানারকম আবর্জনার টুকরো দিয়ে ওরা বাসা বানায়। ডিমের সংখ্যা 4/5টি, ডিমের রঙ চকচকে সাদা এবং গড়নটা গোল ধরনের।

এদেরই আর-এক আত্মীয় প্রজাতির নাম কাশ্মীর রোলার (Coracias garrulus), এই প্রজাতিটি কাশ্মীরেই দেখা যায়।

এরা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে সিন্ধু, কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র ও গুজরাটের উত্তর ভাগের ওপর দিয়ে উড়ে আফ্রিকায় চলে যায় প্রতি বছর। এদের ডানার পালকের অর্ধেক অংশ নীল আর অর্ধেক কালো (ছবিতে আলাদা ক'রে ডানার চিত্র দেখানো হয়েছে), পালকের এই বিশেষত্ব দেখেই ওদের চেনা যায়। এদের শরীরের নিচের অংশ বুক থেকে আরম্ভ ক'রে সবটাই ফিকে নীল।

উপুপিডি (Upupidae) গোষ্ঠীর একমাত্র প্রতিনিধি হচ্ছে হুপো পাখি(Upupa epops) চিত্র নং 58 :

হিন্দী নাম— হুদ্‌হুদ্।

বাংলায় এদের নাম— মোহনচূড়া।

এই পাখিটিব চেহারা বেশ চোখে পড়বার মতো, হরিণ শিশুর মতো খয়েরি গায়ের রঙ, আর তার ওপর পিঠে, ডানায় ও লেজে জেব্রার মতো সাদা-কালো ডোরা ডোরা দাগ আছে। মাথার ওপর গোল পাখাব মতো ছড়ানো একটি সুন্দর ঝুঁটি এবং সরু লম্বা বাঁকানো ঠোঁট এদের অপর বিশেষত্ব। আকারে এগুলি প্রায় ময়না পাখির মতো। সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় বা ছোটো ছোটো দলে এদের দেখা যায় মাঠে, বাগানে বা অল্পস্বল্প গাছপালা-ভরা খোলা-মেলা জায়গায়। গ্রাম, নগর ইত্যাদি লোকালয়ের কাছাকাছিই ওবা থাকে। ছোটো ছোটো বেঁটে পায়ে এই পাখিরা অনেকটা বটের পাখিদের মতো ছুটোছুটি ক'রে লম্বা ঠোঁট দিয়ে মাটিতে পড়া ঝরাপাতা ইত্যাদি নেড়েচেড়ে শিকার খোঁজে, শিকার ধরার জন্য ঠোঁটটি তখন কাঁচির মতো ফাঁক করাই থাকে ওদের। মাথা নিচু করে এইভাবে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করার সময় ওদের মাথাও ঝুঁটিটি

সংকুচিত হয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়ে থাকে তখন ওটিকে দেখতে লাগে অনেকটা ছোট্ট গাঁইতি বা কুঠারের মতো। হঠাৎ ভয় পেলে বা উত্তেজিত হলে ঝুঁটিটি আবার পাখার মতো খুলে ছড়িয়ে পড়ে, পাখিটি এলোমেলো লক্ষ্যহীনভাবে খানিক দূর উড়ে গিয়ে আবার কোথাও বসে, তখন মাথার ঝুঁটিটি আবার এক জায়গায় জড়ো হয়ে খাড়া হয়ে ওঠে। বেশ নরম মিষ্টি সুরে হু-পো, হু-পো-পো করে এরা ডাকে, অনেক সময় একটানা মিনিট দশেক ধরে ডাকবার পর খানিকক্ষণের জন্য থামে। প্রায়ই ডাকবার সময় এমনভাবে মাথা নিচু করে থাকে যে ঠোঁটটি একেবাবে সেঁটে যায় বুকেব সঙ্গে। আবার কখনো কখনো প্রতি ডাকেব সঙ্গে এমন ভাবে মাথা উঁচু করে ঝাঁকুনি দেয় যে মাথার ঝুঁটিটি কেবলই খোলে আর বন্ধ হয়। হু-পো ডাক ছাড়াও আবো নানারকম কর্কশ আওয়াজ এরা করে। নানারকম কীট-পতঙ্গ আব ঐ-সব পতঙ্গের ডিম, গুটি প্রভৃতি এদের প্রধান খাদ্য। ফসল নাশকাবী অনেক কীট-পতঙ্গই খেয়ে আমাদের যথেষ্ট উপকারই এরা করে। বাড়ির দেওয়ালে, ছাদে বা কার্নিসের খাঁজে অথবা গাছের কোটরে এরা বাসা বাঁধে এবং বাসার মধ্যে ছেঁড়া ন্যাকড়া, চুল, খড়কুটো ও নানারকম আবর্জনা এনে জমা করে। এদের ডিমের সংখ্যা 5/6টি, প্রথমটা ডিমগুলির [illegible] সাদাই থাকে, কিন্তু তা দিতে দিতে ক্রমশ বেশ ময়লা রঙের হয়ে যায়।

এই বর্গের আর-একটি গোষ্ঠীর পাখি এ দেশে দেখা যায়, সেটি হচ্ছে বুসেরোটিডি (Bucerotidae) গোষ্ঠীর হর্নবিল্স। এই বৃহদাকার পাখিগুলি গাছে থাকতেই ভালোবাসে এবং প্রধানত ফলাহারী। এদের প্রধান বিশেষত্ব বেখাপ্পা বড়ো ঠোঁট।

মালাবার পাইড্ হর্নবিল (Anthracoceros coronatus) এই জাতের একটি সুপরিচিত উদাহরণ। চিত্র নং 59 :

হিন্দী নাম— ধান চিরি।

বাংলায় এদের বলে— ধনেশ পাখি।

সাদা আর কালোয় মেশানো এই পাখিগুলি আকারে পারিয়া চিলদের চেয়েও বড়ো। লম্বা এবং চওড়া কালো রঙের লেজের বাইরের দিকের পালকগুলি সম্পূর্ণ সাদা। হলদে কালো রঙের শিঙার মতো জাঁদরেল ঠোঁটটির ওপরে ছুপাশে চ্যাপ্টা একটি সুচালো শিরস্ত্রাণের মতো আছে, এইটিই ওদের, বড়ো পাইড্ হর্নবিলদের (A. malabaricus) থেকে আলাদা করে চিনবার প্রধান চিহ্ন, তা ছাড়া ঐ বড়ো পাইড্ হর্নবিলদের লেজের বাইরের দিকের পালকগুলিও কালো, শুধু প্রান্তভাগে সামান্য সাদার ছোপ আছে। এদের ঠোঁটের ওপরের শিরস্ত্রাণের মতো জিনিসটির ধারগুলি চ্যাপ্টা নয়, গোল। এই বড়ো ধনেশ পাখিগুলি কুমায়ুন থেকে আসাম পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলেই বেশি দেখা যায়। মালাবারী ধনেশ পাখিদের স্ত্রী-পাখির চোখের চারপাশে খানিকটা অনাবৃত চামড়া থাকে, পুরুষ-পাখিদের এটা থাকে না। সব জাতের ধনেশ পাখিদেরই আচার-ব্যবহার প্রায় একই রকম। ওরা জঙ্গলে বাস করে এবং বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছের ফলই ওদের প্রধান খাদ্য। অবশ্য গিরগিটি, ছোটো পাখি, কাঠবেড়ালী প্রভৃতি জীবও ওরা খেয়ে থাকে। ধনেশ পাখিদের দল সব সময়েই দলনেতাকে অনুসরণ ক'রে এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে বেড়ায়, ওদের ওড়ার গতি খুব সাবলীল নয়, প্রথমে কয়েকবার বেশ জোরে ডানা ঝাপটে তারপর ডানা ছুপাশে উঁচু করে তুলে কিছুদূর হাওয়ায়

ভেসে যায়। বেশ জোর গলায় নানারকম আওয়াজ আর চিৎকার করে এই পাখিরা। এদের বাসা বানাবার কায়দাটিও অদ্ভুত। একটি ভালো দেখে গাছের কোটর বেছে নিয়ে তার মধ্যে স্ত্রী পাখিটি আশ্রয় নেয় আর কোটরের মুখটি দেওয়াল তুলে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, নিজেদের বিষ্ঠাকেই ওরা দেওয়ালের সিমেণ্টের মতো ব্যবহার করে এবং নিজেদের ঠোঁট দিয়েই কর্ণিকের কাজ সারে। এই দেওয়ালে একটিমাত্র ফুটো থাকে, সেই ফুটো দিয়েই পুরুষ-পাখিটি স্ত্রী-পাখিকে খাদ্য সরবরাহ করে এবং স্ত্রী পাখি ভিতরে বসে ডিমে তা দেয়। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলে তারপর দেওয়াল ভেঙে ফেলে স্ত্রী-পাখিটি মুক্তি লাভ করে। এরপর দম্পতি দুজনে মিলে বাচ্চাদের আহার জোগাড়ের কাজে লেগে যায়। এই পাইড্ হর্নবিলরা এই গোষ্ঠীর অন্য পাখিদের মতোই বর্ষার আগে মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যেই সাধারণত বাসা বাঁধে। এদের ডিমের সংখ্যা 2 থেকে 4টি, টাটকা অবস্থায় ডিমগুলির রঙ সাদাই থাকে কিন্তু পরে তা দিতে দিতে ময়লা হয়ে যায়।

পিসিফর্মিস্ (Piciformes) বর্গের মধ্যে পড়ে ক্যাপিটোনিডি (Capitonidae) গোষ্ঠীর বাবেবট ও পিসিডি (Picidae) গোষ্ঠীর উড্‌পেকাররা। সাধারণত বাবেবটদের রঙ বেশ উজ্জ্বল হয়, কিন্তু আকৃতি বেঁটে মোটা, ঠোঁট বেশ বড়ো ও ভারী গড়নের এবং ঠোঁটের চারদিকে শক্ত কাঁটার মতো খোঁচা খোঁচা গোঁফ আছে। এরাও ফলাহারী এবং গাছের ডালেই থাকে। এই গোষ্ঠীতে আমাদের সুপরিচিত পাখি কপারস্মিথ বা ক্রিমসন্ ব্রেস্টেড্

বারবেট (Megalaima haemacephala), আকারে এগুলি চড়াই পাখিদের চেয়ে সামান্য বড়ো কিন্তু আরো মোটা-সোটা। চিত্র নং— 60 :

হিন্দী নাম— ছোটা বসন্তা।

বাংলায় এদের বলা হয় বসন্ত-বৌরি পাখি।

এগুলি বেশ মোটা ঠোঁট বিশিষ্ট ঘাস রঙা সবুজ পাখি, বুকে আর কপালে লালের ছোপ, গলাটি হলুদ রঙের আর শরীরের নিচের অংশে হলুদ রঙের ওপর সবুজ ছোপ ছোপ দাগ আছে। ছোটো লেজটি দেখলে মনে হয় যেন ছেঁটে দেওয়া হয়েছে, ওড়ার সময় লেজটি ত্রিভুজাকৃতি মনে হয়। এই বসন্ত-বৌরি পাখি বনে-জঙ্গলে বা শহরের মাঝখানে সর্বত্রই দেখা যায়। এই পাখিরা প্রধানত ফল খেয়েই জীবন ধারণ করে, কাজেই যেখানে বট. অশ্বত্থ এবং অন্যান্য ডুমুর জাতীয় ফলের গাছ আছে সেখানেই এদের আস্তানা। এই-সব গাছে প্রায়ই দেখা যায় ময়না, বুলবুল, হরিয়াল, ধনেশ প্রভৃতি ফলাহারী পাখিদের সঙ্গে বসন্ত-বৌরি পাখির ঝাঁকও পাকাফলের ভোজে মেতে উঠেছে। মাঝে মাঝে অবশ্য ওরা অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে উড়ন্ত মথ্ প্রজাপতি ও ডানা-গজানো উইপোকাও শূন্য থেকে ধরে খাবার চেষ্টা করে। বৃক্ষশাখা ছেড়ে এই পাখিদের মাটিতে নামতে কখনোই দেখা যায় না। জোর গলায় একঘেয়ে স্বরে টুক্-টুক্-টুক্ ক'রে এরা প্রায় দু-সেকেণ্ড পর পর ডাকতেই থাকে সারাদিন ধরে, সেই একটানা আওয়াজ শুনতে শুনতে মনে হয় যেন অনেক দূরে কোথাও কোনো কামার তার কামারশালায় বসে সারাদিন ধরে ঠুক-ঠুক শব্দে কাজ করে চলেছে। গ্রামাঞ্চলে এই পাখিদের ডাক খুবই সুপরিচিত।
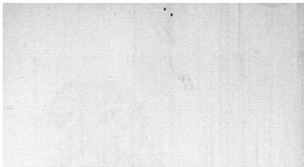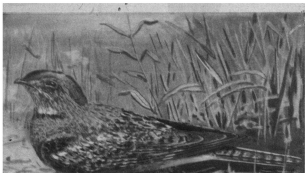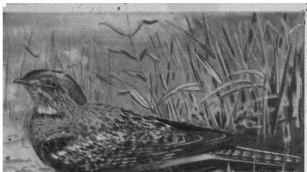
চিত্র 53
তাল চোঁচ
(হাউস স্যুইফট)
(Apus affinis)
দ্রষ্টব্য পৃঃ 132

চিত্র 53
তাল চোঁচ
(হাউস স্যুইফট)
(*Apus affinis*)
দ্রষ্টব্য পৃঃ 132

চিত্র 59
ধনেশ পাখি
(মালাবার পাইড্ হর্নবিল)
(*Anthracoceros coronatus*)
দ্রষ্টব্য পৃঃ 142

ডাকবার সময় ওরা বেশ মজার ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা দোলায়। সজনেগাছ বা ঐ জাতীয় গাছের পচে যাওয়া নরম ডালে গর্ত খুঁড়ে ওরা তার মধ্যে ডিম পাড়ে, মাটি থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতেই থাকে ওদের বাসা, বাসার মধ্যে কোনো রকম আস্তরণ বিছায় না। ডিমের সংখ্যা 3টি, অনুজ্জ্বল সাদা রঙ এবং তাতে কোনো রকম দাগ থাকে না।

আর-এক রকম বারবেট আছে যাদের ডাক প্রায়ই শোনা যায় কিন্তু চোখে বিশেষ দেখা যায় না, কারণ ওদের দেহের সবুজ রঙ গাছপালার রঙের সঙ্গে একেবারে মিশে থাকে। এদের বলা হয় **বড়ো সবুজ বারবেট** (M. zeylanica)। আকারে এগুলি ময়না পাখির মতো, গাঢ় রঙা সবুজ শরীর, মাথা ও গলা বাদামী এবং চোখের চারপাশে কমলা রঙের ছোপ আছে। কুটরু··· কুটরু··· ক'রে ওদের উঁচু গলার ডাক সারাদিনমান অরণ্যের মধ্যে বিরামহীনভাবে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

ভারতীয় উপমহাদেশে উড্পেকার বা কাঠঠোকরাদের যথেষ্ট প্রতিনিধি আছে। এই জাতের পাখিরা অরণ্যের যথেষ্ট উপকার করে, কারণ যে সব পোকা ও পতঙ্গ কাঠের গায়ে ফুটো করে বা ঘুণ ধরায় সেইগুলিই এদের প্রধান খাদ্য। সূচালো ঠোঁট এবং বাঁকানো কাঁটা-ওয়ালা লম্বা জিভের সাহায্যে কাঠঠোকরারা গাছের গুঁড়ি বা ডালের লম্বা ফুটোর মধ্যে থেকে ঐ-সব পোকাদের টেনে বার ক'রে খেয়ে ফেলে। ঠোঁটের সীমানা ছাড়িয়ে এরা জিভটিকে বহুদূর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়—

মারাঠা উড্পেকার (Picoides Mahrattensis) চিত্র নং 61 :

হিন্দী নাম— কাঠ ফোড়া।

বাংলায় বলা হয়— কাঠঠোকরা।

মারাঠা কাঠঠোকরারা আকারে বেশ ছোটো, অনেকটা বুলবুল পাখির মাপের, এদের ঠোঁট লম্বা, শক্ত এবং তীক্ষ্ণ আর লেজটি শক্ত ও নিচের দিকে বাঁকানো। দেহের ওপরের দিকের পালকে এলোমেলোভাবে সাদা কালো ছিট আছে, কপালটি বাদামী হলুদ এবং মাথার ওপর লালের ছোপ। শরীরের নিচের অংশ প্রধানত সাদা তবে বুকে এবং পাশের দিকে সাদার ওপর বাদামী দাগ আর পেটে এবং লেজের নিচে লাল রঙের ছোপ আছে। এই জাতের স্ত্রী-কাঠঠোকরাদের মাথার ওপর লাল ছোপটি থাকে না। পত্রবিরল অগভীর বনে, আম্রকুঞ্জে বা শুষ্ক অঞ্চলে কাঁটাগাছের জঙ্গলে মারাঠা কাঠঠোকরাদের দেখা পাওয়া যায়। সাধারণত এই পাখিরা জোড়ায় জোড়ায় একগাছ থেকে আর-এক গাছের গুঁড়িতে উড়ে বেড়ায়, গুঁড়ি বরাবর একবার নিচের দিকে নেমে আসে আবার এক ঝাঁকানি দিয়ে সোজা ওপর দিকে উঠে যায়, কখনো সোজাই ওঠে, কখনো বা গুঁড়িটিকে বেষ্টন করে ঘুরে ঘুরে ওঠে, আর তারই মধ্যে গাছের গায়ে টোকা মেরে বা ফাঁক-ফোকরে উঁকি মেরে পোকার সন্ধান করে। এই-সব করার সময় বাঁকানো লেজটি গাছের গায়ে চেপে রেখে ওরা দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। পোকা, পোকার ডিম, পিঁপড়ে এই-সব কাঁটাওয়ালা লম্বা জিভ দিয়ে টেনে বার ক'রে ওরা খায়। বেশ তীক্ষ্ণকণ্ঠে ক্লিক্-ক্লিক্-ক্লিক্-র্-র্-র্ ক'রে ডাকে এই কাঠঠোকরারা। সব জাতের কাঠ-ঠোকরাদের মতোই এদেরও ওড়ার গতি বেশ দ্রুত এবং সাবলীল, প্রথম দিকে বেশ কয়েকবার দ্রুত পক্ষসঞ্চালন করে তারপর কিছুক্ষণ

পক্ষসঞ্চালনে বিরতি দেয়। গাছের মাঝামাঝি রকম উচ্চতায় পচা, নরম হয়ে যাওয়া ডালে ঠোঁট দিয়ে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যেই এরা বাসা বানায়। গাছের ডালটি যদি আড়াআড়িভাবে থাকে তা হলে ওরা বাসার প্রবেশপথটি রাখে নিচের দিকে, না হলে বাসায় বৃষ্টির জল ঢোকার ভয় থাকে। বাসার ভিতর কিছুই বিছায় না ওরা। ডিমের সংখ্যা 3টি, ডিমের রঙ চকচকে উজ্জ্বল সাদা এবং গড়নটা গোল।

ভারতে আর-এক জাতের কাঠঠোকরাও যথেষ্ট দেখা যায়, এগুলির নাম গোল্ডেন ব্যাকড্ উড্পেকার বা সোনালি পিঠওয়ালা কাঠঠোকরা (Dinopium benghalense)। এগুলি মারাঠা কাঠ-ঠোকরাদের চেয়ে আকারে বড়ো, পিঠের রঙ উজ্জ্বল সোনালি আর কালো, শরীরের নিচের অংশ হলদেটে সাদা, তাতে কালো দাগও আছে। পুরুষ পাখিদের মাথা এবং মাথার ঝুঁটি সম্পূর্ণ লাল, স্ত্রী পাখিদের ক্ষেত্রে আংশিক লাল। এই কাঠঠোকরাদেরও গ্রামের আশেপাশের বাগানে এবং অগভীর জঙ্গলে দেখা যায়।

ভারতে যত প্রজাতির পাখি দেখা যায় তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পাসেরিফর্মিস্ (Passeriformes) বর্গের অন্তর্গত। চলতি ভাষায় এদের বলা হয় দাঁড়ে ঝোলা পাখি বা গাইয়ে পাখি। যাহোক বহু বিভিন্ন গোষ্ঠীর পাখি এর মধ্যে পড়ে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মাথা, পা বা শরীরের গড়নে কতকগুলি বিশেষত্ব প্রায় সবার মধ্যেই বর্তমান, গলার শ্বাসনালীর যে পেশীর সাহায্যে পাখিরা ডাকতে পারে, সেই পেশীগুলিতেও একই ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে। এই বর্গের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর কিছু সুপরিচিত পাখি নিয়ে এরপর আলোচনা করা হচ্ছে।

পিট্টিডি (Pittidae) গোষ্ঠী— পিত্তা বা তথাকথিত পিপীলিকা থ্রাশ্, এরা উজ্জ্বল রঙের ভূমিচর পাখি, জঙ্গলের তলায় তলায় এরা ঘুরে বেড়ায় আর শক্ত ঠোঁটে ভিজে নরম মাটি খুঁড়ে পোকার সন্ধান করে। বেশ লম্বা মজবুত পায়ে ভর দিয়ে থ্রাশ্ পাখিদের মতো এরা লাফিয়ে বেড়ায়, কচিৎ কখনো তাড়া খেলে কিছুদূর উড়ে যায়। অবশ্য এদের কোনো কোনো প্রজাতি দূর দেশেও উড়ে যায়।

ভারতীয় পিত্তা (Pitta brachyura) চিত্র নং 62 :

হিন্দী নাম— নওরং।

বাংলা নামও— নঁওরং।

ময়না পাখির মাপের এই খাটো লেজবিশিষ্ট পাখিগুলির রঙের বাহার খুব— নীল, সবুজ, হলুদ, কালো, সাদা সব রঙ আছে এদের গায়ে, তার ওপর পেটে আর লেজের তলায় আছে টুকটুকে লালের ছোপ। যখন ওরা ওড়ে তখনই চোখে পড়ে ডানার ওপর একটি ক'রে স্পষ্ট গোল দাগ। নালা বা খোয়াই-এর মধ্যে ঘন আগাছাময় জঙ্গলে এই পাখিদের দেখা পাওয়া যায়। এরা লোকালয়ের কাছেও থাকে আবার লোকালয় থেকে দূরেও থাকে। এই পাখিরা দিনের বেলা মাটিতে ঘুরে বেড়ালেও রাত্রে আশ্রয় নেয় গাছের শাখায়। মাটিতে ওরা শুকনো পাতা সরিয়ে ঠোঁট দিয়ে পোকা খুঁজতে খুঁজতে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, সেইসঙ্গে ছোট্ট বেঁটে লেজটিও ক্রমাগতই নাচতে থাকে। হঠাৎ কোনো কিছু দেখে ভয় পেলে ওরা উড়ে গিয়ে কাছাকাছি গাছের ডালে বসে, আবার ভয়ের বস্তুটি সরে গেলেই মাটিতে নেমে আসে আহারের সন্ধানে।

সাধারণত ভোরের দিকে এবং সন্ধ্যাবেলা এদের উঁচু গলার পরিষ্কার ডাক শোনা যায়— হুইট্-টিউ, তবে মেঘলা দিনে অন্য সময়েও ওদের ডাকতে শোনা যায়। মাটিতে বসে বা গাছের ডাল থেকে ওরা প্রায় 10 সেকেণ্ডে 3-4 বার ঐ রকম দ্বিস্বর-বিশিষ্ট ডাক ডাকে। মাঝে মাঝে একটানা পাঁচ মিনিট ধরেও ওদের ডাক শোনা যায়। ডাকার সময় ওরা খাড়া হয়ে বসে পেছন দিকে মাথা ঝাঁকায় অনেকটা জল পান করার ভঙ্গিতে। প্রায়ই 3/4টি পাখিকে বিভিন্ন দিক থেকে পরস্পরের ডাকে সাড়া দিতে শোনা যায়। কাঠিকুটি, ঘাস, শেকড় ব্যাকড়, শুকনো পাতা প্রভৃতি দিয়ে ওরা গোলাকৃতি বাসা বাঁধে, বাসার পাশের দিকে একটি গোল ফুটো থাকে যাতায়াতের জন্য। নিচু গাছের দুই ডালের মাঝখানে বা ঝোপের তলায় মাটিতে ওদের বাসা দেখা যায়। ডিমের সংখ্যা 4 6টি। ডিমগুলি উজ্জ্বল সাদা রঙের, তাতে ফিকে বেগুনি সরু সরু দাগ ও ছিট থাকে।

অ্যালাউডিডি (Alaudidae) গোষ্ঠী— লার্করা ছোটো ছোটো ভূমিচর পাখি, এদের পালকে বাদামী, ধূসর, বালির মতো রঙ এবং কালো ও সাদার ছোপ ছোপ থাকে, কোনো কোনো প্রজাতির ঝুঁটিও থাকে। খোলা মাঠ, চারণ ভূমি এই-সবই ওদের প্রিয় জায়গা। এদের মধ্যে কোনো কোনো প্রজাতি প্রব্রজনশীল আবার কেউ কেউ এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। এই পাখিদের অনেকে আকাশে ওড়ার সময় খুব মিষ্টি সুরে গান গায়।

ক্রেস্টেড্ বা ঝুঁটিওয়ালা লার্ক (Galerida cristata)। চিত্র নং 63 :

হিন্দী নাম— চন্দুল।

বাংলা নাম— ঝুঁটি ভরত।

এই পাখিগুলি চড়াই-এর চেয়ে সামান্য বড়ো আর এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাথার ওপরের খাড়া ঝুঁটিটি। শরীরের ওপর দিকের রঙ বাদামী ও মেটে ধূসর মেশানো, তাতে কালচে দাগও আছে অনেক। নিচের দিকের রঙ ফ্যাকাশে বালিকণার মতো, তার ওপর বুকের কাছে বাদামী রঙের দাগ। শুষ্ক অঞ্চলে, মাঠের মধ্যে এই পাখিদের জোড়া বেঁধে বা 4-5টি পাখির এক-একটি পরিবারকে চরে বেড়াতে দেখা যায়। নানা জাতের ঘাসের বীজ আর ছোটো ছোটো কীট-পতঙ্গ এদের প্রধান খাদ্য। মাঝে মাঝেই এই পাখিরা কোনো উঁচু ঢিপি বা পাথরের ওপর উঠে মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে গান গায়। খুব মিষ্টি সুরে ওরা ডাকে 'ভীই-উর'। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ-পাখিটি মাটি থেকে অল্প কয়েক মিটার ওপরে অলস ভঙ্গিতে খানিকটা জায়গায় ঘুরে ঘুরে ওড়ে আর গান গায়। তারপর দুপাশে ডানা মেলে, ডানা দুটি অল্প কাঁপাতে কাঁপাতে নেমে এসে বসে কোনো উঁচু পাথর বা ঢিপির ওপর। এদের গান অবশ্য স্কাইলার্কদের মতো অত মধুর নয়। কিন্তু তবু এই চন্দুলদেরও লোকে আদর ক'রেই খাঁচায় পোষে, আর খাঁচায় বন্দী থাকতে এদের বিশেষ কষ্ট হয় বলে মনে হয় না। এরা ঘাস দিয়ে গোল বাটির মতো বাসা বাঁধে আর তার মধ্যে চুল ও আরো নানা জিনিস বিছিয়ে রাখে, সাধারণত কোনো ঘাসঝোপ বা ঢিপির নিচে মাটিতে অগভীর গর্তের মধ্যে ওদের বাসা দেখা যায়। এক-একবারে 3-4টি করে ডিম পাড়ে ওরা, ডিমের রঙ হলদেটে সাদা, তাতে বাদামী ও বেগুনির ছোপও থাকে।

ভারতবর্ষে আরো দুরকম ছোটো মাপের ও বেশি লালচে রঙের লার্ক দেখা যায়। একটির নাম **সাইকেসের ক্রেস্টেড্ লার্ক** (Galerida deva), এদের বুকে সরু সরু কয়েকটি দাগ আছে। অন্যটির নাম **মালাবার ক্রেস্টেড্ লার্ক** (G. Malabarica), এদের বুকের দাগগুলি আরো চওড়া এবং সংখ্যায়ও বেশি।

অ্যাশি ক্রাউন্‌ড অথবা **ব্ল্যাকবেলিড্ ফিঞ্চ লার্ক** অর্থাৎ, ছাইরঙ মাথাওয়ালা অথবা কালোপেটবিশিষ্ট ফিঞ্চ লার্ক (Eremopterix grisea) চিত্র নং— 64 :

হিন্দী নাম— দিওরা, দুরি বা জথৌলি।

বাংলা নাম— মাঠ চড়াই বা ধুল চড়াই।

এগুলি ফিঞ্চের মতো বেঁটে ছোটো পাখি, আকারে চড়াইয়ের চেয়েও ছোটো। পুরুষ পাখির শরীরের ওপরটা বাদামী বালির রঙ, নিচের অংশ কালো। এদের মাথাটি ছাই-ছাই রঙের এবং দুই গণ্ডদেশে সাদা ছোপ আছে। স্ত্রী-পাখির সারা দেহই বাদামী বালির রঙের। খোলামেলা প'ড়ো বা চাষের জমিতে অনেকটা জায়গায় ছড়িয়ে এরা জোড়ায় জোড়ায় বা ছোটো ছোটো দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়, এদের দেহের রঙ মাটির রঙের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে যায় সহজে এদের দেখা যায় না। মাটির ওপর এদিক-ওদিক লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে ওরা ঘাসের বীজ, শস্যের দানা, পোকামাকড় ইত্যাদি খুঁজে খুঁজে খায়। ওড়ার সময় প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ পক্ষসঞ্চালন করে, তারপর খানিকক্ষণ স্থির ভাবে ভেসে বেড়ায়, মাটি ছেড়ে খুব বেশি উঁচুতে ওরা ওঠে না। পুরুষ-পাখির ডাকটি ভারি মিষ্টি— সুরেলা কলকাকলির সঙ্গে টানা মিষ্টি সুরের সংমিশ্রণে শুনতে ভারি ভালো লাগে।

মাটিতে বসেও ডাকে ওরা, আবার শূন্যে উড়ন্ত অবস্থায় নানারকম কসরৎ দেখাবার সময়ও ওদের ডাকতে শোনা যায়। ডানা দুটি কাঁপাতে কাঁপাতে সোজা ওপর দিকে তীরবেগে প্রায় 30 মিটার উঠে গিয়েই আবার ডানা মুড়ে সোজা নিচে নেমে আসে তারপর সেই গতিবেগের সাহায্যেই আবার চট করে ঘুরে ঊর্ধ্ব মুখে উঠতে থাকে, প্রথম কয়েকবার ডানা ঝাপটে তারপর ডানা মুড়ে রেখেই বেশ কয়েক মিটার ওপরে উঠে যায়, পরমুহূর্তেই আবার ঘুরে ঝাঁপ দেয় নিচের দিকে, এইরকম ব্যাপার চলতে থাকে বেশ কয়েকবার, শেষ পর্যন্ত যখন নিচে নামতে গিয়ে মাটিতে আছাড় খাবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন পুরুষ-পাখিটি ক্লান্ত হয়ে এসে বসে কোনো ঝোপ বা পাথরের ওপর। প্রত্যেক বার শূন্য থেকে ঝাঁপ দেবার সময় ওদের কণ্ঠে বেজে ওঠে সেই মিষ্টি সুরেলা ডাক। একটু বিশ্রামের পরই আবার সমস্ত ব্যাপারটির পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে। এত সুন্দর ও সাবলীল ভঙ্গিতে এবং এত উৎসাহের সঙ্গে পুরুষ-পাখি এই কসরৎ দেখাতে থাকে যে, দেখলে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। মাঠের মধ্যে কোনো ঝোপের আড়ালে মাটিতে রেকাবীর মতো অল্প গভীর গর্তে এই ছোট্ট লার্ক পাখিরা বাসা বাঁধে, বাসার মধ্যে ওরা পেতে রাখে ঘাস, চুল, পালক ইত্যাদি এবং বাসার ধারে ধারে সাজিয়ে রাখে নুড়ি-পাথর। এদের ডিমের সংখ্যা 2/3টি, ডিমগুলি ফিকে হলুদ বা ধূসরাভ সাদা এবং তাতে বাদামী ও ল্যাভেণ্ডার রঙের ছোপ থাকে।

হিরানডিনিডি (Hirundinidae) গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে সোয়ালো ও মার্টিন পাখিরা। এই পাখিরা দলবদ্ধ ভাবে বাস

করে এবং তালচোঁচ বা সুইফ্‌টদের মতো শূন্যে ছোঁ-মেরে উড়ন্ত পতঙ্গ ধরে খায়। এদের ডানাও লম্বা এবং সুচালো কিন্তু তালচোঁচদের ডানার চেয়ে চওড়া এবং অতটা ধনুকাকৃতিও নয়। এদের মধ্যে অনেক প্রজাতির লেজটি গভীরভাবে দ্বিধাবিভক্ত। ওড়ার ভঙ্গি এদের সুন্দর ও সাবলীল। এদের অনেক প্রজাতি আমাদের দেশেই ডিম পাড়ে আবার কোনো কোনো প্রজাতি আসে মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি জায়গা থেকে।

এদেশের বাসিন্দা প্রজাতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত রেড্‌ রাম্পড্‌ সোয়ালো (Hirundo daurica) চিত্র নং— 65 :

হিন্দী নাম— মসজিদ্‌ আবাবিল।

বাংলাদেশে এদের বলে— আবাবিল।

এই পাখিরা আকারে চড়াই পাখির মতো, লেজটি এদেব বেশ গভীরভাবে দু ভাগে ভাগ করা, পিঠের রঙ গাঢ় নীলচে কালো, নিচের অংশ হলুদ-মেশানো সাদা, তাতে খুব সরু সরু গাঢ় বাদামী রঙের দাগ আছে। ঘাড়েব দিকে চেস্টনাট্‌ বাদামী রঙের একটি বেষ্টনী এবং পশ্চাদ্দেশেও ঐ রঙের ছোপ আছে, ওড়ার সময় এটি স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। এই দুটি চিহ্ন দেখে এই পাখিদের চেনা সহজ। এই জাতের আবাবিল আমাদের দেশেরই বাসিন্দা কিন্তু আরো বহু জাতের আবাবিল বা সোয়ালো শীতকালে আমাদের দেশে বেড়াতে আসে। এদের প্রায়ই দেখা যায়, হাজার হাজার পাখি পাশাপাশি সার বেঁধে টেলিগ্রাফের তারে বসে আছে। এই যাযাবর সোয়ালোদের দেখলেই দেশী সোয়ালোদের থেকে আলাদা বলে চেনা যায়, কারণ এদের বুকের বাদামী দাগগুলি আরো চওড়া এবং পশ্চাদ্দেশের নীলচে ছোপটির রঙ আরো ফ্যাকাশে।

আবাবিল পাখিরা দিনের মধ্যে বেশ অনেকক্ষণ সময় উড়ে উড়ে শূন্য থেকে ছোঁ মেরে উড়ন্ত পতঙ্গ ধরে খায়, পতঙ্গ ধরবার জন্য মাঝে মাঝে মাটির খুব কাছ পর্যন্তও নেমে আসে। এরা বেশ সামাজিক স্বভাবের পাখি। প্রজনন ঋতু ছাড়া অন্য সময়ে প্রায়ই দেখা যায় ওরা বড়ো বড়ো ঝাঁক বেঁধে তালচোঁচ আর মার্টিনদের সঙ্গে মিলেমিশে শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। রাত্রেও ওরা দলবেঁধে নলখাগড়ার বনে বা ইক্ষুক্ষেতে আশ্রয় নেয়, তবে জলের ওপরের নলখাগড়ার জঙ্গলই ওদের বেশি পছন্দ। ওড়ার সময় প্রথমে কয়েকবার পক্ষসঞ্চালন করে, তারপর খানিকক্ষণ ওরা হাওয়ায় ভেসে চলে, ওড়ার ভঙ্গি ওদের দ্রুত এবং সুন্দর ও সাবলীল, তা ছাড়া শিকারের পেছনে তাড়া করে শূন্যে চট করে এদিক-ওদিক মোড় ফেরার জন্য ওদের গভীরভাবে দ্বিধাবিভক্ত লেজটি বিশেষ সহায়ক। প্রজনন ঋতুতে ওরা বেশ উৎফুল্ল স্বরে গান করে। এই রেড্ রাম্পড্ সোয়ালোদের বাসার গড়ন বাঁকা-ত্যাড়া, তার ওপর কাদার প্রলেপ দেওয়া থাকে, আর প্রবেশ-পথটি অনেকটা সরু নলের মতো। পাহাড়ের গুহার ছাদে অথবা বাড়ির ছাদে বা পথের ধারে কোনো নালার সাঁকোর ভেতর দিকে দেওয়ালে ওদের বাসাগুলি আটকানো থাকে। বাসার মধ্যে ডিম রাখবার জায়গাটিতে থাকে পালকের আস্তরণ। ডিমের সংখ্যা এদের 3/4টি, রঙ ধপধপে সাদা। শীতকালে এই সোয়ালো-দের সঙ্গেই আর-একজাতের ইউরোপ থেকে আগত সোয়ালো-পাখির দেখা পাওয়া যায়, এগুলিই তথাকথিত 'কমন্ সোয়ালো' (H. rustica)। এগুলির পিঠের রঙ চকচকে ইস্পাতনীল বা বেগুনি-মেশানো নীল। নিচের দিকের রঙ ফিকে গোলাপি

আভাযুক্ত সাদা। এদের কপাল আর কণ্ঠদেশ চেস্ট্‌নাটের মতো বাদামী, গলার তলায় বুকের কাছে কালো রঙের বেষ্টনী আছে। এদেরও লেজ গভীরভাবে দ্বিধাবিভক্ত।

ল্যানিডি (Lanidae) গোষ্ঠীর শ্রাইক্‌ বা বুচার পাখিরা আকারে বুলবুল আর ময়নার মাঝামাঝি। এদের মাথা বেশ বড়ো, ঠোঁট শক্ত এবং প্রান্তভাগ বাঁকানো, পায়ের নখ ধারালো। সব মিলিয়ে ছোটোখাটো বাজপাখির মতো চেহারা। লেজটি স্বাভাবিক ভাবে নিচের দিকে নেমে গেছে, এদের স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় পাখির চেহারা একই রকম। এদের বুচার বা কসাই পাখি বলার কারণ হচ্ছে এদের মধ্যে অনেক প্রজাতির পাখিই পেট ভরে যতটা খেতে পারবে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাণী হত্যা করে, বাড়তি শিকারগুলি এরা কাঁটায় গেঁথে জমা করে রাখে ভবিষ্যতে খাওয়ার জন্য। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো এবং আমাদের পরিচিত পাখিটির নাম গ্রে শ্রাইক্‌ (Lanius excubitor) চিত্র নং— 66 :

হিন্দী নাম— সফেদ লাটোরা।

বাংলায় বলে— ক্যারকেটে বা কসাই পাখি।

আকারে এরা প্রায় ময়নার মতো। এই কালো-সাদা লম্বা-লেজওয়ালা রুপালি ধূসর রঙের পাখিটি বেশ চোখে পড়বার মতো। এদের ঠোঁটের পাশ থেকে চোখ ছাড়িয়ে অনেকখানি পর্যন্ত একটি চওড়া কালো দাগ আছে। কালো ডানার মধ্যে একটি আয়নার মতো সাদা রঙের ছোপ ওড়ার সময় স্পষ্ট দেখা যায়। বড়ো মাথা আর ভারী বাঁকানো ঠোঁট দেখে এই পাখিকে

বাজপাখির মতো হিংস্র মনে হয়। সাধারণত শুকনো খোলামেলা জায়গায় এই পাখিরা একা একা ঘু'র বেড়ায়। কাঁটাঝোপের মাথায় একটু উঁচু জায়গা থেকে ওরা শিকারের খোঁজে চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। শিকার দেখতে পেলেই মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নিয়ে যায়, তারপর পায়ে চেপে ধরে বাঁকানো ঠোঁট দিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে। প্রত্যেকটি পাখি নিজের নিজের খাদ্য সংগ্রহের এলাকা ঠিক করে নেয় এবং দিনের পর দিন সেই সেই একই জায়গায় শিকার খোঁজে, আর-কোনো পাখিকে নিজের এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করতে ওরা কিছুতেই দেবে না। পঙ্গপাল, নানারকম ফড়িং ও পতঙ্গ, ঝিঁঝিঁপোকা এমন কি গিরগিটি, ইঁদুর, পাখির ছানা বা রুগ্ণ শক্তিহীন বড়ো পাখিও ওরা খায়। নিজেদের চেয়ে বড়ো মাপের পাখিও যদি রুগ্ণ অশক্ত হয় তা হলে তাকে ওরা মেরে ফেলতে পারে। এমনিতে এদের ডাক বেশ কর্কশ ক্যারকেরে ধরনের কিন্তু প্রজনন ঋতুতে এদের কণ্ঠেও বেশ মিষ্টি সুর শোনা যায়। এই শ্রাইক (shrike) পাখি অন্য পাখিদের ডাকও চমৎকার নিজেদের গলায় তুলে নিতে পারে, তাই ওদের গানের সুরে অন্য অনেক পরিচিত পাখির ডাকের অনুরূপ সুর শোনা যায়। কাঁটাগাছের সরু ডালপালা দিয়ে গভীর বাটির মতো বাসা বানিয়ে তার মধ্যে ছেঁড়া ন্যাকড়া, পালক, পশমের টুকরো ইত্যাদি বিছিয়ে রাখে এরা, কাঁটাঝোপের মাঝামাঝি উচ্চতায় এদের বাসাগুলি দেখা যায়। ডিমের সংখ্যা 3 থেকে 6টি পর্যন্ত হয়, সাধারণত ডিমের রঙ ফিকে সবুজাভ সাদা, তাতে বেগুনি বাদামীর ছিট ও ফোঁটা থাকে।

আমাদের দেশে আরো কয়েক রকমের শ্রাইক আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় '**রুফাস ব্যাকড্**' বা **লাল পিঠওয়ালা শ্রাইক** (L. schach), এগুলি গ্রে শ্রাইকদের চেয়ে আকারে ছোটো, এদের পিঠের শেষভাগ এবং পশ্চাদ্দেশ উজ্জ্বল লাল, পেটের অংশেও লালচে ভাব আছে। এরা শুকনো আবহাওয়া পছন্দ করে না, জলের কাছাকাছি একটু গাছপালা ঘেরা স্থানই এদের বেশি পছন্দ।

ওরিওলিডি (Oriolidae) গোষ্ঠীর সবচেয়ে পরিচিত পাখি **ব্ল্যাক হেডেড্ ওরিওল** (Oriolus xanthornus) চিত্র নং— 67 :

হিন্দী নাম— পিলক।

বাংলায় এই পাখিগুলিকে বলে— বেনে বউ।

এগুলি আকারে প্রায় ময়নার মতো। এই বৃক্ষশাখাচারী পাখি-গুলির গায়ের রঙ উজ্জ্বল সোনালি হলুদ, মাথা, গলা এবং বুকের ওপরের দিকটি কুচকুচে কালো, ডানা এবং লেজেও কালো ছোপ আছে। এদের অন্য বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল গোলাপি ঠোঁট এবং লাল টুকটুকে চোখ। স্ত্রী-পাখিদের মাথার কালো রঙ পুরুষ পাখির মতো অত উজ্জ্বল নয়। বাচ্চা অবস্থায় এই পাখিদের কপালের রঙ থাকে হলদে এবং মাথাতেও থাকে হলুদ রঙের দাগ। বেশ অরণ্যসঙ্কুল অঞ্চলে এই পাখিরা একা একাই ঘুরে বেড়ায়। এরা একটু লাজুক গোছের পাখি, এবং নিরিবিলিতে থাকতেই ভালোবাসে, তবে লোকালয়ের মধ্যেও ঘন গাছপালায় ভরা বাগানে এদের দেখা যায়। বড়ো গাছের ঘন পাতার মধ্যে থেকে হঠাৎ যখন উড়ে যায় মনে হয় যেন সোনালি বিদ্যুৎ ঝলসে

উঠল। এদের ওড়ার ভঙ্গি বেশ অদ্ভুত, উড়তে উড়তে মাঝে মাঝে হঠাৎ গোঁত্তা খেয়ে নিচের দিকে নেমে আসে। এদের স্বাভাবিক ডাক বেশ কর্কশ, চিয়াহ্ বা কোয়াক্ এই ধরনের আওয়াজ করে, কিন্তু এ ছাড়াও ওরা বেশ বাঁশির মতো মিষ্টি সুরে পিলো, পিলোলো শব্দ করে ডাকে, গ্রামাঞ্চলে ঘুরবার সময় অনেক পক্ষী-পর্যবেক্ষকই এই ডাক শুনে মুগ্ধ হয়ে যান। এদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে নানারকম ছোটো ছোটো ফল, বট অশ্বত্থ পুটুস প্রভৃতিই ওরা সবচেয়ে বেশি খায়। তা ছাড়া নানারকম পতঙ্গ এবং শিমূল ও লাল মাদার প্রভৃতি ফুলের মধুও খায় ওরা। এই বেনেবউ পাখিরা গাছের বাকলের ভিতর দিককার তন্তু দিয়ে সুন্দর করে গভীর বাটির মতো বাসা বোনে আর সেই বাসার গায়ে প্রলেপ দেয় মাকড়শার জালের, এইভাবেই বাসার বাঁধুনী দৃঢ় থাকে। মাটির 4 থেকে 10 মিটার উচ্চতার মধ্যে কোনো দুভাগ হয়ে যাওয়া ডালের মাঝখানে দোলনার মতো ঝোলানো থাকে ওদের বাসাটি। ওদের ডিমের সংখ্যা 2 বা 3টি, রঙ গোলাপি সাদা, তার ওপর কালো ও লাল্চে বাদামীর ছিট থাকে। কাক এবং ঐ জাতীয় অন্য হানাদার পাখিদের হাত থেকে ডিম ও বাচ্চাদের বাঁচাবার জন্য ওরা প্রায়ই এমন গাছ বেছে বাসা বাঁধে যেখানে নির্ভীক কালো ড্রংগো পাখির বাসাও আছে।

এই গোষ্ঠীর অন্য যে প্রজাতিটিকেও এদের আশেপাশেই দেখা যায় সেটির নাম **গোল্ডেন ওরিওল্** বা সোনালি ওরিওল (Oriolus oriolus)। এগুলিও মাপে কালো-মাথা-ওরিওলদের সমান, এদেরও গায়ের রঙ ঐরকমই উজ্জ্বল হলুদ, কিন্তু মাথাটি কালো নয়, তবে আচক্ষুবিস্তৃত একটি কালো দাগ আছে। কাশ্মীর এবং

হিমালয়ের পাদদেশে এদের জন্মভূমি, সেখানে এই সোনালি ওরিওল প্রচুর জন্মায় কিন্তু দেশের অন্যান্য অঞ্চলে এরা শুধু শীতের অতিথি।

ডিক্রুরিডি (Dicruridae) গোষ্ঠীতে আছে শাখাচারী রোগা ছিপছিপে গড়নের পাখিরা, আকারে এরা ময়না আর বুলবুলদের মতো, এদের বেশির ভাগেরই পালকের রঙ উজ্জ্বল চকচকে কালো, লেজ লম্বা, লেজের গড়নে বৈচিত্র্য আছে। কারো কারো লেজ গভীর করে দুভাগে ভাগ করা, কারো বা লেজের বাইরের দিকের পালকগুলির প্রান্তভাগ কোঁকড়ানো, আবার কারো কারো লম্বা লেজের শেষ প্রান্ত চওড়া ছুরির ফলার মতো। এই গোষ্ঠীর যে পাখিটিকে আমরা সবচেয়ে বেশি চিনি তার নাম ব্ল্যাক ড্রংগো (Dicrurus adsimilis)— চিত্র নং 68 :

হিন্দী নাম— বুজাংগা বা কোতোয়াল।

বাংলা নাম— ফিঙে।

এগুলি বুলবুলের মতো আকারের ছিপছিপে আর চটপটে উজ্জ্বল কালো রঙের পাখি। গ্রামাঞ্চলে উন্মুক্ত প্রান্তরে, কৃষি-ক্ষেত্রের আশেপাশে ঝোপের মাথায়, বেড়ার খুঁটিতে বা টেলি-গ্রাফের তারের ওপর এই পাখিদের বসে থাকতে দেখা যায়, এখান থেকে ওরা চারদিকে নজর রাখে; জমির ওপর কোনো অসতর্ক ফড়িং দেখতে পেলেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনেক সময় ওরা শিকারকে ধরেই খেয়ে ফেলে, আবার অনেক সময় শিকারকে তুলে নিয়ে গিয়ে কোনো উঁচু জায়গায় বসে পায়ে চেপে ধরে ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। এই ফিঙে পাখিরা

মথ্ প্রজাপতি, গঙ্গাফড়িং, ডানাওয়ালা উইপোকা এ-সবও উড়ন্ত অবস্থায় ধরে খায় অনেকটা দোয়েল পাখিদের মতো। পাখিদের মধ্যে এই ফিঙেরা বেশ ডাকাত গোছের, অনেক সময় ওরা ওদের চেয়েও বড়ো পাখিদেরও অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাড়া করে তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে খায়। মাঠে বিচরণরত গোরু-মহিষের পিঠের ওপর ফিঙে পাখিদের বসে থাকতে দেখা যায় প্রায়ই। গোরুর ক্ষুরের আঘাতে ঘাসবনের মধ্যে থেকে যে-সব ফড়িং ছিটকে বেরিয়ে আসে তাদের ঐ ফিঙেরা ছোঁ মেরে ধরে ফেলে। যখন অরণ্যে বা ঘাসের জঙ্গলে আগুন লাগে এবং দলে দলে কীট-পতঙ্গ বাইরে পালাতে থাকে তখন ফিঙে পাখিরা দল বেঁধে ভোজের উৎসবে মেতে ওঠে। এরা এমন অনেক কীট-পতঙ্গ খেয়ে শেষ করে যা ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর, কাজেই এরা কৃষকদের পরম বন্ধু। ফিঙে পাখির ডাক বেশ কর্কশ। এরা যখন কর্কশস্বরে ডাকে তখন মনে হয় যেন ধমক দিচ্ছে বা ঝগড়া করছে, শিকরা বাজের ডাকের সঙ্গে এদের এই ঝগড়াটে সুরের ডাকে বেশ মিল আছে। বিশেষ করে প্রজনন ঋতুতে এদের ডাকাডাকি বেজায় বেড়ে ওঠে। ঘাস আর কাঠিকুটি দিয়ে ফিঙেরা বাটির মতো বাসা বানায়, কিন্তু বাসার তলাটা মোটেই মজবুত করে না, বাসার গায়ে মাকড়শার জালের আস্তরণ থাকে। বড়ো গাছের বেশ লম্বা ডালের শেষের দিকে যেখানে ডালটি দুভাগ হয়েছে সেইরকম জায়গায় এরা বাসা বাঁধে, সাধারণত দেখা যায় ফাঁকা মাঠ বা চাষের জমির ধারে ঐ রকম বড়ো গাছের বেরিয়ে-আসা ডালের আগায় ফিঙে পাখির বাসা রয়েছে, কারণ ঐ রকম জায়গা থেকে চারদিকে বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। এদের ডিমের

সংখ্যা 3 থেকে 5টি, ডিমের রঙ সাদা, তাতে লালচে বাদামীর ছিট আছে। এই পাখি দারুণ সাহসী, কাক, চিল বা ঐ জাতীয় বড়ো পাখিকে নিজেদের বাসার ধারে কাছে দেখতে পেলে তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করে। এইজন্যই ঘুঘু, বেনেবউ প্রভৃতি অনেক নিরীহ স্বভাবের পাখি একই গাছে ফিঙে পাখির বাসায় কাছাকাছি বাসা বাঁধে, কারণ ওরা জানে অসমসাহসী ফিঙে কোনো শত্রুকেই গাছের কাছে ঘেঁষতে দেবে না।

আরো দুরকম ড্রংগো সচরাচর দেখা যায়: একটি অ্যাশি বা ছাইরঙা ড্রংগো (D. leucophaeus) অন্যটি হোয়াইট বেলিড্ বা সাদা পেটওয়ালা ড্রংগো (D. caerulescens), প্রথমটির দেহের রঙ স্লেটপাথরের মতো আর চোখদুটি চুনির মতো লাল। এরা খোলা জায়গার চেয়ে জঙ্গলে থাকতেই বেশি ভালোবাসে। দ্বিতীয় পাখিটি আকারে ছোটো, পিঠের দিকের রঙ চকচকে নীলচে ধূসর এবং পেটের দিকের রঙ সাদা। পাতা-ঝরে-যাওয়া জঙ্গলে এবং বাঁশবনে এদের দেখা যায়।

স্টারনিডি (Sturnidae) গোষ্ঠীর সমস্ত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় আমাদের সুপরিচিত ময়না পাখির (Acridotheres tristis) মধ্যে। চিত্র নং 69:

হিন্দী নাম— দেশীময়না।

বাংলায় ময়না এবং শালিখ দুইই বলা হয়।

আকারে এরা বুলবুল আর পায়রার মাঝামাঝি, দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় 23 সেন্টিমিটার। এই সপ্রতিভ গাঢ় বাদামী রঙের পাখিগুলি সবাইকারই খুব পরিচিত, এদের মাথাটি কালো, ঠোঁট এবং

পা দুটি উজ্জ্বল হলুদ আর চোখের চারপাশে কিছুটা জায়গায় চামড়ার ওপর রোঁয়া বা পালক নেই। ময়না পাখির ডানার ওপর বেশ বড়োসড়ো সাদা দাগ আছে, ওড়ার সময় বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। চড়াই, কাক আর পায়রাদের মতো এরাও ঘনবসতি-পূর্ণ লোকালয়ের মধ্যেই বাস করে, দোকান বাজার, গৃহস্থের বাড়ি সর্বত্রই এদের দেখা যায়। এরা বেশ মিশুক স্বভাবের পাখি এবং খাওয়াদাওয়ায় কোনো বাছবিচার নেই, সেইজন্য লোকালয়ের মধ্যে থাকতে এদের কোনো অসুবিধাই হয় না। প্রায়ই দেখা যায় একজোড়া বা দুজোড়া শালিখ একটি কোনো বাড়ি বেছে নিয়ে, তারই আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, বাইরে থেকে অন্য কোনো শালিখ এসে ওদের এলাকায় ঢুকতে চাইলে তাকে বাধা দেয় প্রাণপণে। কিন্তু বাড়ির বাগানের ঘাসে জলসেচনের পর যখন অনেক কেঁচো বেরিয়ে আসে, কিংবা ডানাগজানো উইপোকারা উড়তে থাকে তখন ওরা বেশ দল বেঁধেই ভোজ শুরু করে দেয়, তা ছাড়া ফলন্ত বট বা অশ্বত্থগাছেও ওদের ঝাঁক বেঁধে ফল খেতে দেখা যায়। মাঠে যখন গোরু-মহিষ চরে বেড়ায় তখন তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে শালিখ পাখিরা। গোরুর ক্ষুরের আঘাতে ঘাসবন থেকে যে-সব ফড়িং লাফিয়ে ওঠে তারাও ওদের খাদ্য। মাঠে লাঙল দেওয়ার সময় মাটির ঢেলার সঙ্গে যে-সব কেঁচো ও পোকার ডিম ইত্যাদি উঠে আসে সেগুলি খাবার জন্যও তৈরি থাকে শালিখ পাখিরা। লাঙলের বলদের আশেপাশেই লাফিয়ে লাফিয়ে ওরা পোকা খেতে খেতে এগোতে থাকে। বড়ো বড়ো গাছে টিয়া আর কাকেদের সঙ্গে ওরাও দল বেঁধে রাত্রে আশ্রয় নেয়। ময়না বা শালিখ অনেকরকম করে ডাকতে পারে, বেশ

তীক্ষ্ণ স্বরেও ডাকে আবার কিচির-মিচিরও করে, মাঝে মাঝে বেশ ধমক দেওয়ার ভঙ্গিতে ডাকে র‍্যাডিও-র‍্যাডিও-র‍্যাডিও···। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে যখন ওরা কোনো ছায়াঢাকা নিরিবিলি স্থানে বিশ্রাম করে তখন পুরুষ শালিখের কণ্ঠে শোনা যায় কিক-কিক-কিক, কক্-কক্-কক্, চার্‌র্ চার্‌র্ এইরকম সব নানা ধরনের ডাক, পালক ফুলিয়ে বেশ হাস্যকর ভঙ্গিতে মাথাটি সঙ্গিনীর মুখের কাছে এনে ঐভাবে ওরা ডাকতে থাকে। গাছের কোটরে বা দেওয়ালের ফাঁক-ফোকরে রাজ্যের ছেঁড়া কাগজ, খড় ও আরো নানান রকম আবর্জনা জমা করে ওরা বাসা বানায়। ডিমের সংখ্যা এদের 4 5টি. ডিমের রঙ সুন্দর চকচকে নীল, তাতে কোনোরকম দাগ নেই।

অনেকটা এই ধরনেরই কিন্তু আকারে আরো ছোটো ব্যাঙ্ক ময়না (A. ginginianus) উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে গুজরাত রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে এবং পাকিস্তানে প্রচুর দেখা যায়। রেলওয়ে স্টেশনগুলিতেই এই পাখিগুলি বেশি নজরে পড়ে। এগুলির রঙ কিন্তু বাদামী নয়, এদের রঙ ফিকে নীলচে ধূসর এবং চোখের চারপাশের চামড়ার রঙ হলুদের পরিবর্তে ইটের মতো লাল।

উত্তর ও পূর্বভারতে আর-এক জাতের ময়না দেখা যায়, এদের কে বলা হয় পাইড্ ময়না (Sturnus contra) চিত্র নং 70 :

হিন্দী নাম— অংলক ময়না বা সিরোলি ময়না।

বাংলায় এদের বলে গাং শালিখ।

এরা দেশী ময়নার থেকে আকারে সামান্য ছোটো। এগুলি বেশ পাতলা ছিপছিপে সাদায় কালোয় মেশানো পাখি, চোখের চারপাশে গোল করে কমলা রঙের চামড়া আছে, আর

ঠোঁটটি গাঢ় কমলা-হলুদ। গ্রাম ও কৃষিক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে এদের দলবেঁধে ঘুরতে দেখা যায়। ফড়িং বা কোঁচোজাতীয় পোকার খোঁজে এরা মাঝে মধ্যে লোকের বাগানে ঢোকে বটে কিন্তু এরা মানুষের ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল নয় এবং লোকের বাড়ির ছাদে বা দেওয়ালে কখনো বাসা বাঁধে না। অবশ্য বাড়ির কাছের বড়ো গাছে অনেক সময় রাত্রির জন্য আশ্রয় নেয়। সাধারণ শালিখ পাখিদের মতো এরা সর্বভুক নয়, কীটপতঙ্গ আর ফলই এদের প্রধান খাদ্য। এরা অন্য সব শালিখদের সঙ্গে দল বেঁধেই খাবার খুঁজে বেড়ায়, শহরের বাইরে যেখানে আবর্জনা ফেলা হয় বা গাঁয়ের জলাশয়ের ধারে যেখানে গোরু-মহিষ চরে বেড়ায় সেই-সব জায়গায় এই শালিখদের দেখা পাওয়া যাবে। এরা বেশ উঁচু সুরেলা গলায় কয়েকরকম ডাক ডাকে, তার মধ্যে কোনো কোনো ডাক অনেকটা মাঠচড়াই-এর ডাকের সঙ্গে মেলে। কাঠিকুটি, ঘাসপাতা আর নানারকম আবর্জনা দিয়ে গাং শালিখরা বেশ বড়ো-সড়ো গোল গড়নের বাসা বানায়। আম, শিশু বা ঐ জাতীয় কোনো বড়ো গাছের বেরিয়ে-আসা ডালে ওদের বাসা চোখে পড়ে। গ্রাম বা কৃষিক্ষেত্রের ধারে প্রায়ই একটি গাছে 3-4টি গাংশালিখের বাসাও দেখা যায়। ডিমের সংখ্যা 4 5টি, ডিমের রঙ উজ্জ্বল নীল, গায়ে কোনো দাগ নেই।

গোলাপি প্যাস্টর বা গোলাপি স্টার্লিং-এর সঙ্গে গাংশালিখকে গুলিয়ে ফেলা বিচিত্র নয়। ঐ পাখিগুলির বড়ো বড়ো দল শীতকালে ভারতে আসে। কিন্তু এগুলির রঙ কালো এবং গোলাপি, সাদা নয়। আকারে এবং ধরন-ধারণে গাংশালিখদের সঙ্গে এদের যথেষ্ট মিল আছে। লাল টুকটুকে ফুলে ভরা মাদার আর শিমুল

গাছে এবং পাকা ফসলে ভরা জোয়ার ক্ষেতে এই গোলাপি প্যাস্টরদের দেখা যায়।

করভিডি (Corvidae) গোষ্ঠীর কাকেদের কোনো পরিচিতির দরকার নেই, শহরে বা গ্রামে এমন কেউ নেই যিনি হাউস ক্রো (Corvus splendens)অর্থাৎ কাক চেনেন না। চিত্র নং— 71 :

হিন্দী নাম— কৌয়া বা দেশী কৌয়া।

বাংলায়—কাক।

এই কাকেদের গলাটি ধূসর রঙের এবং এরা কুচকুচে কালো দাঁড়কাকেদের চেয়ে আকারে একটু ছোটো। ভারতীয় পাখিদের মধ্যে কাকই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি পরিচিত পাখি। এরা পুরোপুরি শহুরে পাখি, আমাদের আশেপাশে সর্বত্র বিরাজ করে এবং আমাদের জীবনযাত্রার অঙ্গ হয়ে উঠেছে বলা চলে। এরা যথেষ্ট দৌরাত্ম্য করে বেড়ায়, কিন্তু প্রখর বুদ্ধি, সাহস এবং সহজাত অনুভূতির সাহায্যে সব সময় ঠিক বিপদ এড়িয়ে চলতে পারে। খাওয়ার ব্যাপারে এদের কোনো বাছবিচার নেই, মরা ইঁদুর, এঁটোকাঁটা, মেছুনীর ঝুড়ি থেকে ছোঁ মেরে নেওয়া মাছ ক কারো প্রাতরাশের টেবিল থেকে অতর্কিতে তুলে নেওয়া ডিম, রুটি সব-কিছুই ওরা নির্বিচারে ভক্ষণ করে। এত সব চুরি-চামারি করে বটে কিন্তু কাক আমাদের মুদ্দোফরাসের কাজটিও করে খুবই দক্ষতার সঙ্গে। তবে নিরীহ সুন্দর গাইয়ে পাখিদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে এই কাকেরা, তাই বাগানে কাকের আড্ডা কেউই পছন্দ করে না। বক সারস প্রভৃতি পাখিদের বাসায় কাকেদের উপদ্রব লেগেই থাকে। যে এলাকায় বকেদের বাসা আছে তার আশে-

পাশেই কাকেরা ওৎ পেতে থাকে। মানুষের তাড়া খেয়ে বা অন্য কোনো কারণে বক-জাতীয় পাখিরা বাসা ছেড়ে একটু উড়ে গেলেই কাকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে অরক্ষিত বাসাগুলির ওপর, তারপর বেপরোয়া নিষ্ঠুরভাবে ডিম আর বাচ্চাগুলিকে খেয়ে ফেলে। পঙ্গপালের ঝাঁক এলে কাকেরা অবশ্য অনেক পঙ্গপাল খেয়ে আমাদের উপকার করে, কিন্তু ওরা নিজেরাও পাকা ভুট্টা আর গমের ফসল প্রচুর পরিমাণেই খেয়ে নষ্ট করে, তা ছাড়া বাগানের পাকা ফল এদের হাত থেকে বাঁচানো মুস্কিল। কাজেই ওরা উপকার না অপকার, কোন্‌টা বেশি করে সেটা বিতর্কের বিষয়। কাকেরা কাঠিকুটি দিয়ে মাচার মতো বাসা বানায়, বাসার মাঝখানটি একটু গর্ত মতো থাকে, তাতে ওরা বিছিয়ে রাখে তুলো, নারকেল-ছোবড়া, শণের টুকরো ইত্যাদি। গাছের ডালে 3 থেকে 8 মিটার উচ্চতার মধ্যেই ওরা বাসা বাঁধে। ডিমের সংখ্যা 4/5টি, রঙ ফিকে নীলচে সবুজ, তাতে বাদামী দাগ ও ছিট থাকে। কাকের ডিম দেখতে অনেকটা কোকিলের ডিমের মতো, সেইজন্যই কোকিল প্রায়ই নিজের ডিম কাকের বাসায় রেখে যায়।

জাঙ্গল ক্রো (C. macrorhynchos) বা দাঁড়কাকের রঙ উজ্জ্বল কুচকুচে কালো, আকারেও এরা বড়ো, ঠোঁট বড়ো এবং ভারী আর গলার স্বর অনেক বেশি কর্কশ। দাঁড়কাকরা সাধারণত শহর থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলেই থাকে, গ্রাম বা খামার বাড়ির আশেপাশে যে-সব নোংরা পড়ে থাকে সেগুলি খাওয়ার জন্যই ওরা লোকালয়ের কাছাকাছি আসে।

কাকেদের আত্মীয় হলেও কাকেদের চেয়ে অনেক সুশ্রী পাখি টি পাই (Dendrocitta vagabunda) চিত্র নং—72 :

হিন্দী নাম— মহালাট্।

বাংলায় এদের বলা হয়— হাঁড়িচাঁচা।

আকারে এগুলি ময়নার মতোই কিন্তু লেজটি প্রায় 30 সেন্টি-মিটার লম্বা। এই পাখিগুলির দেহের রঙ চেস্ট্নাট বাদামী এবং মাথা ও গলা ভুষোকালির মতো রঙের। ওদের লম্বা লেজের পালকের প্রান্তভাগের চওড়া কালো দাগ এবং ডানার ধূসর ছোপগুলি ওড়ার সময় স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। হাঁড়িচাঁচা পাখিরা সাধারণত অগভীর জঙ্গলে বাস করে। এরা বেশ সামাজিক স্বভাবের পাখি, সর্বত্র সপরিবারে ঘোরাঘুরি করে এবং নিজেদের মধ্যে উঁচু ক্যারকেরে গলায় কেঁ-কেঁ-কেঁ-কেঁ আওয়াজ ক'রে প্রচুর বার্তালাপ করে থাকে। এই পাখিরা ওদের দলপতিকে অনুসরণ করে বেশ ক্ষিপ্র অথচ ঋজু গতিতে এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে বেড়ায়, প্রথমে কয়েকবার সশব্দে ডানা ঝাপটে তারপর অল্পক্ষণ দুপাশে ডানা মেলে ও লেজের ভরে হাওয়ায় ভেসে যায়। কণ্ঠনালী থেকে এরা একরকম গম্ভীর কর্কশ আওয়াজ বার করে, তবে তা ছাড়াও নানারকম সুরেলা ডাকও ওরা ডাকতে পারে। যে ডাকটি ওরা প্রায়ই পুনরাবৃত্তি করে সেটা শুনতে লাগে অনেকটা—"বব্-ও-লিঙ্ক" বা "কো-কি-লা" এই ধরণের। প্রজনন ঋতুতেই এই ডাক শোনা যায়, পুরুষ পাখি পিঠ বেঁকিয়ে, মাথাটি গুঁজে লেজ ঝুলিয়ে বেশ হাস্যকর ভঙ্গিতে বসে সঙ্গিনীকে এই ডাকটা শোনায়। অন্যসব ফলাহারী পাখিদের সঙ্গে মিলেমিশে এই হাঁড়িচাঁচারাও দলবেঁধে বট আর অশ্বত্থ গাছে বসে পাকা ফল খায়, তবে কাকেদের মতো এরাও সর্বভুক, কখনো কখনো জীবজন্তুর মৃতদেহও খায়। সাধারণত ফল ছাড়া শুঁয়োপোকা,

কীটপতঙ্গ, গিরগিটি, অন্য পাখির ছানা এবং ছোটো ছোটো ইঁদুরও এদের খাদ্যতালিকায় পড়ে। ছোটো ছোটো নিরীহ পাখিদের এরা পরম শত্রু। নিয়মিতভাবে ছোটো পাখির বাসা লুঠ করে এরা ডিম ও বাচ্চা খেয়ে থাকে। কাঁটাগাছের ছোটো ছোটো ডাল দিয়ে এরা কাকেদের চেয়ে আর-একটু বড়ো করে বাসা বাঁধে, তার মধ্যে পেতে রাখে নানারকম শিকড়-বাকড় ও কাঠিকুটি, ঘন পাতাভরা বড়ো গাছে অনেক উঁচুতে পাতার আড়ালে বাসাটি লুকানো থাকে। ডিমের সংখ্যা 4/5টি, ডিমগুলিতে নানারকম রঙ ও দাগ থাকে, তবে সব চেয়ে বেশি দেখা যায় ফিকে গোলাপি মেশানো সাদার ওপর উজ্জ্বল লালচে বাদামী দাগযুক্ত ডিম।

ক্যাম্পেফ্যাগিডি (Campephagidae) গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে কুক্কু-শ্রাইক আর মিনিভেটরা, এরা রোগা ছিপছিপে ছোটো থেকে মাঝারি আকারের শাখাচারী পাখি, সাধারণত দলবদ্ধ ভাবেই থাকে এবং কীটপতঙ্গ খেয়েই জীবন ধারণ করে। মিনিভেটদের রঙও খুব বাহারী আর সুন্দর। এদের প্রায় সব বৈশিষ্ট্যগুলিই দেখা যায় স্কারলেট মিনিভেটদের মধ্যে (Pericrocotus flammeus) চিত্র নং— 73 :

হিন্দী নাম— পাহাড়ী বুলাল্ চশ্ম্।

বাংলায় এদের বলা হয়— সাতসয়ালী বা লাল বুলবুলি।

এই পাখিগুলি আকারে বুলবুলদের চেয়ে একটু ছোটো, পূর্ণ-বয়স্ক পুরুষ পাখির পিঠের প্রায় সবটাই উজ্জ্বল চকচকে কালো, নিচের দিকটা কমলা লাল ও গাঢ় লালে মেশানো। স্ত্রী-পাখি এবং

অল্প বয়স্ক পুরুষ পাখির রঙ পিঠের দিকে ধূসর ও জলপাই হলুদ, নিচের অংশ পুরোটাই হলুদ আর কালো ডানার ওপরও আছে দুটি হলদে রঙের দাগ। ঝাঁকড়া পাতাওয়ালা গাছের মাথায় একসঙ্গে 5/6টি পাখিকে দেখা যায়। শীতকালে কিন্তু এক-একটি দলে 30টিরও বেশি পাখি একসঙ্গে ঘোরে। সাধারণত পূর্ণবয়স্ক পুরুষ পাখিরা একসঙ্গে থাকে আর স্ত্রী ও বাচ্চা পাখিরা আলাদা দলে থাকে। ঘন পাতার ফাঁকে লাফিয়ে আর এ-গাছ থেকে ও-গাছে উড়ে উড়ে ওরা পতঙ্গ শিকার করে। গাঢ় সবুজ পাতার পটভূমিতে উড়ন্ত পুরুষ মিনিভেটদের উজ্জ্বল লাল পালক যখন সূর্যালোকে ঝলসে ওঠে, তখন অপূর্ব লাগে দেখতে। পাতা আর ফুলের ফুঁড়ি থেকে মাকড়শা, পতঙ্গ আর পোকার ডিম খুঁজে খুঁজে ওরা খায়, তা ছাড়া দোয়েল বা ফ্লাইক্যাচারদের মতো উড়ন্ত পতঙ্গও শিকার করে। সদলে যখন ওরা এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় উড়ে যায় তখন ভারি মিষ্টি সুরে হুই-টুইট বা হুইরিরি-হুইরিরি··· করে ডাক দিতে থাকে সবাই মিলে। সব মিনিভেটরাই গাছের পাতলা শিকড় বাকড় ও তন্তুতে মাকড়শার জালের বেষ্টনী দিয়ে অগভীর বাটির মতো বাসা বানায় আর বাসার বাইরের দিকে শ্যাওলা এবং মাকড়শার ডিমের খোলা দিয়ে প্রলেপ দেয়। মাটির 3 মিটার থেকে 15 মিটার পর্যন্ত উচ্চতার মধ্যে গাছের দুই ডালের মধ্যবর্তী স্থানে ডালের ওপরের দিকে এদের বাসা দেখা যায়। এক-একবারে এরা ডিম দেয় 2 থেকে 4টি, ডিমের রঙ ফিকে সবুজ, তাতে গাঢ় বাদামী ও ল্যাভেণ্ডার রঙের ছোপ থাকে।

এদের চেয়ে আরো ছোটো ও রোগা **'লিটল মিনিভেট'** (P.

cinnamomeus) ভারত ও পাকিস্তানের বহু অঞ্চলে দেখা যায়। এদের পুরুষ পাখির রঙ প্রধানত কালো, ধূসর ও কমলা লাল। স্ত্রী এবং অল্পবয়স্ক পুরুষ পাখির মাথায় কালো রঙ থাকে না এবং শরীরের নিচের অংশেও লালের বদলে হলুদ রঙেরই প্রাধান্য দেখা যায়। শুধু স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সব ছোটো মিনিভেটেরই পশ্চাদ্দেশে লালের ছোপটি থাকেই। 'স্কারলেট মিনিভেটরা' বন জঙ্গল পছন্দ করে কিন্তু এই 'লিট্‌ল মিনিভেটরা' বাগান এবং অল্প গাছপালাওয়ালা ন্যাড়া জঙ্গলেই বেশি থাকে।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার দক্ষিণাঞ্চলে এবং পূর্ব হিমালয়ে যে নীলপাখি বা 'ফেয়ারি ব্লু বার্ড' দেখা যায় তারা ইরেনিডি (Irenidae) গোষ্ঠীর অন্তর্গত। তবে এই গোষ্ঠীর আরো সুপরিচিত পাখি 'আয়োরা' এবং 'লিফ্ বার্ড' বা সবুজ বুলবুল। সাধারণ আয়োরা (Aegithina tiphia) চিত্র নং— 74 :

হিন্দী নাম— শৌবিগি।

বাংলায় বলে— ফটিকজল বা চাতক পাখি।

আকারে এগুলি চড়াই পাখির মতো। চকচকে কালো ও উজ্জ্বল হলুদ রঙের পুরুষ পাখির ডানায় দুটি সাদা দাগ আছে। স্ত্রী পাখিকেও সব সময়েই সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায়, স্ত্রী পাখির দেহের রঙ প্রধানত সবুজ ও হলুদে মেশানো, এরও ডানায় আছে সাদা দাগ। প্রজনন ঋতু ছাড়া অন্য সময়ে স্ত্রী ও পুরুষ দুটি পাখিকেই প্রায় একইরকম দেখতে লাগে, শুধু পুরুষ পাখিকে আলাদা করে চেনা যায় ওর কালো লেজটি দেখে। অগভীর বনে, গ্রামের আশে-পাশের গাছপালায় আর বাগানের গাছের ডালে এই পতঙ্গভুক

পাখিদের দেখা পাওয়া যায়। ওরা জোড়ায় জোড়ায় এ-ডাল থেকে ও-ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে পাতার ফাঁকে ফাঁকে কীটপতঙ্গ, শুঁয়োপোকা ইত্যাদি খোঁজে। সমস্তক্ষণ ওরা বেশ মিষ্টিস্বরে কিচির মিচির করে ডেকে পরস্পরের সাড়া নিতে থাকে। এদের লম্বা টানা সুরের ডাকটির অনুকরণেই হিন্দী শৌবিগি নামটি দেওয়া হয়েছে। পূর্বরাগের পালায় পুরুষ পাখিটি নানারকম দর্শনীয় কসরৎ দেখায়, সে সঙ্গিনীকে তাড়া করে যায়, তারপর সঙ্গিনীর সামনে ডানা দুটি ঝুলিয়ে, পেছনের সাদা পালক ফুলিয়ে লেজ উঁচু করে লম্বা টানা সুরে চিই-ই-ই করে ডাকতে থাকে, কখনো আবার শূন্যে দু-এক মিটার লাফিয়ে ওঠে। তারপর পশ্চাদ্দেশের পালক ফুলিয়ে ঠিক একটা পালকের বলের মতো ঘুরপাক খেতে খেতে আবার ঝুপ করে নেমে পড়ে গাছের ডালে। নরম ঘাস আর শিকড়ের তন্তু দিয়ে বুনে সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাটির মতো বাসা বানায় এরা। বাসার বাইরের দিকে থাকে মাকড়শার জালের আস্তরণ। যেখানে গাছের ডাল দুভাগ হয়েছে সেইরকম জায়গাতেই বাসা বাঁধে ওরা। সাধারণত ওদের ডিমের সংখ্যা 2 থেকে 4টি। রঙ ফিকে গোলাপি আভাযুক্ত সাদা, তাতে বাদামী বেগুনির ছোপ আছে।

মার্শাল'স্ আয়োরা (Ae. nigrolutea) পাখিও অনেকটা সাধারণ আয়োরাদেরই মতো দেখতে। এরা সারাদেশে বেশ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে—কচ্ছ, রাজস্থান পাঞ্জাব মধ্যপ্রদেশ ও বাংলায় এদের দেখা পাওয়া যায়। লেজের ডগার সাদা ছোপটি দেখেই এদের চেনা সহজ।

জার্ডনস্ ক্লোরপ্‌সিস্ (Chloropsis cochinchinensis jerdoni) চিত্র নং—75 :

হিন্দী নাম— হরেওয়া।

বাংলায় এদের বলা হয়— হরবোলা পাখি। এগুলি বেশ সুশ্রী। ঘাসের মতো সবুজ রঙের বুলবুলের আকারের এই পাখির মুখের পাশে উজ্জ্বল বেগুনি নীল রঙের গোঁফের মতো দাগ আছে, গণ্ড, চিবুক এবং গলা কালো, সরু একটু বাঁকানো ঠোঁটটিও কালো রঙের। স্ত্রীপাখিটির গণ্ড এবং কণ্ঠ ফিকে নীলচে সবুজ আর গোঁফের মতো দাগগুলি উজ্জ্বল সবুজাভ নীল। এই পাখিরা জোড়ায় জোড়ায় বা ছোটো ছোটো দল বেঁধে সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমে পাতার ফাঁকে ফাঁকে শিকার খুঁজে বেড়ায়, পা দিয়ে সরু সরু ডালপালা আঁকড়ে কখনো মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে কখনো এদিক ওদিক লাফিয়ে নানারকম কসরৎ করে ওরা পোকা ধরে। ওদের গায়ের রঙ গাছের পাতার রঙে এমনভাবে মিশে যায় যে প্রায়ই ওদের দেখতে পাওয়া যায় না, শুধু কণ্ঠস্বরই শোনা যায়। কিন্তু শুধু ডাক শুনেও ওদের চেনা মুস্কিল, কারণ এই পাখি অন্যদের কণ্ঠস্বর নকলে অদ্বিতীয়। প্রায়ই একেবারে নিখুঁতভাবে এই পাখি টুনটুনি, বুলবুল, ফিঙে, চাতক, সাদাবুক মাছরাঙা, দোয়েল প্রভৃতির ডাক অনুকরণ করে ডাকতে থাকে। একটুও না থেমে, এ-পাখি এমনভাবে একের পর এক বিভিন্ন পাখির স্বর নকল করে চলে যে হঠাৎ শুনলে মনে হবে বুঝি নভোচারী পক্ষীকুলের রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণপরিষদের অধিবেশন চলছে পুরোদমে। কিন্তু গাছের কাছে একটু এগিয়ে এলেই প্রতীয়মান হবে যে এতক্ষণ একটিমাত্র ক্লোরপসিস্ পাখি কাউকে বোকা বানানোর আনন্দে হরবোলার মতো এতগুলি পাখির ডাক ডেকে চলছিল। তারপর যেন ঠাট্টার হাসি হেসেই পাখিটি উড়ে যাবে অন্য গাছে। কীটপতঙ্গ, মাকড়শা,

ছোটো ছোটো ফল এবং ফুলের মধু এই পাখিদের প্রধান খাদ্য। ছোটো ছোটো গাছের শিকড়-বাকড়, শ্যাওলা লতার আকর্ষ (tendril) প্রভৃতি দিয়ে ঢিলেঢালা অগভীর বাটির মতো বাসা বানায় এরা, ভিতরে নরম কিছু বিছিয়ে দেয়। সাধারণত ওদের বাসাগুলি থাকে গাছের ডালের একেবারে শেষপ্রান্তে, কিন্তু পাতার আড়ালে লুকোনো। ডিমের সংখ্যা সাধারণত 2টি, রঙ লালচে আভাযুক্ত ঈষৎ হলদে, তাতে প্রচুর পরিমাণে ফিকে লাল রঙের ছিট থাকে।

এদেরই নিকট আত্মীয় আর-একটি প্রজাতির নাম **গোল্ডফ্রন্টেড্ ক্লোরপসিস্** (C. aurifrons)। এদেরও পূর্বোক্ত পাখিদের কাছাকাছিই দেখা যায়। এই প্রজাতির পুরুষ পাখিদের কপাল উজ্জ্বল সোনালি রঙের এবং চিবুক ও গলার রঙ বেগুনি আর কালোয় মেশানো। স্ত্রী পাখিদেরও কপালে সোনালি ছোপ আছে বটে কিন্তু সব মিলিয়ে এদের রঙের বাহার পুরুষ পাখিদের মতো অত উজ্জ্বল নয়।

পিক্‌নোটিডি (Pycnonotidae) গোষ্ঠীর অন্তর্গত চঞ্চল, প্রাণোচ্ছল বুলবুল পাখিরা আমাদের দেশের অনেক সাজানো গোছানো নয়নাভিরাম উদ্যানের শোভাবর্ধন করে।

রেড হুইস্কারড বা লাল গুঁফো বুলবুল (Pycnonotus jocosus) চিত্র নং— 76 :

হিন্দীতে— পাহাড়ী বুলবুল।

বাংলাতেও বুলবুলই বলা হয়।

এই পাখিরা গাছপালায় ভরা বাগান এবং কুঞ্জবন খুব পছন্দ

করে, আকারে এরা ময়নার চেয়ে রোগা এবং হাল্কা গড়নের। মাথার ওপরে সামনের দিকে হেলানো ঝুঁটি এদের বিশেষত্ব। পিঠের ওপরের পালকের রঙ চুলের মতো কালচে বাদামী এবং পেটের দিকের রঙ সাদা, বুকের কাছে, মাঝখানে ভাঙা একটি মালার মতো কালো দাগ আছে। তা ছাড়া আছে বেশ চোখে পড়বার মতো টুকটুকে লাল গোঁফ এবং লেজের নিচের দিকে লাল রঙের ছোপ। ঘনবসতিপূর্ণ শহরের মাঝখানেও একটু গাছপালা ভরা জায়গায় পর্যাপ্ত আহার আর আশ্রয় পেলেই এরা থাকতে পারে বটে কিন্তু মোটের ওপর ওরা পছন্দ করে বনজঙ্গলে ভরা পাহাড়ী জায়গা। এই বুলবুলরা সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় ঘোরে কিন্তু পাকা ফল খাওয়ার সময় অনেক গাছেই ওদের ঝাঁক বেঁধে বসতে দেখা যায়। এরা খুব একটা গাইয়ে পাখি নয় তবে সারাদিনই প্রায় মনের খুশিতে ডাকাডাকি করে বেড়ায়। ফলই ওদের প্রধান খাদ্য, তার মধ্যে আবার পুটুসের ফল সবচেয়ে বেশি পছন্দ। তবে মাকড়শা পতঙ্গ, শুঁয়োপোকা এ-সবও ওরা যথেষ্ট খায়। রেডভেন্টেড বুলবুলদের মতো ওরা ঝগড়াটে স্বভাবের নয় এবং ছোটো থেকে পুষলে খুব পোষ মানে। শেষ পর্যন্ত এত বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে যে সর্বত্র প্রভুকে অনুসরণ করে বেড়ায় আর প্রভু ডাক দিলে বহুদূর থেকেও ঠিক এসে হাজির হয়। সব বুলবুলদের মতোই এরাও পাতলা শিকড়বাকড়, ঘাস, সরু ডালপালা ইত্যাদি একসঙ্গে বুনে বাটির মতো বাসা বানায়। বাসা বাঁধার ব্যাপারে এরা বেশ অসাবধানী, লিচু গাছ বা ঝোপের ওপর, বা বাগানের বেড়ার গায়ে একেবারে সবাইকার চোখের সামনে বাসা বাঁধে এবং নিজেরাই অসাবধানে যাতায়াত করতে গিয়ে প্রায়ই

বাসা ভেঙে ফেলে। হামেশাই অন্য হানাদার প্রাণীরা এদের বাসা ভেঙে বাচ্চা ও ডিম লুটপাট করে থাকে। কখনো কখনো ওরা কুঁড়েঘরের খড়ের ছাউনির মধ্যে বাসা বানায়। কুঁড়ের মধ্যে লোকজন যাতায়াত করলেও ওরা ভ্রুক্ষেপ করে না। এই বুলবুলদের ডিমের সংখ্যা 2 থেকে 4, রঙ গোলাপি মেশানো সাদা, তাতে বেগুনি বাদামী বা লালের ছিটেও থাকে।

হোয়াইট চিকড্ বা শ্বেত গণ্ডবিশিষ্ট বুলবুল (P. leucogenys) উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে লালগুঁফো বুলবুলদের চেয়ে বেশিই দেখা যায়। এদের দুপাশের গণ্ডদেশ সাদা, গোঁফ নেই এবং লেজের তলার দিকে লালের পরিবর্তে হলদে রঙের ছোপ আছে। এদেরও ঝুঁটি আছে তবে গুজরাত অঞ্চলের পাখিগুলির ঝুঁটি গোল ধরনের আর কাশ্মীরের পাখিদের ঝুঁটি সূচালো ও সামনের দিকে হেলানো।

রেড্ ভেন্টেড্ বুলবুল (P. cafer) চিত্র নং—77 :

হিন্দী নাম— বুলবুল বা গুলদুম।

বাংলায়— বুলবুল।

এই ধোঁয়াটে রঙের পাখিগুলিকে বাগানে প্রায়ই দেখা যায়, এদের মাথার রোঁয়াগুলি দেখলে মনে হয় যেন কদমছাঁট দেওয়া হয়েছে, বুকে আর পিঠে অজস্র মাছের আঁশের মতো দাগ এবং লেজের গোড়ায় নিচের দিকে আছে একটি গাঢ় লালরঙের ছোপ। এদের সাদা পশ্চাদ্দেশ ওড়ার সময় বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ে। লোকালয়ের আশেপাশের বাগানে বা অগভীর বনে এই বুলবুলদের দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু বেশি ঘন জঙ্গলে এবং পাহাড়ী অঞ্চলে এরা বিরল, সেখানে লালগুঁফো বুলবুলদেরই

রাজত্ব। এই পাখিরা বেশ খোশ মেজাজে ডাকে এবং সদাচঞ্চল এদের গতিবিধি, তাই ওরা বাগানে থাকলে ভালোই লাগে, কিন্তু সজীবাগানের পক্ষে এরা বেশ ক্ষতিকর কারণ মটরশুঁটি এবং ঐ জাতীয় অন্য সজী এদের প্রিয় খাদ্য। কলাই এরা বেশি খায় তবে মথ্ ও গুটিপোকা শুঁয়োপোকা এ-সবও বাদ দেয় না। প্রথম বর্ষার পর যখন ডানা গজানো উইপোকারা মাটির বাসা ছেড়ে উড়তে আরম্ভ করে তখন এই বুলবুলরা ঝোপের মাথা থেকে লাফ দিয়ে এবং শূন্যে উড়ে উড়ে প্রচুর উইপোকা খেয়ে শেষ করে দেয়। লালগুঁফো বুলবুলদের সঙ্গে এদের আচার-ব্যবহারে যথেষ্ট মিল আছে তবে এরা লালগুঁফোদের চেয়ে বেশি ঝগড়াটে স্বভাবের। ভারতে যাঁরা পাখির কদর করেন তাঁরা এই পাখিগুলিকে লড়ুয়ে বুলবুল বলে বেশ খাতির করে থাকেন। দেশের অনেক অঞ্চলেই বিশেষ বিশেষ পর্বের দিনে বুলবুলের লড়াই উৎসবের একটা অঙ্গ। দুপক্ষের বুলবুলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং এই লড়াই উপলক্ষে দর্শকেরা প্রচুর বাজিও ধরে থাকে। বিজয়ী পাখির দামও যেমন খাতিরও তেমনি। অন্য সব বুলবুলদের মতো এরাও নরম পাতলা শিকড়, পাতার ডাঁটা, ঘাস ইত্যাদি দিয়ে নিচু গাছ বা ঝোপের মাথায় বাটির মতো বাসা বানায়, অনেক সময় বাংলোবাড়ির বারান্দায় থামের গায়ে জড়ানো লতার মধ্যেও ওদের বাসা দেখা যায়, হয়তো বাসার দু-এক হাত দূর দিয়েই সারাদিন লোকে যাতায়াত করছে কিন্তু তাতে ওদের ভ্রূক্ষেপও নেই। ডিমের সংখ্যা দুটি বা তিনটি, ডিমগুলি দেখতে লালগুঁফো বুলবুলদের ডিমের মতোই।

পাসেরিফর্মিস্ (Passeriformes) বর্গের অন্তর্গত মাস্‌কি-কাপিডি (Muscicapidae) গোষ্ঠীর মধ্যে আছে প্রচুর নানা বিভিন্ন উপগোষ্ঠী এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। ফ্লাইক্যাচার, ব্যাবলার, ওয়ার্বলার, থ্রাশ প্রভৃতি পাখি দৈহিক গঠন ও আচার-আচরণের কী কী সাদৃশ্যের জন্য একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সে গবেষণা যথেষ্ট জটিল এবং এ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। কয়েকটি উদাহরণই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। ফ্লাইক্যাচারদের যে প্রজাতিটিকে অনেক পাঠকই দেখে থাকবেন, সেটির নাম—

হোয়াইট স্পটেড্ ফ্যানটেল ফ্লাইক্যাচার (Rhipidura albogularis) চিত্র নং—78 :

হিন্দী নাম— নাচন্ বা চাকদিল্।

বাংলায় বলে— চাক দোয়েল।

ধোঁয়াটে রঙের এই চঞ্চল স্ফূর্তিবাজ পাখিগুলি আকারে চড়াইয়ের মতো, এদের বিশেষত্ব হচ্ছে চোখের ওপর ভ্রূর জায়গায় সাদা দাগ, বুকে এবং পাশে সাদা ছোপ আর সাদাটে ধরনের পেট। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এর লেজটি, সুন্দর করে সাজিয়ে পাখার ভঙ্গিতে ছড়ানো। লেজের দুপাশ থেকে ডানা দুটি ঝুলে থাকে। অগভীর জঙ্গলে এবং জনাকীর্ণ শহর-বসতির মধ্যেও গাছপালা ভরা বাগানে এই পাখার মতো লেজওয়ালা চাক দোয়েলদের দেখা যায়। মনুষ্যসমাজ সম্পর্কে এরা বেশ নির্বিকার, তবে পোষ মানালে বেশ পোষ মানে ও মানুষকে বিশ্বাস করে। এরা জোড়া বেঁধে একই এলাকায় নিয়মিতভাবে ঘোরাফেরা করে। প্রায়ই দেখা যায় দুটি পাখি মিলে মনের আনন্দে এ-ডাল থেকে ও-ডালে নেচে বেড়াচ্ছে। ক্ষিপ্র তৎপরতার সঙ্গে শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে ওরা উড়ন্ত

ছোটো ছোটো পতঙ্গকে তাড়া করে যায় আর ঠোঁটে খুট করে একটি আওয়াজ তুলে শিকারকে মুখে পুরে ফেলে। সাধারণত এরা বেশ কর্কশস্বরে চাক্-চাক্ করে ডাকে কিন্তু তা ছাড়াও বেশ চড়া ও নিচু পর্দায় সুর খেলিয়ে শিস দেওয়ার মতো মিষ্টি সুরে গানও ওরা গাইতে পারে। যখন ওরা লাফিয়ে বেড়ায় তখন এই গান ওদের কণ্ঠে প্রায়ই শোনা যায়। মশা মাছি এবং ঐ জাতীয় দুই-ডানাওয়ালা ছোটো পতঙ্গই এদের প্রধান খাদ্য। এই পাখিদের ছোট্ট সুন্দর বাসাটির গড়ন অনেকটা মদের গ্লাসের মতো, মিহি ঘাস আর তন্তু দিয়ে তৈরি বাসাটির বাইরের দিকটি মাকড়সার জালের আস্তরণে ঢেকে দেওয়া হয়। চাতক বা আয়োরাদের বাসার সঙ্গে এদের বাসার অনেকটা মিল আছে বটে, কিন্তু এদের বাসার তলা থেকে সর্বদাই খানিকটা ঘাস খড় ইত্যাদির গোছা অপরিষ্কার ভাবে ঝুলতে থাকে, আয়োরাদের মতো পরিচ্ছন্ন ভাবে বাসা গড়তে এরা পারে না। আম বা চিকুর চারাগাছ বা ঐ ধরনের কোনো নিচু গাছে দুটি সরু ডালের মাঝখানে জমি থেকে মাত্র 3 মিটারের মধ্যেই ওরা বাসা বাঁধে। চাক দোয়েলের ডিমের সংখ্যা সাধারণত 3টি, রঙ গোলাপি আভাযুক্ত ফিকে হলদে, ডিমের চওড়া দিকটায় ছোটো ছোটো বাদামী রঙের ফুটকির একটি বেষ্টনী থাকে।

এদেরই নিকট আত্মীয় হোয়াইট-ব্রাওড্ ফ্যানটেল ফ্লাই-ক্যাচার (R. aureola) ভারতের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। এদের কপালে থাকে চওড়া সাদা রঙের ছোপ এবং পেটের দিকটিও সাদা। পরীর মতো সুন্দর প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচারদের

দেখলে সব সময়ই মুগ্ধ হতে হয়। প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার (Terpsiphone paradisi) চিত্র নং—79 :

হিন্দী নাম— শাহ বুলবুল বা দুধরাজ।

বাংলাতেও এদের বলে দুধরাজ ।

লেজটি বাদ দিলে আকারে এরা প্রায় বুলবুলের মতোই, কিন্তু লেজটি এদের প্রায় 25 থেকে 30 সেন্টিমিটার লম্বা। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ পাখির রঙ রজত-শুভ্র, লেজের দুটি পালক লম্বা ফিতার মতো আর ঝুঁটিওয়ালা মাথাটির রঙ চকচকে উজ্জ্বল কালো। এদের স্ত্রী পাখি এবং অল্পবয়স্ক পুরুষ পাখির পিঠের রঙ চেস্ট্‌নাট বাদামী এবং পেটের রঙ ধূসরাভ সাদা, এদেরও মাথায় ঝুঁটি থাকে এবং মাথার রঙ কালো। অল্পবয়স্ক পুরুষ পাখির লেজের লম্বা রিবন বা ফিতার মতো পালক দুটির রঙ চেস্ট্‌নাট বাদামী। স্ত্রীপাখিদের লেজে এই লম্বা পালক থাকে না, তাই তাদের সঙ্গে বুলবুলদের চেহারায় খুব মিল দেখা যায়। এই চিত্তাকর্ষক ফ্লাইক্যাচারটিকে অনেক রকম নামে ডাকা হয়, কেউ বলেন রকেট পাখি, কেউ বলেন ‘উইডো বার্ড’ বা বিধবা পাখি, কেউ বা আবার একে রিবন পাখি বলে ডাকেন। ছায়া-ঢাকা বাগানে, পত্রবিরল অরণ্যে বা ছোটোখাটো নালার ধারে বাঁশ বনে এই পাখিদের দেখা পাওয়া যায়। সাধারণত এরা জোড় বেঁধেই ঘোরে, তবে পতঙ্গভুক পাখিদের সঙ্গে একসঙ্গে মিলেমিশে শিকার খুঁজতেও দেখা যায় এদের। পুরুষ পাখিটি হালকা নমনীয় ভঙ্গিতে অথচ আশ্চর্য সাবলীলতায় শূন্যে উড়ন্ত পতঙ্গদের শিকার করে। ওড়ার মধ্যে ওঠা-নামা করার সময় তার লেজের লম্বা পালক দুটি শূন্যে এমন সুন্দর ভাবে ঢেউ

খেলিয়ে যায় যে, সে দৃশ্য একবার দেখলে কেউ ভুলতে পারবেন না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এদের শুধু রূপই আছে, গলায় স্বর নেই। চেঁ-চেঁ করে এরা সাধারণত যে ডাকটি ডাকে তা বেশ প্রাণোচ্ছল হলেও শুনতে কর্কশ। অবশ্য প্রজনন ঋতুতে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় পাখিরই কণ্ঠে কিছুটা মিষ্টি আওয়াজ শোনা যায়, তখন ওরা যথাসাধ্য গান গাইবার চেষ্টা করে। অন্য সব ফ্লাইক্যাচারদের মতোই এরাও প্রধানত শূন্যে উড়ন্ত মশা, মাছি, মথ ইত্যাদি ধরে খায়। দুধরাজ বা প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার ভারতের বহু অঞ্চলেই পাওয়া যায়, কিন্তু কাশ্মীরই এদের প্রধান জন্মভূমি। প্রকৃতি-প্রেমিক ভ্রমণকারী কাশ্মীরে গেলে এদের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করে প্রচুর আনন্দ পেতে পারেন। মিহি ঘাস ও তন্তু দিয়ে মজবুত বাটির মতো বাসা বুনে তার চারদিকে মাকড়শার জাল ও মাকড়শার ডিমের খোলা দিয়ে ভালো করে প্রলেপ দেয় এরা। গাছের সরু ডালের বাঁকানো স্থানে বা জোড়ের মুখে এদের বাসা দেখা যায়, মাটির 2 থেকে 5 মিটার উচ্চতার মধ্যেই ওরা বাসা বাঁধে। ডিমের সংখ্যা 3 থেকে 5টি, রঙ ফিকে গোলাপি ও ফিকে হলদে মেশানো, তাতে লালচে বাদামীর ছিটেফোঁটাও থাকে।

ব্যাবলারদের মধ্যে ছোটো থেকে মাঝারী আকারের বহু বিচিত্র বর্ণের পাখি আছে, একেবারে সাদামাটা বাদামী রঙের পাখিও দেখা যায় আবার খুব উজ্জ্বল রঙদার পালকওয়ালা বাহারী পাখির সংখ্যাও কম নয়। এই দলের প্রায় সব পাখিরই দলবদ্ধ ভাবে বাস করার অভ্যাস দেখা যায়। এরা যে উপগোষ্ঠীর অন্তর্গত

তার নাম টিমালিনি (Timaliinae)। এই উপগোষ্ঠীর যে-সব পাখি সচরাচর চোখে পড়ে তাদের কয়েকটির পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

ইয়েলো আইড্ ব্যাবলার (Chrysomma sinensis) **চিত্র নং—80 :**

হিন্দীতে বলে— বুলাল্ চশম্।

বাংলায়— হলুদ-চোখ ছাতারে বলা চলে।

এগুলি বুলবুলের চেয়ে আকারে ছোটো এবং লম্বা লেজওয়ালা পাখি, ঘাস-বনে এবং ঝোপঝাড়ের মধ্যেই এরা থাকে। এই পাখিদের পিঠের দিকের রঙ দারুচিনি আর চেস্ট্নাট বাদামের মতো বাদামী, নিচের দিকটা সাদা এবং বেশ চোখে পড়বার মতো কমলা-হলুদ রঙের চোখের পাতা আর হলুদ রঙের চোখ। এদের গোষ্ঠীর অন্য পাখিদের মতোই এরাও 5/7টি করে একসঙ্গে দল বেঁধে ঘোরে, কাঁটা ঝোপ বা উঁচু ঘাসের জঙ্গলে অথবা চাষের জমির ধারে কাছে উঁচু বাঁধের ওপর বড়ো বড়ো ঘাসের ঝোপে এই পাখিদের হামেশাই দেখা যায়। ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে ওরা পোকা খুঁজে বেড়ায়, অনেক সময় ঘাসের ডাঁটা বেয়ে উপরে উঠে ডগা ধরে ঝুলতে থাকে শিকার ধরার চেষ্টায়। এরা বেশ ভীরু স্বভাবের পাখি, হঠাৎ ভয় পেলে এ ঝোপ থেকে ও ঝোপে লাফ দিয়ে দিয়ে পালায় এবং দেখতে দেখতে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। ভয় পেয়ে পালাবার সময় ওরা কর্কশ স্বরে কিচির মিচির করে ডাকে। অন্য সময় ওরা বেশ পরিষ্কার জোরগলায় চিপ্-চিপ্-চিপ্ করে ডাকে। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ পাখিটিকে উঁচু ঝোপের মাথায় বা লম্বা ঘাসের ডগায় বসে বেশ জোরগলায় গান গাইতে

শোনা যায়। মাকড়শা, ফড়িং এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গই এদের খাদ্য, তবে এদের আত্মীয় অন্যান্য পাখিদের মতো এরাও ফুলের মধু খেতে খুব ভালোবাসে, লাল টুকটুকে ফুলে ভরা মাদার আর শিমুল গাছে মধুর লোভে এই পাখিদের প্রায়ই ভিড় জমাতে দেখা যায়। এই হলুদ-চোখ ছাতারেরা মোটা ঘাস দিয়ে বেশ গভীর বাটির মতো বাসা বানিয়ে তার মধ্যে নরম ঘাস বিছিয়ে দেয়, আর বাসার বাইরের দিকে দেয় মাকড়শার জালের প্রলেপ। মাটি থেকে প্রায় 2 মিটার উঁচুতে ঝোপের দুই ডালের সংযোগ স্থলে বা দুটি ঘাসের ডাঁটার মধ্যে দোলনার মতো করে বাসা বাঁধে ওরা। এদের ডিমের সংখ্যা 4/5টি, ডিমের রঙ হলদেটে সাদা, তার ওপর বেগুনি বাদামীর খুব সূক্ষ্ম ছিটও থাকে।

জাঙ্গল ব্যাবলার (Turdoides striatus) চিত্র নং—81 :

হিন্দী নাম— সাতভাই বা ঘোংঘাই।

বাংলায়— ছাতারে।

এগুলি মেটে রঙের ময়নার চেয়ে একটু ছোটো আকারের পাখি, এদের চেহারাটা একটু অপরিচ্ছন্ন, লম্বা লেজটি দেখলে মনে হয় যেন পালকগুলি কোনো রকমে গুঁজে দেওয়া হয়েছে। এদের এক-একটি দলে সর্বদাই 6/7টি করে পাখি দেখা যায়, সেইজন্যই হিন্দীতে বলে সাত ভাই, ইংরাজীতেও অনেক সময় ওদের 'সেভ্‌ন সিস্‌টারস্‌' বলে উল্লেখ করা হয়। এই ছাতারে পাখিরা বনজঙ্গল পছন্দ করে, গ্রাম ও নগরের আশেপাশের জঙ্গলে এবং বড়ো বড়ো গাছপালাভরা বাগানে ওরা থাকে, সারাদিন শুকনো পাতার স্তূপের মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে পোকা খুঁজে বেড়ানোই ওদের কাজ। জঙ্গলে যে-সব পাখি পোকা ও পতঙ্গ শিকার করে

বেড়ায় তাদের মধ্যে প্রধান বলা চলে এই ছাতারেদের। এরা সমস্তক্ষণ কর্কশ ক্যাচর ম্যাচর শব্দে পরস্পরের মধ্যে বার্তালাপ চালিয়ে যায় এবং সমস্ত দলটির মধ্যে বেশ একটা বন্ধুত্বের ও প্রীতির সম্পর্ক আছে সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে মতবিরোধও ঘটে থাকে, তখন বেশ উচ্চকণ্ঠে ঝগড়া তো হয়ই সেইসঙ্গে ঠোঁট আর নখের ব্যবহারও হয় ভালো রকমই। তবে এরকম কলহ খুব বেশি ঘটে না এবং ঘটলেও অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়, মিটমাট হয়ে যেতে বেশি দেরি হয় না। হঠাৎ শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে ওদের একতাবোধ দেখবার মতো, দলের একটি পাখিকে যদি বেড়াল বা বাজপাখি আক্রমণ করে তৎক্ষণাৎ দলসুদ্ধ সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে রক্ষা করতে, প্রবল শব্দে ডাকাডাকি ক'রে এমন তেজের সঙ্গে এরা পাল্টা আক্রমণ করে যে শত্রুকে প্রায়ই রণে ভঙ্গ দিতে হয়। মাকড়শা, আরশুলা, মথ্ ও অন্যান্য পতঙ্গ, এবং তাদের ডিম এদের প্রধান খাদ্য। তবে বট, অশ্বত্থ পুটুস প্রভৃতি ফল এবং শস্যের দানাও এরা খায়। ছাতারে পাখিরা শিমূল আর মাদার ফুলের মধু খেতে খুব ভালোবাসে, ফুলের মধ্যে থেকে মধু খেতে গিয়ে ওরা ঐ-সব ফুলের পারস্পরিক পরাগযোগ ঘটানোর কাজেও যথেষ্ট সাহায্য করে। মাটির 3 থেকে 5 ফুট ওপরে দুটি ডালের ফাঁকে কাঠিকুটি ও শিকড়-বাকড় দিয়ে এরা ঢিলে-ঢালা বাটির মতো বাসা বানায়। ডিমের সংখ্যা 3/4টি, ডিমগুলির রঙ চমৎকার ফিরোজা নীল। প্রায়ই দেখা যায় ওরা কয়েকটি পাখি একসঙ্গে বাসা বেঁধে, সবাই মিলে বাচ্চাদের আহার জোগাচ্ছে, কোন্‌টি কার বাচ্চা তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না। অনেক সময় আবার দেখা গেছে ঝুঁটিওয়ালা

পাইড্ কাক্কু বা 'হক কাক্কু'রা এসে এই ছাতারেদের বাসায় ডিম পেড়ে রেখেছে, এদেরও ডিমের রঙ ঐরকমই নীল, তাই ছাতারেরা কোনো প্রভেদ বুঝতে পারে না, এদের বাচ্চাদেরও প্রতিপালন করে যায়।

ব্যাব্লারদের দলের আর-একটি সুপরিচিত পাখি কমন ব্যাব্লার (Turdoides caudatus) চিত্র নং— 82 :

হিন্দীতে এদের বলে— ডুমরি বা চিল্‌চিল্।

বাংলায় ছাতারে।

এগুলি আকারে প্রায় বুলবুলের মতো, তবে লেজটি বেশ লম্বা, 'জাঙ্গল্ ব্যাব্লার'দের চেয়ে এরা হাল্কা-পাতলা গড়নের। কিন্তু ঠিক ওদের মতোই এদেরও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন বেশ সুদৃঢ়, এরাও 6/7টি মিলে দল বেঁধে মাটিতে আর কাঁটা ঝোপের মধ্যে চরে বেড়ায়। এদেরও ওপর দিকের পালকগুলি মেটে রঙের তবে তাতে আরো গাঢ় রঙের দাগ অনেক আছে, আর ধাপে ধাপে লম্বা হয়ে যাওয়া দীর্ঘ লেজের পালকগুলিতেও আড়া-আড়ি ভাবে আছে প্রচুর সরু সরু দাগ। লেজের পালকগুলি দেখলে মনে হয় যেন আলগা ভাবে কোনো রকমে গোঁজা রয়েছে। এই ছাতারেরা ঝোপঝাড়ের মধ্যে দল বেঁধে ঠিক ইঁদুরের মতো ক্ষিপ্র লঘু পায়ে ছুটে বেড়ায় আর আনাচে-কানাচে পোকা-মাকড়ের সন্ধান করে। আকাশে ওড়াটা এদের মোটেই পছন্দ নয়, হঠাৎ তাড়া খেলে বা ভয় পেলেও ওরা ওদের ছোটো ছোটো পায়ে ভর দিয়ে দৌড়েই এক ঝোপ থেকে অন্য ঝোপে পালায়। ওড়ার ভঙ্গি এদের বড়ো দুর্বল। এদের ডানার গড়ন গোল ধরনের। কয়েকবার দ্রুত পক্ষসঞ্চালন করে তারপর একটুক্ষণ

ডানা আর লেজের ভরে ভেসে চলে যায়। পর পর কয়েকবার অল্পস্থায়ী শিস দেওয়ার মতো সুরে এরা ডাকে, কিন্তু সাপ বা বেড়াল বা ঐ জাতীয় কিছু দেখে উত্তেজিত হলে ওরা দলসুদ্ধ সবাই মিলে একসঙ্গে হুইচ্-হুইচ্-হুইচি-রি-রি-রি এইভাবে চিৎকার শুরু করে দেয় এবং সন্ত্রস্তভাবে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে লাফিয়ে লাফিয়ে এক ঝোপ থেকে আর-এক ঝোপে পালাতে থাকে, পালাবার সময় সমস্তক্ষণ কিন্তু শত্রুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। ওদের আহার্যতালিকায় পড়ে মাকড়শা, কীটপতঙ্গ, ছোটো ছোটো ফল, বীজ, শস্যের দানা এবং ফুলের মধু। মাটি থেকে 2 মিটারের মধ্যেই কাঁটা ঝোপের ভিতরে ঘাস আর শিকড়-বাকড় দিয়ে বেশ দৃঢ়বদ্ধ বাটির মতো আকৃতির বাসা বানায় এরা। এদেরও ডিমের সংখ্যা 3/4টি এবং ডিমের রঙ চক্চকে ফিরোজা নীল। জাঙ্গল্ ব্যাবলার আর বড়ো ধূসর ব্যাবলারদের মতো এদের বাসাতেও 'পাইড ক্রেস্টেড' আর হক কাকুরা এসে ডিমে পেড়ে রেখে যায়। ডিমের রঙ একই রকম বলে এরা কিছুই বুঝতে পারে না।

এদেরই আর-এক নিকট আত্মীয় প্রজাতি **লার্জ গ্রে ব্যাবলার** (T. malcolmi)। এদের রঙ ধূসর বাদামী, কপালের রঙ ধূসর, লেজের বাইরের দিকের পালকগুলি সাদা। ওড়ার সময় যখন লেজটি ছড়িয়ে থাকে তখন এই সাদা রঙ বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। আমাদের দেশের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলগুলিতে এবং বিশেষ করে দক্ষিণভারতে এই প্রজাতিটি যথেষ্ট দেখা যায়।

ওয়ার্বলাররা সবাই প্রায় আকারে চড়াই পাখিদের চেয়েও ছোটো, রঙের বৈচিত্র্যও এদের কম। মোটামুটিভাবে এই দলটির বৈশিষ্ট্য-

গুলি বর্ণনা করা কঠিন। এদের মধ্যে কিছু কিছু প্রজাতি এদেশেরই বাসিন্দা, আবার কিছু আসে অন্য দেশ থেকে। সিল্‌ভিনি (Sylviinae) উপগোষ্ঠীর অন্তর্গত এই পাখিদের মধ্যে সচরাচর যাদের আমরা দেখতে পাই তাদেরই কয়েকটির পরিচয় এবার দেওয়া হচ্ছে।

অ্যাশি রেন ওয়ার্বলার (Prinia socialis) চিত্র নং 83 :

হিন্দীতে— প্রায় সব ওয়ার্বলারকেই বলে ফুট্‌কি।

বাংলায়— এই অ্যাশি রেন ওয়ার্বলারকে অনেকে পাঁশফুটকি বলেন।

এদের পিঠের দিকটা ছাইরঙা স্লেটের মতো, পেটের দিকের রঙ হলদেটে সাদা। ঢিলেঢালা ধাপে ধাপে লম্বা হয়ে যাওয়া লেজটির প্রান্তভাগে আছে পর পর কালো আর সাদার ছোপ। এরা প্রায় সমস্তক্ষণই লেজ নাচায় এবং লেজটি প্রায়ই উঁচু করে তুলে ধরে। শীতকালে এদের পালকে, ছাইরঙের আভাস অনেকটা ফিকে হয়ে, বাদামী রঙ ধারণ করে। প্রচুর জলসিঞ্চিত বড়ো বড়ো বাগান, যেখানে লতাপাতার কুঞ্জবন আর ফুলে ভরা নানা-রকম গাছের কেয়ারী আর বেড়া আছে সেইখানেই এই ছোট্ট পাখিগুলির দেখা পাওয়া যাবে। এরা অবশ্য বিশেষ লাজুক নয়, কিন্তু একটু নিরিবিলিতেই থাকতে ভালোবাসে, ঝোপের আড়ালেই সারাদিন পুচ্ছটি তুলে নাচাতে নাচাতে পোকা খুঁজে বেড়ায় আর মাঝে মাঝে টি-টি-টি করে বেশ তীক্ষ্ণ সুরে ডেকে ওঠে। অবশ্য প্রজনন ঋতুতে পুরুষপাখি খুবই সপ্রতিভ দেখা যায়। প্রায় সর্বক্ষণই সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে গাছের ডালে বা ঝোপের মাথায় বসে বেশ দৃপ্তস্বরে ডাকাডাকি করতে থাকে। এই সময় সে

লেজটি ক্রমাগত ওপরে নিচে নাচাতে নাচাতে ডানা ঝাপটে উত্তেজিত ভাবে উড়ে বেড়ায়, পুরুষ পাখিটির এই ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে ওড়ার ভঙ্গি দেখলে মনে হয় যেন লেজটি ওর দেহের তুলনায় একটু বেশি রকম ভারী হয়ে পড়েছে। হঠাৎ ভয় পেয়ে বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লে সব জাতের ওয়ার্বলাররাই একরকম অদ্ভুত কিট্-কিট্-কিট্ ক'রে শব্দ করে, বিদ্যুতের তারে বা যন্ত্রপাতিতে স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে থাকলে যে-রকম আওয়াজ হয়, এটাও অনেকটা সেই ধরনের শব্দ, মনে হয় ঠোঁট দিয়েই ওরা এই শব্দটা বার করে কিন্তু এই শব্দের উৎস এখনো নিশ্চিত ভাবে জানা যায় নি। এই পাঁশফুটকি পাখির বাসা অনেকটা টুনটুনির বাসার মতো, কতকগুলি পাতা সেলাই করার মতো জুড়ে একটা চোঙার মতো বাসা বানায় ওরা, কিন্তু তেমন সুবিধামত বড়ো পাতা না পেলে গাছের তন্তু দিয়ে লম্বা থলির মতো বাসা বুনে তাতে মাকড়শার জালের সাহায্যে ছোটো ছোটো পাতা সেঁটে বাসাটি মজবুত করে নেয়। মাটি থেকে 1[1] মিটারের মধ্যেই ওদের বাসা দেখা যায়। ডিমের সংখ্যা 3/4টি, ডিমের রঙ চমৎকার চকচকে ইঁটের মতো লাল। আর ডিমের চওড়া দিকটিতে গাঢ় রঙের একটি গোল বেষ্টনীও থাকে।

ভারতীয় রেন ওয়ার্বলারদের (P. subflava) রঙ লালচে মাটির মতো। অ্যাশি ওয়ার্বলারদের রঙ শীতকালে যে-রকম দাঁড়ায়, অনেকটা সেই রকম। তবে অ্যাশি ওয়ার্বলারদের সঙ্গে এদের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে, এদের লেজের প্রান্তে সাদা-কালো ফোঁটা নেই এবং এরা প্রথমোক্তদের চেয়ে বেশি শুষ্ক জায়গায় থাকতে ভালোবাসে।

ওয়ার্বলারদের মধ্যে সবচেয়ে স্বনামধন্য হচ্ছে টৈইলর বার্ড (Orthotomus sutorius), একেই কিপলিং তাঁর বইতে 'দরজী পাখি' নামে অমর করে রেখেছেন। চিত্র নং—84 :

বাংলায় একেই বলে টুনটুনি পাখি। জলপাই-সবুজ রঙের এই চঞ্চল ছোট্ট পাখিটির শরীরের নিচের অংশ সাদা, মাথাটি লালচে, আর খাড়া হয়ে থাকা লেজটির মাঝখানের পালকগুলি কাঁটার মতো সরু ও লম্বা। গ্রামে বা শহরে সর্বত্র ঝোপে ঝাড়ে, বাগানে এদের একা একা বা জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এরা বেশ নির্ভয়ে লোকের বাড়ির বারান্দায় এসে বসে এবং মেঝে থেকে তুলো, সুতোর টুকরো বা অন্যান্য টুকিটাকি মুখে করে তুলে নিয়ে যায় বাসা বানাবার জন্য। বাগানের গাছে লতায় বা ফুলের টবের মধ্যে এরা যখন ঘুরে বেড়ায় তখন খুব কাছে মানুষজন থাকলেও মোটেই ভয় পায় না। শহরতলীর বাগানগুলিতে ওদের উৎফুল্ল উচ্চগ্রামের টুইট্‌-টুইট্‌-টুইট্‌, বা প্রিটি-প্রিটি-প্রিটি ডাক বোধহয় সবচেয়ে বেশি শোনা যায়। অন্য সব ওয়ার্বলারদের মতোই এদেরও প্রধান খাদ্য ছোটো ছোটো কীটপতঙ্গ, তাদের ডিম ও গুটি-পোকা, কিন্তু ওদের সবচেয়ে বেশি পছন্দ ফুলের মধু, তাই লাল ফুলে ভরা শিমূল আর মাদার গাছে সর্বদাই ওদের দেখা পাওয়া যাবে। নভোচারী পাখিদের সমাজে এই টুনটুনি পাখিদের মতো দক্ষ গৃহনির্মাণকারী আর নেই বললেই চলে, এদের 'দরজী পাখি' নামটি সত্যিই সার্থক। এদের বাসাটি আসলে নরম তন্তু, চুল, তুলো, ঘাস পাতা ইত্যাদি দিয়ে গড়া একটি গোল বাটির মতো জিনিস, কিন্তু এটিকে বেষ্টন ক'রে ওরা একটি চওড়া সবুজ পাতাকে মুড়ে ঢাকনার মতো তৈরি করে, পাতার দুটি ধার বাসার সঙ্গে

সেলাই করা থাকে। যদি বড়ো মাপের পাতা না পাওয়া যায় তা হলে একসঙ্গে দু-তিনটি পাতা এইভাবে সেলাই করে ওরা বাসাটিকে তার মধ্যে রাখে। তুলো বা লতার আঁশ সুন্দর করে পাকিয়ে নিয়ে ওরা এই সেলাইয়ের সুতো তৈরি করে নেয়, এবং সেলাইটি মজবুত করার জন্য সুতোর শেষপ্রান্তে গিঁট দিতেও ভোলে না। পাতাবাহার, ডুমুর বা চওড়া পাতাওয়ালা কোনো লতার মধ্যে প্রায়ই ওদের বাসা দেখা যায়, মাটি থেকে মাত্র দু-এক মিটার উঁচুতে বারান্দার টবে রাখা চওড়া পাতাওয়ালা ক্রোটন জাতীয় গাছেও ওদের বাসা দেখা যায়। এদের ডিমের সংখ্যা 3/4টি, ডিমের রঙ লালচে বা নীলচে সাদা, তার ওপর অনেক সময়ই লালচে বাদামী ছিটও দেখা যায়।

ফ্লাইক্যাচারদের একটি উল্লেখযোগ্য উপগোষ্ঠী টারডিনির (Turdinae) অন্তর্গত হচ্ছে থ্রাশ, রবিন্, চাট প্রভৃতি পাখিরা।

ম্যাগ্পাই রবিন (Copsychus saularis) চিত্র নং—85 :

হিন্দী নাম— দাইয়ার বা দাইয়া।

বাংলায় একেই বলা হয়— দোয়েল।

এই পাখিটি প্রায় সবাইকারই পরিচিত। পুরুষ পাখিটি বেশ ছিমছাম সাদায় কালোয় মেশানো, লেজটি প্রায় সর্বদাই উঁচু করে তোলা থাকে, স্ত্রী পাখিদের গায়ে কালোর জায়গায় দেখা যায় বাদামী আর স্লেটের মতো ধূসর রঙ। অগভীর জঙ্গলে এরা একা বা জোড়া বেঁধে ঘোরে, তবে লোকালয়ের আশেপাশেই এদের দেখা পাওয়া যায়। প্রজনন ঋতু ছাড়া অন্যসময়ে পুরুষ পাখিটি নিরিবিলিতে ঝোপঝাড়ের তলায় চুপচাপ বসে থাকতেই ভালোবাসে,

মাঝে মাঝে শুধু সুই-ই, সুই-ই করে ডাকতে বা কর্কশস্বরে চ্র্র্র্ চ্র্-র্র্ করে আওয়াজ করতে শোনা যায়, কিন্তু গরম পড়তে শুরু হলেই পুরুষ দোয়েল তার কণ্ঠস্বর ফিরে পায়, গাইয়ে পাখিদের মধ্যে তখন দোয়েলকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়। উজ্জ্বল ঝকঝকে চেহারা নিয়ে কোনো পত্রশূন্য গাছের শাখায় বা অন্য কোনো উঁচু জায়গায় বসে দোয়েল যখন তার সুরের উৎস খুলে দেয় তখন মনে হয় যেন ওর কণ্ঠ থেকে আনন্দ ঝরে পড়ছে। শ্যামা পাখির সুরের ঐশ্বর্য হয়তো আরো বেশি কিন্তু দোয়েলের গান তার মনের খুশি আর উৎসাহের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। দোয়েল যখন গান গায়, ওর লেজটি থাকে ঝোলানো আর লেজের পালকগুলি ঈষৎ প্রসারিত। গান গাওয়ার সময় ক্রমাগত লেজ নাচায় ওরা, দেখে মনে হয় যেন ঐভাবে গানের সঙ্গে তাল দিয়ে চলেছে। সারাদিন ধরে, এমন-কি সন্ধ্যার পরও অনেক সময় দোয়েলের গান শোনা যায়। নিজেদের এলাকা রক্ষা করার জন্য আর প্রজনন ঋতুতে পুরুষ দোয়েলকে বেশ কলহপ্রিয় হয়ে উঠতে দেখা যায়। সঙ্গিনী এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের সামনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য পুরুষ দোয়েল নানারকম কায়দা ও কসরৎ দেখায়। বুকের পালক হাস্যকরভাবে ফুলিয়ে, লেজটি পূর্ণ প্রসারিত করে খাড়া উঁচুতে তুলে গম্ভীরভাবে পায়চারি করতে থাকে, ঠোঁট উঁচিয়ে রাখে আকাশের দিকে আবার মাঝে মাঝে মাথা নত করে নমস্কারের ভঙ্গিতে। কীটপতঙ্গই যদিও এদের প্রধান খাদ্য কিন্তু ছোটো ছোটো পাকা ফল এবং শিমুল, মাদার প্রভৃতি ফুলের মধুর প্রতিও লোভ ওদের কিছু কম নয়। দেওয়াল বা গাছের গুঁড়ির ফাঁক-ফোকরে, জলনিকাশি নালার পাইপের মুখে বা পরিত্যক্ত ল্যাম্পপোস্টের মাথায় ঘাস,

শিকড়-বাকড়, চুল ইত্যাদি বিছিয়ে ওরা বাসা বাঁধে। ওদের বাসাবাঁধার জন্য সুবিধামত জায়গায় কোনো ছোটো বাক্স রেখে দিলে ওরা খুশি হয়েই সেটা কাজে লাগায়। ডিমের সংখ্যা 3 থেকে 5টি,• ডিমের রঙ ফিকে লালচে সবুজ, তাতে লালচে বাদামীর ছোপও থাকে।

শ্যামা (Copsychus malabaricus)— চিত্র ·নং 86 :

এই পাখিটির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলিকে দাইয়ার বা দোয়েলদের আরণ্যক সংস্করণ বলা যেতে পারে, আর সেইজন্যই শহুরে মানুষ এই পাখিগুলিকে খাঁচায় পুরে পুষতে ভালোবাসে। এদের গানের কদর খুব। এদের শরীবের ওপরের অংশ কালো, পিঠের শেষ প্রান্তে যেখান থেকে লম্বা সাদা-কালো লেজটি বেরিয়েছে সেইখানে একটি সুস্পষ্ট সাদারঙের ছোপ আছে। এদের শরীরের নিচের অংশ লালচে বাদামী। মাঝে মাঝে এই পাখিরা অরণ্যপরিবৃত শৈলাবাসগুলিতেও গিয়ে হাজির হয়। বম্বের কাছে মাথেরান শৈলাবাসে গ্রীষ্মকালে যাঁরা বেড়াতে যান তাঁরা অনেকেই সেখানে শ্যামা পাখির মধুর সংগীতে আনন্দলাভ করে থাকেন।

ম্যাগপাই রবিন বা দোয়েলদের আত্মীয় আর-একটি ছোটোখাটো পাখির নাম **পাইড্ বুশচ্যাট** (Saxicola caprata — চিত্র নং—87 :

হিন্দী নাম— কালা ফিদ্দা।

বাংলাতেও— এদের ফিদ্দা বলা হয়।

. এই পাখিগুলি আকারে চড়াই-এর মতো, পুরুষ পাখিটির রঙ কুচকুচে কালো, শুধু পশ্চাতে, পেটের নিচের অংশে এবং ডানায় উজ্জ্বল সাদা রঙের ছোপ আছে, ডানার সাদা রঙ ওড়ার সময় স্পষ্টভাবে

দেখা যায়। স্ত্রী পাখিটি সাদামাটা মেটে বাদামী রঙের, শুধু পশ্চাদ্দেশে হালকা লালচে ছোপ আছে। এই পাখিদের মধ্যে কেউ কেউ এদেশেরই বাসিন্দা আবার কেউ কেউ শীতের অতিথি। খোলা এবড়োখেবড়ো মাঠে, চাষের জমির আশেপাশে, ঝোপের মাথায় বা নলখাগড়া জাতীয় গাছের ডগায় এই পাখিদের জোড়ায় জোড়ায় বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায়। মাটিতে কোথাও ফড়িং বা পোকা দেখলেই এরা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে আসে। মাঝে মাঝে শূন্যে সোজা ওপর দিকে লাফ দিয়ে বা ফ্লাইক্যাচারদের ভঙ্গিতে আক্রমণ ক'রে এরা উড়ন্ত পতঙ্গও শিকার করে। সাধারণত এরা চেক্-চেক্ করে একটা কর্কশ ডাক ডাকে, কিন্তু ডাকের শেষ দিকটা বেশ নরমভাবে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়, শেষ অংশটা শুনতে লাগে অনেকটা 'টুইট্'— এই ধরনের। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ পাখিটি বেশ মিষ্টি সুরে শিস দেওয়ার মতো গান গায়, এই গান শুনতে অনেকটা ভারতীয় রবিন্‌দের গানের মতো। এই শিসের আরম্ভের সময় চিক্-চিক্ করে দুবার আওয়াজ দেয় ওরা। পূর্বরাগের পালা যখন চলতে থাকে তখনই ওরা এই গান গায়, তবে নিজের এলাকায় কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী এসে প্রবেশ করলে তাকে তাড়াবার জন্য নানারকম ভয় দেখানো অঙ্গভঙ্গি সহযোগেও এইরকম শিস দিয়ে থাকে ওরা। দেওয়াল বা মাটিকাটা খোয়াই জাতীয় জায়গার কোনো ফোকরে ঘাস বিছিয়ে তার মধ্যে নরম চুল বা তুলো ইত্যাদির আস্তরণ দিয়ে এরা বাসা বানায়। ডিমের সংখ্যা 3টি বা 5টি, রঙ ফিকে নীলচে সাদা, তাতে লালচে বাদামীর ছোপ।

কলার্ড বুশচ্যাট (Saxicola torquata) পাখিদের শীতকালে

ক্ষেতখামারে আর লম্বা ঘাসের জঙ্গলে দেখা যায়। পুরুষ পাখির মাথাটি কালো, বুকের রঙ কমলা আর বাদামী মেশানো এবং গলার দুপাশে কলারের মতো সাদা রঙের ছোপ আছে, তা ছাড়া ডানা আর লেজের গোড়াতেও সাদার ছোপ দেখা যায়। স্ত্রী পাখিদের দেখতে অনেকটা 'পাইড্ বুশচ্যাট্'দেরই মতো, শুধু এদের দেহের উপরিভাগের দাগগুলি আরো গাঢ় রঙের।

ভারতীয় রবিন্ (Saxicoloides fulicata) চিত্র নং— 88 :

হিন্দী নাম— কাল্চুরি।

বাংলায়— এদের কোথাও কোথাও কালীশ্যামা বলা হয়।

এটিও থ্রাশ্দের দলেরই পাখি, আমাদের গ্রামাঞ্চলে এরা বেশ সুপরিচিত। খড়ো ঘরের চালে বা পথের পাশের ঝোপের মাথায় বসে লেজ নাচাতে নাচাতে ওরা এদিক-ওদিক তাকায় আর বেশ খুশিভরা স্বরে ডাকাডাকি করে। পুরুষ পাখিটি খুব চঞ্চল, গায়ের রঙ বাদামী আর চকচকে কালো, লেজটি সর্বক্ষণই উঁচু করে রাখে, লেজের তলায় এদের একটি গাঢ় চেস্টনাট বাদামী রঙের ছোপ দেখা যায়। ডানার সাদা রঙের ছোপটি এমনিতে দেখাই যায় না কিন্তু ওড়ার সময় বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ে। স্ত্রী পাখিটি ছাই রঙের, এরও উঁচু করা লেজের তলায় ফিকে বাদামী রঙের ছোপ আছে। এই পাখিগুলি সব সময়েই ছুটোছুটি করে বেড়ায়, কখনো দেখা যায় উইঢিপি নয়তো ঝোপের মাথায় গিয়ে উঠছে আবার পরক্ষণেই দেখা যায় কোনো পোকাকে তাড়া করে নেমে আসছে মাটিতে। অনেক সময় পোকার খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে এরা সোজা বারান্দায় উঠে আসে এবং ঘরের মধ্যেও ঢুকে পড়ে, আশেপাশের লোকজনকে ভ্রূক্ষেপও করে না। কীটপতঙ্গ,

শুঁয়োপোকা ইত্যাদিই রবিনদের প্রধান খাদ্য, উইপোকা খেতেও এরা খুব ভালোবাসে এবং উইঢিপির আশেপাশে প্রায়ই ঘোরাফেরা করে শিকারের আশায়। বেশ উৎসাহ ও আনন্দব্যঞ্জক স্বরে এরা কয়েক রকম ডাক ডাকে। বলা যায়, সেইটাই ওদের গান। পুরুষ পাখিটি পূর্বরাগের পালায় এই ডাক ডাকে, তা ছাড়া নিজের এলাকার মধ্যে অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর অনধিকার প্রবেশ দেখলেও ওরা এইরকম ডাক ডাকতে ডাকতে বুকের পালক ফুলিয়ে সমস্ত শরীর টান করে, লেজটি পিঠের ওপর পেখমের মতো খাড়া করে তুলে রুখে দাঁড়ায়। ভারতীয় রবিন্‌রা ঘাস আর শিকড়-বাকড় দিয়ে বাটির মতো বাসা বানায়, প্রায়ই দেখা যায় ওরা সাপের খোলস এনে বাসা সাজিয়েছে। এরা মাটিকাটা জায়গায় কোনো গর্তে, পচা গাছের গুঁড়ির ফোকরে অথবা পরিত্যক্ত টিন বা মাটির পাত্রের মধ্যে বাসা বাঁধে। ডিমের সংখ্যা 2/3টি, ডিমগুলির রঙ সাদা, তাতে ঘি রঙ বা ফিকে সবুজের সামান্য আভা থাকে তা ছাড়া লালচে বাদামীর ছিটেফোঁটাও থাকে ডিমের গায়ে।

থ্রাশ্‌ উপগোষ্ঠীর মধ্যে বেশ নামকরা গাইয়ে পাখি হচ্ছে **মালাবার হুইস্‌লিং থ্রাশ** (Myiophoneus horsfieldii) চিত্র নং 89 :

হিন্দী ও বাংলা নাম—কস্তুরা।

এগুলি বেশ বড়োসড়ো সুদর্শন নীলচে কালো রঙের থ্রাশ, আকারে ময়না আর পায়রার মাঝামাঝি বলা চলে। এদের কপালে আর ঘাড়ের কাছে আছে চকচকে কোবাল্ট নীল রঙের ছোপ, ঠোঁট এবং পায়ের রঙ কালো। পাহাড়ী নালা আর ঝর্নার ধারের ঘন বন এই পাখিদের প্রিয় জায়গা, লোকালয়ের কাছে বা

লোকালয় থেকে বহু দূরে, দুরকম পরিবেশেই এদের দেখা যায়। প্রজনন ঋতুতে ঊষার প্রথম আলোর আভা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই এই পাখিদের মিষ্টি শিস দেওয়ার সুর শোনা যায়। এদের গান গাওয়ার মধ্যে কোথায় যেন মানুষের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে একটা অদ্ভুত মিল আছে, তা ছাড়া গান গাওয়ার সময় এরা একেবারে উদ্দেশ্যহীনভাবে কখনো উঁচু কখনো নিচু পর্দায় কণ্ঠস্বর ওঠায় নামায়, সেইজন্যই ঠাট্টা করে লোকে এদের বলে "অলস শিস দেওয়া স্কুলের ছেলে"। অন্যসব থ্রাশদের মতো এরাও প্রজনন ঋতু ছাড়া অন্য সময়ে চুপচাপ থাকে, শুধু মাঝে মাঝে এই গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ক্রি-ই-ই করে আওয়াজ দেয়। এই 'হুইস্‌লিং থ্রাশদের' প্রধান খাদ্য জলজ পোকামাকড, শামুক, কাঁকড়া ইত্যাদি। কাঁকড়াগুলিকে ওরা পাথরে আছড়ে খোলা ভেঙে তারপর খায়। পাহাড়ী নদীর তীব্র স্রোতের মধ্যে এই পাখিরা লাফিয়ে লাফিয়ে এক পাথর থেকে আর-এক পাথরে গিয়ে বসে এবং জলের মধ্যে শিকারের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে; শিকার কাছাকাছি দিয়ে ভেসে যাচ্ছে দেখলেই ছোঁ মেরে ধরে ফেলে। লেজটি পাখার মতো করে খুলে এরা সর্বদাই নাচাতে থাকে, ফলে এই লেজের ঝাপটায় তাড়া খেয়ে অনেক সময় পাথরের ফাঁক-ফোকর থে . পোকারা বেরিয়ে আসে। এই পাখিগুলি বাচ্চা অবস্থায় ধরা পড়লে বেশ পোষ মানে, যাঁরা গাইয়ে পাখি পুষতে ভালোবাসেন তাঁদের কাছে এই শিস দেওয়া থ্রাশদের কদর খুব। পাহাড়ী ঝর্নার পাশে বা জলপ্রপাতের পিছনদিকে পাহাড়ের খাঁজ বা ফাটলের মধ্যে শিকড়-বাকড়, শ্যাওলা ঘাস ইত্যাদি দিয়ে বেশ বড়োসড়ো মজবুত বাসা বানায় এরা, বাসার ওপর কাদার প্রলেপ দিয়ে আরো দৃঢ় করা

হয়। এদের ডিমের সংখ্যা 3/4টি, ফিকে হলদে বা পাথুরে-ধূসর রঙের ডিমগুলির ওপর লালচে-বাদামী ও ল্যাভেণ্ডার রঙের ছিট থাকে।

এদেরই নিকটআত্মীয় হিমালয়ান্ হুইস্লিং থ্রাশ (M. temminckii) হিমালয়ের পাদদেশে আসাম ও ব্রহ্মদেশ অঞ্চলে পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত থ্রাশদের সঙ্গে এদের পার্থক্য হচ্ছে, এদের ঠোঁটের রঙ কালো নয়, হলদে। এদের মাথায় আর ঘাড়ে কোবাল্ট নীলের ছোপও নেই।

প্যারিডি (Paridae) গোষ্ঠীর (টিট্) পাখিরা প্রায় সবাই আকারে চড়াই পাখির মতো বা তার চেয়েও ছোটো। এরা সবাই বেশ চঞ্চল, প্রাণশক্তিতে উচ্ছল শাখাচারী পাখি। এদের ঠোঁট ছোটো ও মজবুত এবং কারো কারো মাথায় ছোটো, খাড়া ঝুঁটিও থাকে। হিমালয় অঞ্চলে এই গোষ্ঠীর প্রচুর পাখি দেখা যায়। যে তিনটি প্রজাতি আমাদের দেশে পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় গ্রে টিট্ (Parus major) চিত্র নং 90 :

হিন্দী নাম— রাম গাংরা।

বাংলাতেও এদের রাম গাংরা বলা হয়।

এরা বেশ সপ্রতিভ চটপটে চড়াইয়ের মতো পাখি, মাথায় ঝুঁটি নেই, মাথাটি কুচকুচে কালো, গাল দুটি ঝকঝকে সাদা, পিঠের রঙ ধূসর এবং শরীরের নিচের অংশ সাদা। পেটের ঠিক মাঝখান দিয়ে লম্বালম্বিভাবে একটি চওড়া কালো দাগ টানা আছে। জঙ্গলের গাছে গাছেই এদের দেখা পাওয়া যায়, তবে আর্দ্র চিরহরিৎ অরণ্যে এরা থাকে না। এরা একাও থাকে আবার জোড়া বেঁধে বা

ছোটো ছোটো দল বেঁধে অন্যান্য পতঙ্গভুক পাখিদের সঙ্গেও এদের ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। পাতার ফাঁকে ফাঁকে পোকা খুঁজতে গিয়ে ওরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু সমস্তক্ষণ কিচিরমিচির করে ডেকে পরস্পরের সাড়া নিতে থাকে। পাতার তলায়, ফুলের গর্ভে, গাছের গায়ের প্রতিটি খাঁজে ওরা তন্ন তন্ন করে খাবার খোঁজে। পোকার ডিম এবং পোকা ও পতঙ্গের সন্ধানে ওরা সরু সরু ডালের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে যায়, ফুলে ভরা নরম ডালের প্রান্তে পায়ের নখ আটকে অনেক সময় মাথা নিচু করে ঝুলতে ঝুলতেও শিকার খোঁজে। বাগানের ফল ওরা একটু আধটু ঠুকরে নষ্ট করে বটে কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা আমাদের উপকারী পাখি এটা স্বীকার করতেই হবে, কারণ, ওরা প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে শেষ করে। বাদাম জাতীয় ফল এবং শক্ত খোসাওয়ালা বীজও ওদের খাদ্য, পায়ে চেপে ধরে শক্ত ঠোঁটে ঠুকরে ঠুকরে ওরা বাদামের শক্ত খোলা ভেঙে ভিতরের শাঁস খায়। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ পাখিটি পরিষ্কার শিস দেওয়ার ভঙ্গিতে হুই-চি-চি, হুই-চি-চি করে গান করে। গ্রে টিট বা রামগাংরা পাখি পাথরের ফোকরে বা গাছের গুঁড়ির কোটরে শ্যাওলা, পালক, চুল ইত্যাদি বিছিয়ে বাসা বানায়। এদের ডিমের সংখ্যা 4 থেকে 6টি, রঙ সাদা বা গোলাপি আভাযুক্ত সাদা, তার ওপর লালচে বাদামী ছিট এবং দাগ থাকে।

এদেশে আর-একরকম টিট্ দেখা যায়, এগুলির নাম **ইয়েলো চিক্‌ড্ টিট** (Parus xanthogenys)। এগুলি বেশ সুশ্রী কালোয় হলুদে মেশানো পাখি, এদের মাথায় কালো রঙের সূচালো ঝুঁটি থাকে। শরীরের নিচের অংশ হলদে এবং গলা

থেকে পেটের মাঝখান দিয়ে লম্বা একটি কালো দাগ আছে। গ্রে টিট্‌রা যে-সব জায়গায় থাকে এদেরও সেই-সব অঞ্চলে দেখা যায়, তবে আরো বেশি আর্দ্র অঞ্চলেও এরা একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়।

সিট্টিডি (Sittidae) গোষ্ঠীর নাটহ্যাচ্‌ পাখিরা গাছের ডালে এবং খাড়া পাহাড়ের গায়ে থাকতে ভালোবাসে। ওরা সমস্ত শরীরে ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে, পোকা আর মাকড়শার খোঁজে গাছের ডালে ডালে আর পাথরের খাঁজে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। এদের লেজ ছোটো ও চৌকো ধরনের এবং ঠোঁট কাঠঠোকরাদের মতো লম্বা। ভারতের সর্বত্র এবং বাংলাদেশে এদের যে প্রজাতিটি দেখা যায় সেটির নাম **চেস্টনাট বেলিড্‌ নাটহ্যাচ্‌** (Sitta castanea) চিত্র নং—91 :

হিন্দী নাম— সিরি বা কাঠফোড়িয়া।

বাংলায় এদের বলে— চোরপাখি।

আকারে এগুলি চড়াইয়ের চেয়ে ছোটো, পিঠের রঙ স্লেটের মতো নীলাভ, শরীরের নিচের অংশ গাঢ় চেস্টনাট বাদামী, ঠোঁটটি লম্বা এবং সূচালো। স্ত্রীপাখিদের শরীরের নিচের অংশের রঙ পুরুষ-পাখিদের চেয়ে ফিকে। অগভীর জঙ্গলে গাছের গুঁড়িতে এবং ডালে এদের ইঁদুরের মতো বিচরণ করে বেড়াতে দেখা যায়, এরা একাও ঘোরে আবার জোড়ায় জোড়ায়ও থাকে, তবে জোড়ার দুটি পাখিকে একটু দূরে দূরে বিচরণ করতেই দেখা যায়। গ্রামের আশেপাশের আমবাগান এবং অন্যান্য বড়ো বড়ো গাছের বাগান বা হাল্কাধরনের বনই এই পাখিদের প্রিয় জায়গা। এদের খাওয়া-

দাওয়ার অভ্যাস অনেকটা টিট্ আর কাঠঠোকরাদের মতোই। টিটদের মতো ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে ওরা গাছের গুঁড়ি ও ডাল বরাবর ওঠানামা ক'রে প্রতিটি ফাঁক-ফোকরে পোকা খুঁজে বেড়ায় আর কাঠঠোকরাদের মতো গাছের গায়ে ঠোঁট দিয়ে ঠোকর মেরে মেরে পোকাদের আস্তানা থেকে টেনে বার করে। এইভাবে পোকার সন্ধানে ওরা অনেক সময় ডালের নিচের দিকে পা আটকে ঝুলতে ঝুলতে এমন দ্রুতগতিতে ডালের শেষ পর্যন্ত চলে যায় যে দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। কীটপতঙ্গ, তাদের ডিম, গুটি ইত্যাদি এবং মাকড়শা এদের প্রধান খাদ্য, তবে টিট্দের মতো এরা বাদাম এবং অন্যান্য শক্ত খোলাওয়ালা বন্যফলের বীজও খায়। গাছের ডালের খাঁজে বাদাম বা বীজটিকে শক্ত করে চেপে ধরে, ধারালো ঠোঁট দিয়ে হাতুড়ির মতো ঠুকে ঠুকে ওপরের শক্ত খোলা ভেঙে ভিতরেব শাঁসটি খেয়ে ফেলে। সাধারণত ওরা ইঁদুরের মতো মিহিসুরে কিঁচ্কিঁচ্ করে ডাকে, তবে মাঝে মাঝে ওদের বেশ মিষ্টি শিসদেওয়ার মতো সুরে চিপ্-চিপ্ করেও ডাকতে শোনা যায়। প্রজনন ঋতুতে ওরা জোড় বেঁধে থাকে কিন্তু অন্য সময়ে ছোটো ছোটো দলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঘুরে বেড়ায়, জঙ্গলে টিট্ এবং অন্যান্য পতঙ্গভুক পাখিদেব সঙ্গেই এদেরও শিকার খুঁজে বেড়াতে দেখা যায়। নাটহ্যাচ্রা গাছেব কোটর বা বারবেটদের তৈরি গর্তে পাতা, পশম, শ্যাওলা ইত্যাদি বিছিয়ে তার ওপর ডিম পাড়ে, যাওয়া-আসার জন্য একটি ছোট্ট গোল ফুটো রেখে বাসার বাকি মুখটা কাদা দিয়ে এরা বুজিয়ে দেয়। এদের ডিমের সংখ্যা 2 থেকে 6টি, ডিমের রঙ সাদা, তাতে লালের ছিট থাকে।

মটাসিলিডি (Motacillidae) গোষ্ঠীর (পিপেট ও ওয়াগ্‌টেল) পাখিরা দেখতে ছিপছিপে, সুশ্রী এবং লম্বা লেজ-বিশিষ্ট। মাঠ বা জলাজমির ওপর পোকামাকড়ের খোঁজে এরা যখন ছুটে বেড়ায় তখন সর্বদাই লেজ নাচায়। এদের মধ্যে অধিকাংশ প্রজাতিই আমাদের দেশে আসে শীতের অতিথিরূপে সুদূর মেরু অঞ্চল থেকে। এই মরশুমী পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত সাদা ওয়াগ্‌ টেল (Motacilla alba)। হিন্দী নাম ধোবাঁ বা খঞ্জন। এরা আকারে চড়াই পাখির সমান, তবে আরো রোগা এবং লেজটিও বেশি লম্বা। এদের শরীরের ওপরের অংশ ধূসর ও নিচের অংশ সাদা, শীতকালে গলার পালকের কালচে রঙ অনেকটা ফিকে হয়ে আসে এবং চিবুক আর গলার রঙও পেটের মতোই সাদা হয়ে যায়। এদের একা একা বা দুটি তিনটি করে ইতস্তত বিচ্ছিন্নভাবে পোকা খুঁজে বেড়াতে দেখা যায়। সর্বক্ষণই লেজ নাচিয়ে নাচিয়ে ওরা একবার এদিকে একবার ওদিকে পোকার সন্ধানে ছুটোছুটি করে। মাঝে মাঝে শূন্যে লাফ দিয়েও পতঙ্গ ধরার চেষ্টা করে। খোলা মাঠ, পড়োজমি বা চষা ক্ষেতে ওদের দেখা পাওয়া যায়। তবে শহরের মধ্যে গল্‌ফ্‌ খেলার মাঠে বা যে-কোনো ময়দানে যেখানে ক্রিকেট বা অন্য কিছু খেলাধুলা চলছে তার মধ্যেও ওদের নির্ভয়ে পোকা খুঁজে বেড়াতে দেখা যায়। এই গোষ্ঠীর সব পাখিদের মতোই এরাও ওড়ার সময়, পর্যায়ক্রমে একবার দ্রুত পক্ষসঞ্চালন করে কিছুক্ষণ, তারপর ডানা বন্ধ করে, আবার একটুপরেই পক্ষসঞ্চালন আরম্ভ করে, এইজন্য এদের ওড়ার ভঙ্গিও মসৃণ নয়, একটু এবড়ো-খেবড়ো। ওড়ার সময় এরা চি-চিপ, চি-চিপ করে ডাক দেয়। রাত্রে এই পাখিরা ঝাঁক বেঁধে

বড়ো গাছের শাখায় বা নলখাগড়া আর আখের ক্ষেতে আশ্রয় নেয়। আমাদের দেশে শীতের অতিথি এই ওয়াগটেলরা বেশির ভাগই ডিম পাড়ে সুদূর উত্তরাঞ্চলে, আমাদের সীমানার বাইরে। তবে সাদা ওয়াগটেলদের একটি জাত কাশ্মীরে ডিম পাড়ে। ঘাস, পশম আর শিকড়বাকড় দিয়ে এরা বাটির মতো বাসা বানায়। পাথরের আড়ালে, ঝোপের নিচে বা উৎপাটিত বড়ো গাছের শিকড়ের ফাঁকে এদের বাসা দেখা যায়। সাধারণত নদীর ধারে, বা নদীর মাঝখানে ছোট্ট দ্বীপের মতো চড়ায় এরা বাসা বাঁধতে ভালোবাসে। ডিমের সংখ্যা 4 থেকে 6টি, ডিমগুলি সাদা, তাতে লালচে বাদামীর ফোঁটা থাকে।

ধূসর ওয়াগ্‌টেল (Motacilla caspica) চিত্র নং 92 (উপরে) : বাংলায় খঞ্জন। উপমহাদেশের আরণ্য অঞ্চলগুলিতে শীতকালে এই প্রজাতিটি প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। জঙ্গলেব মধ্যে পাহাড়ী নদী আর ঝর্নার ধারে বা পার্বত্য পথের পাশের নালা দিয়ে যখন বৃষ্টির জল বয়ে যায়, তারই আশেপাশে এদের একা একা ছুটে বেড়াতে দেখা যায় অনেক সময়ে। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ পাখিটির চিবুক, গলা আর বুকে কালো ছোপ দেখা দেয়, (ছবিতে যেমন দেখা যাচ্ছে) কিন্তু শীতকালে ওরা যখন এদেশে আসে তখন ী ও পুরুষ দুই পাখিরই চেহারা একইরকম। এদের আচার-আচরণও অন্য সব খঞ্জনদের মতোই। পুরুষ পাখিরা প্রজনন ঋতুতে বেশ সুন্দর গান গায়। আমাদের সবচেয়ে কাছাকাছি এদের জন্মস্থান কাশ্মীর ও পশ্চিম হিমালয়। এদের বাসা বাঁধার প্রণালী এবং বাসার পরিবেশ সাদা খঞ্জনদের মতোই। ডিমের সংখ্যা 4 থেকে 6, ডিমগুলি হলদেটে ধূসর বা ঈষৎ সবুজ, তাতে লালচে বাদামী দাগ থাকে।

আরও কয়েক রকম ধূসর ও হলুদ খঞ্জন (M. flava) শীতকালে এদেশে আসে। তবে তাদের শীতকালীন পালক দেখে প্রত্যেকটি প্রজাতিকে আলাদা করে চেনা মুস্কিল। তবে গ্রীষ্মের মুখে, যখন ওরা জন্মভূমিতে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় তখন ওদের পালকের রঙও বদলাতে শুরু করে, সেই সময় ওদের চেনা সহজ।

খঞ্জনদের একমাত্র প্রজাতি যেটি ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা তার নাম **লার্জ পাইড্ ওয়াগ্‌টেল** (M. maderaspatensis), চিত্র নং—92 (নিচের ছবি) : এগুলি অন্যসব খঞ্জনদের চেয়ে আকারে বড়ো, প্রায় বুলবুলদের মাপের। দোয়েলের মতো এদেরও পালকের রঙ পিঠের দিকে কালো ও নিচের দিকে সাদা। কিন্তু এদের চোখের ওপর ভ্রূর জায়গায় পরিষ্কার সাদা রেখা আছে এবং এরা লেজ উঁচিয়ে ঘোরে না। ঝিল বা পুকুরের ধারে এই খঞ্জনদের জোড়ায় জোড়ায় ঘুরতে দেখা যায়, খরস্রোতা পাহাড়ীনদীও এদের খুব পছন্দ। এই পাখিরা মোটেই লাজুক নয়। মানুষ দেখে ওরা ভয় পায় না। বাড়ির ছাদে বা জলের ঘাটে ধোবা যেখানে কাপড় ধুচ্ছে তারই আশেপাশে ওদের নির্ভয়ে ঘুরতে দেখা যায়। এরা বেশ সুন্দর শিস দেওয়ার মতো করে কয়েক রকম ডাক ডাকে, তা ছাড়া, প্রজনন ঋতুতে পুরুষ পাখি উঁচু পাথর বা বাড়ির ছাদের ওপর বসে মিষ্টিসুরে গান গায়, এদের গানের সঙ্গে দোয়েলের গানের মিল আছে। দেওয়ালের গর্তে বা কোনো বেরিয়ে-আসা পাথরের তলার খাঁজে, ছাদের কড়িকাঠের ফাঁকে, অথবা নদীনালার ওপরের সেতুর নিচের থামের খাঁজে এই পাখিরা চুল, শুষ্ক শ্যাওলা, পরিত্যক্ত পশম, শিকড়-বাকড় ইত্যাদি দিয়ে বাটির মতো বাসা

বানায়। যেখানেই হোক বাসার কাছাকাছি জল ওদের চাইই। সাধারণত এদের ডিমের সংখ্যা 3/4টি ডিমগুলির রঙ ধূসর, বাদামী বা সবুজাভ সাদা তার ওপর ফিকে বা গাঢ় বাদামী দাগও থাকে।

পিপিটরা খঞ্জনদেরই গোষ্ঠীভুক্ত, আকারে এবং আচার-ব্যবহারেও খঞ্জনদের সঙ্গে এদের যথেষ্ট মিল আছে। তবে রঙ এদের সাদা-মাটা বাদামী, অনেকটা ল'র্কদের মতো অবশ্য লার্কদের চেয়ে এরা পাতলা এবং লম্বা গড়নের, লেজটিও এদের বেশি লম্বা। আকৃতি, রঙ আর বাসস্থান দেখে এদের মধ্যে কোনো কোনো প্রজাতিকে চেনা সহজ, অন্যগুলির পরস্পরের মধ্যে মিল এত বেশি যে ওদের দূর থেকে আলাদা করে চেনা কঠিন। এদের বেশির ভাগ প্রজাতিই এদেশে শীতের অতিথি। যে যাযাবর পিপিটদের আমরা সবচেয়ে বেশি দেখতে পাই তার নাম **ট্রি পিপিট** (Anthus trivialis), চিত্র নং—93 :

হিন্দি নাম— রুগেল বা চাব্‌চারি।

বাংলায় এদের শাখা বগেরী বলা হয়।

এগুলির রঙ স্ত্রী চড়াই পাখিদেব মতো, কিন্তু এরা চড়াই-এর চেয়ে রোগা, ঠোঁট আরও সরু এবং লেজও বেশি লম্বা লেজের বাইরেব দিকেব পালকগুলি সাদা, যখন উড়তে উড়তে ওরা মাটিতে নামবার উপক্রম করে তখন ঐ সাদা পালক ভালোভাবে দেখা যায়। শরীরের ওপবের অংশে বালির মতো বাদামীরঙের ওপব কালো কালো দাগ আছে। এদের চোখেব ওপর ভ্রূর অস্পষ্ট আভাস নজরে পড়ে।

শরীরেব নিচের অংশ হলদেটে সাদা, বুকের ওপরও ...

কালো কালো দাগ আছে। শীতকালে ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র পত্রবিরল অরণ্যে, আমবাগানে, গ্রামের আশেপাশের গাছ-পালায় এই পাখিদের দেখতে পাওয়া যায়। এরা খোলা জায়গার চেয়ে গাছের ছায়ায় বসে খেতে ভালোবাসে, এই অভ্যাসটি দেখেই এদের অন্যসব পিপিটদের থেকে আলাদা করে চেনা যায়। মাটিতে চুপ করে বসে থাকলে শুষ্ক ঝরা পাতার সঙ্গে ওদের রঙ এমনভাবে মিশে যায় যে নড়াচড়া না করা পর্যন্ত ওদের অস্তিত্বই টের পাওয়া যায় না। এরা মাটির ওপর নিঃশব্দে হাঁটাচলা করে এবং কীটপতঙ্গ দেখতে পেলেই খুঁটে মুখে তুলে নেয়। কীট-পতঙ্গই ওদের প্রধান আহার্য। হঠাৎ তাড়া খেলে এরা কাছাকাছি গাছে উড়ে গিয়ে বসে কিন্তু নিরাপদ বোধ করলেই আবার মাটিতে নেমে আসে খাবারের সন্ধানে। ওড়ার সময় এরা ট্সিপ্ ট্সিপ্ করে ক্ষীণস্বরে ডাকে। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ পাখি অবশ্য উড়ন্ত অবস্থায় বেশ মিষ্টিগান গায়, কিন্তু সে গান অমরা শুনতে পাই না কারণ ঐ সময় ওরা থাকে সুদূর উত্তরাঞ্চলে, ওদের জন্মভূমিতে।

পিপিটদের মধ্যে একমাত্র প্রজাতি যেটি আমাদের দেশের স্থায়ী বাসিন্দা তার নাম **ভারতীয় পিপিট** (A. novaeseelan-diae)। ভারতীয় উপমহাদেশের বহু অঞ্চলে এদের দেখা যায় এবং সাধারণত এরা ডিম পাড়ে সমতল ক্ষেত্রেই। খোলা মাঠ, প'ড়ো জমি বা গ্রামের চারণভূমিতে এই পাখিদের একা বা দু-চারটি পাখিকে বিচ্ছিন্নভাবে ছুটোছুটি করে বেড়াতে দেখা যায়, ঘোরাঘুরি করার সময় ওরা লেজটি ধীরে ধীরে ওপরে-নিচে নাচায়। ওড়ার সময় ওরা পিপিট-পিপিট করে ডাকে, তবে খুবই ক্ষীণস্বরে। প্রজনন ঋতুতে পুরুষপাখিটি কয়েক মিটার উর্ধ্বে উঠে

চক্রাকারে খানিকক্ষণ ওড়ে আবার একটু পরেই মাটিতে নেমে আসে, ওড়ার সময় মৃদুস্বরে গানও করে। এই ভারতীয় পিপিটরা মাটিতে, ঢিপি বা ঝোপের আড়ালে অথবা গোরুমহিষের পায়ের চাপে নরম মাটিতে যে গর্ত হয় তারই মধ্যে অগভীর বাটির মতো বাসা বানায়, ঘাস, চুল পাতলা শিকড় এই-সব এদের বাসার উপকরণ। ডিমের সংখ্যা 3/4টি, রঙ হলদেটে সাদা বা ধূসরাভ সাদা, তাতে এলোমেলোভাবে বাদামী ছিটও থাকে, ডিমের চওড়া দিকটিতেই এই ছিট থাকে বেশি পরিমাণে।

ডিকেইড়ি (Dicaeidae) গোষ্ঠীর অন্তর্গত ফুলচুষীরা ছোট্ট, চঞ্চল, শাখাচারী পাখি, এদের লেজ ছোটো এবং ঠোঁটের গড়ন সরু ও বাঁকানো, ফুলের ভিতর থেকে মধু চুষে খাবার ঠিক উপযুক্ত। ভারত ও বাংলাদেশে এদের যে প্রজাতিটিকে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় সেটির নাম **টিকেলস্ ফ্লাওয়ার পেকার** (Dicaeum erythrorhynhos) চিত্র নং—94 :

হিন্দীতে— সব ফ্লাওয়ার পেকারকেই বলে 'ফুলচুকি'।

বাংলায় বলে—'ফুলচুষী'।

জলপাই-সবুজ আর ধূসরে মেশানো এই ছটফটে পাখিগুলি আকারে চড়াইদের চেয়ে অনেক ছোটো। এরাই সম্ভবত ভারতের ক্ষুদ্রতম পাখি। এরা দেখতে অনেকটা স্ত্রী 'সানবার্ড'দের মতো, কিন্তু এদের ঠোঁট আরো ছোটো এবং কাঁচামাংসের রঙের। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এরা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ফুলের মধু আর ছোটো ছোটো ফলের ওপর, বিশেষ করে মিস্‌লটো (লোরান্থাস ও ভিস্‌কাম্) পরগাছা জাতীয় যে-সব উদ্ভিদ অন্য গাছের পক্ষে

ক্ষতিকর সেই-সব উদ্ভিদের ফলই এরা বেশি খায়। এই পরগাছা জাতীয় উদ্ভিদগুলিকে হিন্দীতে বলা হয় 'বান্ধা'। লোরান্থাস পরগাছার ফুল থেকে মধু খেতে গিয়ে এই পাখিরা ঐ-সব ফুলে পরাগযোগ ঘটিয়ে থাকে। লোরান্থাস ও ভিস্কাম দু রকম পর-গাছারই পাকা ফল এরা আস্ত গিলে ফেলে, অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্য কোনো গাছের ডালে বসে এরা বিষ্ঠার সঙ্গে ঐ-সব ফলের চটচটে ছোটো ছোটো বিচিগুলি বার করে দেয়, ফলে সেই গাছ অল্পদিনেই ঐ পরগাছার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এই ফুলচুষী পাখিদের আহার সংগ্রহের নিজস্ব এলাকা থাকে এবং এই এলাকার মধ্যেই একটির পর একটি গাছ এদের কৃপায় পরগাছার কবলে পড়ে। ওড়ার সময় এবং পরগাছার স্তূপের মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ানোর সময় এই পাখিরা চিক্ চিক্ করে একটানা ডেকে যায়, মাঝে মাঝে অবশ্য ক্ষীণস্বরে কিচির মিচির করে এদের গান গাইতেও শোনা যায়। মাটির 3 থেকে 10 মিটারের মধ্যে কোনো সরু ডালে এদের ডিম্বাকৃতি থলির মতো বাসা ঝুলতে দেখা যায়, নরম তন্তু দিয়ে গড়া এই বাসাগুলি সানবার্ডদের বাসার চেয়ে ছোটো এবং আরও পরিচ্ছন্ন, বাসার রঙ গোলাপি বাদামী ওবং বুননি মখমলের মতো নরম। সানবার্ডদের বাসার মতো এদের বাসার বাইরে আবর্জনা ঝুলতে দেখা যায় না। ডিমের সংখ্যা সাধারণত 2টি এবং ডিমের রঙ সাদা, তাতে কোনো রকম ছিট থাকে না।

থিক্‌বিলড্ ফ্লাওয়ার পেকার-রা (D. agile) চেহারায় ও আচার-আচরণে অনেকটা 'টিকেলস্ ফ্লাওয়ার পেকার'দের মতোই, শুধু এদের শরীরের নিচের অংশ ফিকে বাদামী রঙের দাগে বোঝাই

এবং ঠোঁট অনেকটা ফিঞ্চদের মতো। মোটা নীলচে কাঁটার মতো ঠোঁটই এদের বৈশিষ্ট্য।

নেকটারিনিডি (Nectariniidae) গোষ্ঠীর ছোট্ট, উজ্জ্বল ধাতুর মতো রঙের সানবার্ড ও হানি সাকার পাখিরা অনেকটা ফুলচুষীদের মতোই দেখতে, কিন্তু এদের ঠোঁট আরো সরু এবং লম্বা, আর জিভও ফুলের গর্ভ থেকে মধু টেনে বার করবার জন্য বিশেষভাবে গঠিত।

এই জাতের সুপরিচিত উদাহরণ **পার্পল বা বেগুনি সানবার্ড** (Nectarinia asiatica) চিত্র নং 95 :

হিন্দীতে- সব সানবার্ডদেরই বলে শক্করখোরা।

বাংলায় এদের মৌচুষী, মধুকুয়া, দুর্গাটুনটুনি প্রভৃতি নামে ডাকা হয়। এই পাখিগুলি আকারে চড়াই-এর চেয়ে ছোটো। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ পাখিটির পালকের রঙ কুচকুচে কালো, তার ওপর উজ্জ্বল ধাতব সবুজ আর বেগুনির আভা খেলতে থাকে তা ছাড়া ডানার তলায় দেখা দেয় কমলা-লাল রঙের পালক। অন্য সময়ে স্ত্রী আর পুরুষ সানবার্ডের চেহারায় বিশেষ প্রভেদ নেই। স্ত্রী পাখিদের রঙ পিঠের দিকে জলপাই-বাদামী, পেটের দিকে ফ্যাকাশে হলুদ। প্রজনন ঋতু ছাড়া পুরুষ পাখিদেরও রঙ ঐ রকমই কিন্তু তাদের ডানা কালো এবং বুকের মাঝখান দিয়ে একটি চওড়া কালো দাগ নিচের দিকে নেমে গেছে। এরা সাধারণত জোড়া বেঁধেই থাকে, সব সময়ই দেখা যায় এরা চঞ্চলভাবে এ ফুল থেকে ও ফুলে উড়ে বসেছে এবং বেঁকে চুরে মাথা নিচু দিকে ঝুলিয়ে নানা ভঙ্গিমায় ফুলের ভিতর থেকে মধু

টেনে বার করতে ব্যস্ত। মধুই এদের প্রধান খাদ্য। তবে মাঝে মাঝে পুষ্পিত বৃক্ষশাখার সামনে ওরা প্রজাপতির মতো উড়তে থাকে আর ফুলের ওপর থেকে ছোট্ট মাকড়শা বা পতঙ্গ দেখলেই ধরে খায়। নতুন জগৎ বা আমেরিকার হামিং বার্ডদেরও এই ধরনের অভ্যাস আছে। এরা খুব হ্রস্বস্বরে উইচ্-উইচ্ করে ডাকতে ডাকতে ফুলে ভরা ডালে ডালে উড়ে বেড়ায়। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ সানবার্ড, পত্রহীন বৃক্ষচূড়ায় বা টেলিগ্রাফের তারের ওপর খোলামেলা জায়গায় বসে উত্তেজিতভাবে গান গায় আর ডাইনে বাঁয়ে দুলতে থাকে, চঞ্চলভাবে বার বার ডানা উঠিয়ে নামিয়ে 'বগলের' কাছের লাল টুকটুকে পালকের বাহার দেখাবার চেষ্টা করে এবং লেজটি একবার প্রসারিত করেই আবার বন্ধ করে। এরা এই সময়ে পরম উৎসাহে গান গায় বটে তবে গানের আওয়াজটা খুব সুরেলা নয়, একটু ক্যারকেরে চিউইট্-চিউইট-চিউইট এই ধরনের ডাক ওরা বার বার পুনরাবৃত্তি করে চলে। সব সানবার্ডদেরই বাসার চেহারা একই রকম— ঝুলন্ত লম্বা গড়নের থলির মতো। নরম ঘাস, নানারকম আবর্জনা, গাছের ছালের টুকরো, মাকড়শার জাল ইত্যাদি দিয়ে বাসাটি তৈরি করা হয়, মাটি থেকে 3 মিটারের মধ্যেই কোনো ঝোপের ডালে বাসাটি ঝুলতে দেখা যায়। এদের ডিমের সংখ্যা 2টি বা 3টি, রঙ ধূসরাভ অথবা সবুজাভ সাদা তাতে বাদামী ও ধূসরের ছিট থাকে।

এই উপমহাদেশের সমতলভূমিতে সানবার্ডদের আর-একটি প্রজাতিও দেখা যায়, এটিকে বলা হয় পার্‌প্‌ল্ র‍্যাম্পড্ সানবার্ড (N. zeylonica)। * এদের পুরুষ পাখির মাথা, বুক এবং শরীরের

চিত্র 87
ফিন্দা
(পাইড্ বুশচ্যাট)
(Saxicola caprata)
দ্রষ্টব্য পৃঃ 191
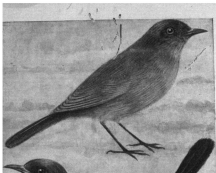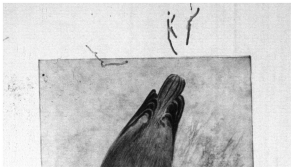
চিত্র 92
খঞ্জন
(গ্রে ওয়াগটেল ও লার্জ পাইড ওয়াগটেল)
(*Motacilla caspica*)
&
(*Motacilla maderaspatensis*)
দ্রষ্টব্য পৃঃ 201-202
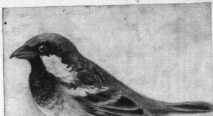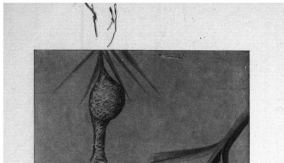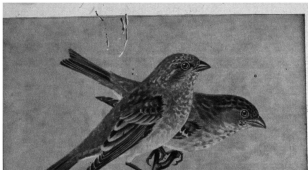
ওপরের অংশ চকচকে ধাতব-সবুজ, লাল এবং বেগুনি আর পশ্চাদ্দেশের রঙ নীলচে বেগুনি। শরীরের নিচের অংশ উজ্জ্বল হলুদ রঙের। স্ত্রী পাখিকে বেগুনি সানবার্ডদের স্ত্রীপাখির মতোই দেখতে শুধু এদের চিবুক আর গলা ধূসরাভ সাদা এবং শরীরের নিচের অংশের হলদে রঙ আরো উজ্জ্বল।

ফ্লাওয়ার পেকার এবং সানবার্ডদের নিকট আত্মীয় আর-একটি গোষ্ঠীর নাম জোস্টারোপিডি (Zosteropidae)। এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত সুন্দর ছোট্ট পাখি হোয়াইট আই (Zosterops palpebrosa), চিত্র নং 96 :

হিন্দী নাম— বাবুনা।

বাংলায়ও বাবুনাই বলা হয়।

ছোটো চৌকোণা লেজবিশিষ্ট এই পাখিগুলির গায়ের রঙ সবুজাভ হলুদ এবং উজ্জ্বল হলুদে মেশানো ; এদের চোখের চারিদিকে একটি গোলাকার সাদারঙের বেষ্টনী আছে, এটির জন্য অনেকে একে চশমা পাখি বলেন। এই পাখিদের ঠোঁট সরু, সূচালো এবং ঈষৎ বাঁকানো। বাগানে এবং জঙ্গলে এদের দল বেঁধে ঘুরতে দেখা যায়, এক-একটি দলে 5 থেকে 20টি পর্যন্ত পাখি থাকে কখনো কখনো এর চেয়ে বড়ো দলও চোখে পড়ে। বাবুনারা সম্পূর্ণভাবে শাখাচারী পাখি, সমস্তক্ষণই ওরা গাছের ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে এবং ঝোপঝাড়ের মধ্যে পোকা খুঁজে বেড়ায়, গাছের সরু ডালে ঝুলতে ঝুলতে প্রত্যেকটি পাতা, ফুল, কুঁড়ি ইত্যাদি তন্ন তন্ন করে দেখে মাকড়শা, পোকা ইত্যাদি খুঁজে বার করে। তা ছাড়া পাকাফলের শাঁস, কুলজাতীয় ছোটো ফল এবং নানারকম ফুলের

মধুও এদের খাদ্যতালিকায় পড়ে। ফুলের মধু খেতে গিয়ে এই পাখিরা বিভিন্ন ফুলে পরাগযোগের কাজটি ভালোভাবেই করে থাকে। পাতার ফাঁকে লাফিয়ে বেড়াবার সময় সর্বক্ষণই মৃদুকণ্ঠে ওরা কিচিরমিচির করে ডেকে চলে। বাসা বাঁধার সময় এলে ওদের দল ভেঙে যায়। পুরুষ বাবুনা তখন টুং টাং ঘণ্টাধ্বনির মতো মিষ্টিসুরের গান গায়, হিমালয়ের নীলচে ফ্লাইক্যাচারদের গানের সঙ্গে এদের গানের কিছুটা মিল আছে। ওরা গান শুরু করে এত মৃদুকণ্ঠে যে প্রথমটা প্রায় শোনাই যায় না, ধীরে ধীরে স্বর উচ্চ গ্রামে তারপর 3-4 সেকেণ্ডের মধ্যেই আবার মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে মিলিয়ে যায়। এই পাখিরা সহজেই পোষ মানে এবং খাঁচায় বন্দী হয়েও বেশ খোশমেজাজেই থাকে। তন্তু দিয়ে গড়া ছোট্ট বাসাটির চারদিকে এরা মাকড়শার জালের প্রলেপ দেয়, এদের বাসা দেখতে অনেকটা ছোটো মাপের ওরিওলের বাসার মতো, আর ওরিওলদের মতোই এরা দ্বিধাবিভক্ত সরু ডালের প্রান্তে দোলনার মতো বাসা বানায়। মাটির 2 থেকে 3 মিটার উচ্চতায় ঝোপ বা ছোটো গাছের ডালে এদের বাসা দেখা যায়। ডিমের সংখ্যা 2/3টি, রঙ সুন্দর ফিকে নীল, তাতে কোনোরকম ছিট থাকে না তবে কখনো কখনো ডিমের চওড়া দিকটিতে নীলরঙ একটু বেশি গাঢ় হয়।

চড়াই এবং বাবুই পাখিরা প্লোসেডি (Ploceidae) গোষ্ঠীর অন্তর্গত। যাঁরা পাখিদের সম্বন্ধে কোনোই খোঁজ রাখেন না তাঁরাও এই পাখি দুটিকে নিশ্চয় চেনেন।

হাউস স্প্যারো (Passer domesticus), চিত্র নং 97 :

এরাই আমাদের ঘরোয়া চড়াই পাখি।

হিন্দীতে বলে গৌরাইয়া।

বর্তমানে প্রায় সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়েছে চড়াই পাখিরা। এদের স্ত্রীপাখিটি পুরুষ পাখির চেয়ে কিছুটা আলাদা দেখতে। স্ত্রী চড়াই-এর দেহের রঙ মেটে বাদামী, তার ওপর পিঠের দিকে কালচে এবং ফিকে হলুদ দাগ আছে, নিচের দিকের রঙ সাদাটে। পার্বত্য অঞ্চলে বা সমতলভূমিতে, ঘন বসতি আর হট্টগোলে ভরা শহরে বা শান্ত ছায়াঘেরা গ্রামে, যেখানেই মানুষ আছে সেখানেই চড়াই পাখিও হাজির। যখন কোনো সুদূর দুর্গম অঞ্চলে মানুষ গিয়ে প্রথম বসতি স্থাপন করে তখন পাখিদের মধ্যে চড়াইই বোধ হয় সবচেয়ে আগে গিয়ে হাজির হয়, নতুন আবহাওয়া আর পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে ওদের একটুও সময় লাগে না। শীতকালে এরা বড়ো বড়ো ঝাঁক বেঁধে ফসলের দানা খেতে চাষের জমিতে আসে। মাটিতে পড়ে থাকা ফসলের দানাই সাধারণত ওরা খায় কিন্তু কখনো কখনো বিরাট দল বেঁধে ক্ষেতের গম বা অন্য পাকা ফসলও এরা গাছ থেকেই খেতে শুরু করে এবং তার ফলে কৃষিক্ষেত্রের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ঘোড়া বা গোরু-বাছুরের বিষ্ঠার মধ্যে থেকেও চড়াই পাখিরা হজম না হওয়া শস্যের দানা খুঁটে খায়, কাজেই ঘোড়া বা গোরু-মহিষের আস্তানার আশেপাশে প্রচুর চড়াই দেখা যায়। সব্জী বাগানে সব্জীর চারা এবং ফুলের কুঁড়ি ইত্যাদিও এরা খেয়ে শেষ করে তাই গৃহস্থ এদের বিশেষ পছন্দ করে না। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও এরা আমাদের যথেষ্ট উপকারও করে, কারণ ফসলের ক্ষতিকারক নানারকম কীট ও গুটিপোকা এরা খেয়ে শেষ করে।

যে-সব কীট বা শুটিপোকা মাঠের পাকা ফসলের পরম শত্রু ঠিক সেগুলিই চড়াই পাখিরা ওদের বাচ্চাদের পেট ভরাবার জন্য সংগ্রহ করে আনে, কারণ সত্তোজাত বাচ্চারা নরম পোকা ছাড়া খেতে পারে না। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ চড়াই জোর গলায় একটানা স্বরে টুসি-টুসি বা চির-চির-চির করে ডেকে যায়। ঐটিই ওদের গান, ঐ গানের সঙ্গে পালক ফুলিয়ে, পশ্চাদ্দেশ ধনুকের মতো বাঁকিয়ে, ডানাছুটি দুপাশে ঝুলিয়ে ভারিক্কি চালে পুরুষ চড়াই পায়চারি করে বেড়ায় এবং থেকে থেকেই উঁচু করা লেজটি নাচায়। ঝাঁকড়া পাতাওয়ালা গাছের ডালে বা কাঁটা ঝোপে চড়াই পাখিদের বড়ো বড়ো দল রাত্রে আশ্রয় নেয়। সন্ধ্যাবেলা ঐ-সব গাছে ওদের চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়, রাত গভীর হলে আস্তে আস্তে সব নিস্তব্ধ হয়ে আসে। দেওয়ালের কোনো গর্তে বা ছাদের কড়িকাঠের ফাঁকে খড় ও নানারকম আবর্জনা জমা করে চড়াই পাখি বাসা বানায়। এদের ডিমের সংখ্যা 3 থেকে 5টি, রঙ ফিকে সবুজাভ সাদা তাতে বিভিন্ন ধরনের বাদামী দাগ থাকে।

বায়া উইভার বার্ড (Ploceus philippinus) চিত্র নং 98 :

হিন্দী নাম— বায়া।

বাংলা নাম— বাবুই পাখি।

অপূর্ব কৌশলে বোনা বকযন্ত্র-ধরনের বাসার জন্যই বাবুই পাখি বিখ্যাত। চাষের জমির আশেপাশে গাছের ডালে বাবুই বাসা ঝুলতে সবাই দেখেছেন। ছবিতে পুরুষ বাবুই-এর প্রজনন ঋতুর রূপটি দেখানো হয়েছে। প্রজনন ঋতু ছাড়া অন্য সময়ে বাবুইদের স্ত্রী আর পুরুষের চেহারায় কোনোই ভেদ নেই। ছুটিকেই দেখতে অনেকটা স্ত্রী চড়াই পাখির মতো, শুধু বাবুইদের ঠোঁট আরো

মোটা এবং লেজ আরো ছোটো। ফসলের ক্ষেতের আশেপাশের মাঠে বাবুইদের বেশ বড়ো বড়ো ঝাঁক দেখা যায়। ধান গম প্রভৃতি পাকলে বাবুই পাখিরা এই-সব ফসলের ক্ষেতে যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে থাকে। বাবুইদের গতিবিধি নির্ভর করে বর্ষা এবং ক্ষেতের ফসল বিশেষ করে ধানের ওপর। রাত্রিবেলা চড়াই এবং ময়নাদের সঙ্গে এরাও নলখাগড়ার বনে বা আখের ক্ষেতে আশ্রয় নেয়। সাধারণত বাবুইরাও অনেকটা চড়াইদের মতোই চিট্-চিট্-চিট্ করে ডাকে তবে প্রজনন ঋতুতে পুরুষ পাখিরা একই সঙ্গে লম্বা টানা সুরে চি-ই-ই-ই করে আর-একটি আনন্দোৎফুল্ল ডাকও ডাকে। পুরুষ পাখিগুলি সবাই মিলে বাসা বুনতে বুনতে সমস্বরে এই ডাক ডাকে এবং সেইসঙ্গেই ডানা ঝাপটিয়ে স্ত্রীপাখিদের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। বাবুই এবং এই জাতীয় অন্যান্য 'উইভার বার্ড' বা তাঁতীপাখিদের রীতিনীতি বড়োই বিচিত্র। একটি এলাকায় পুরুষ পাখিটি একটির পর একটি বাসা বুনতে আরম্ভ করে এবং স্ত্রী পাখিরা সমাপ্ত বাসাগুলি দখল করে নিতে থাকে, এরপর যদি স্ত্রী পাখিটি প্রসন্ন হয়ে অনুমতি দেয় তবেই পুরুষ পাখিটি তার বাসা সমাপ্ত করতে পায়। এইভাবে প্রায় প্রতিটি পুরুষ বাবুই 2টি থেকে 5টি পর্যন্ত বাসা বোনে এবং প্রায়ই একাধিক স্ত্রী ও পবিবারের কর্তা হয়ে ওঠে। এদের ঝুলন্ত বা[illegible]গুলি দেখতে অনেকটা বকযন্ত্রের মতো, ধানগাছের পাতা সরু সরু করে চিরে তার সঙ্গে লম্বা খরখরে ঘাস মিলিয়ে এরা বাসা বোনে, বাসার প্রবেশপথটি একটি লম্বা নলের মতো দেখতে। জলের ধারে বাবলা, খেজুর প্রভৃতি গাছে একসঙ্গে বেশ কয়েকটি করে বাবুই বাসা ঝুলতে দেখা যায়। বাসার অভ্যন্তরে যেটি ডিম রাখবার

কুঠুরি সেখানে ওরা নরম কাদার ডেলা লেপে দেয়, কিন্তু কেন যে এটা করে তা ঠিক বোঝা যায় না। এদের ডিমের সংখ্যা 2 থেকে 4টি, রঙ পরিষ্কার সাদা।

আরো দুরকম তাঁতীপাখি কোনো কোনো অঞ্চলে দেখা যায়। এদের নাম স্ট্রিয়াটেড্ (P. manyar) এবং ব্ল্যাক থ্রোটেড্ উইভার বার্ড (P. benghalensis)। এই দুটি প্রজাতির পুরুষ পাখিদের প্রজনন ঋতুর পালকের রঙ দেখলে এদের চেনা সহজ হয়। প্রথমটির বুকের রঙ হলুদ, তাতে সুস্পষ্ট কালো কালো দাগ এবং মাথার ব্রহ্মতালুটি উজ্জ্বল হলদে রঙের। ব্ল্যাক থ্রোটেড্ উইভারদের মাথাটি উজ্জ্বল সোনালি হলুদ এবং গলাটি সাদা, শরীরের নিচের অংশও সাদাটে, গলা আর পেটের সাদা রঙের মাঝখানে বিভাজক রেখার মতো বুকের ওপর একটি কালোরঙের বেষ্টনী আছে। জল ও জলাভূমি অঞ্চলের বড়ো বড়ো ঘাস আর নলখাগড়ার বনের মধ্যেই এরা বাসা বোনে।

লাল মুনিয়া (Estrilda amandava) চিত্র— 99 (ক):

হিন্দীতে এদের শুধুই 'লাল' বলে আবার লাল মুনিয়াও বলে। বাংলা নামও লাল মুনিয়া।

এরা চড়াই-এর চেয়েও ছোটো পাখি। ছবিতে পুরুষ পাখিটির প্রজনন ঋতুর রূপ দেখানো হয়েছে। অন্যসময়ে স্ত্রী পুরুষ দুই পাখির চেহারায় কোনো পার্থক্য নেই, দুটিই বাদামীর ওপর সাদা ছিটদার, শুধু ঠোঁট আর পশ্চাদ্দেশে লালের ছোপ। এদের লেজ গোলচে ধরনের, ছিটদার মুনিয়াদের মতো সুচালো নয়। এই পাখিগুলির আচার-ব্যবহার ও অভ্যাসের মধ্যে মুনিয়াদের সব ক'টি বিশেষত্ব পুরোপুরি দেখা যায়। জলাভূমি অঞ্চলে বা ঝিলের

ধারে লম্বা লম্বা মঞ্জরিত ঘাস এবং নলখাগড়ার বনে এরা দলবদ্ধ ভাবে থাকে। ঘাসের বীজ ও কীটপতঙ্গই ওদের প্রধান খাদ্য। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ পাখি মৃদুস্বরে একটানা কিচিরমিচির করে গান গেয়ে চলে। লাল মুনিয়াদের খাঁচায় বদ্ধ অবস্থায় দেখাই আমাদের অভ্যাস। লোকে এই পাখি পুষতে খুব ভালোবাসে। এরা ঘাস দিয়ে গোলাকৃতি বাসা বানায়, প্রবেশপথটি থাকে পাশের দিকে আর বাসার ভিতরে বিছানো থাকে পাতলা ঘাস ও পালক। ঝোপের মধ্যে খুব নিচুতেই এরা বাসা বাঁধে। ডিমের সংখ্যা সাধারণত 4 থেকে 7টি এবং রঙ পরিষ্কার সাদা।

স্পটেড্ মুনিয়া বা ছিটদার মুনিয়া (Lonchura punctulata) চিত্র— 99 (খ) :

হিন্দী এবং বাংলায় এদের বলে 'তেলিয়া মুনিয়া'। হিন্দীতে 'সিনওয়াজ'ও বলে। এগুলিও আকারে লালমুনিয়াদেরই সমান কেবল এদের লেজ সূচালো। অল্পবয়সে এবং প্রজনন ঋতু ছাড়া অন্য সময়ে স্ত্রী ও পুরুষ দুই পাখিরই রঙ সাদামাটা বাদামী। কৃষিক্ষেত্রের আশেপাশে এই তেলিয়া মুনিয়াদের বড়ো বড়ো ঝাঁক দেখতে পাওয়া যায়, এক-একটি ঝাঁকে অনেকসময় 200টিরও বেশি পাখি থাকে। এরা মাটির ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে ঘাসের বীজ খেয়ে বেড়ায়, তা ছাড়া বৃষ্টিভেজা মাটির তলা থেকে ডানা-গজানো উইপোকারা বের হতে শুরু করলে তারও সদ্ব্যবহার করে থাকে। হঠাৎ তাড়া খেলে ওরা নিচু গলায় কিচ্‌মিচ্ করে ডাকতে ডাকতে গাছের ডালে গিয়ে আশ্রয় নেয়। মুনিয়াদের আকাশে ওড়ার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ওরা সমস্ত দলটি একসঙ্গে খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে জমাট বেঁধে ওড়ে। লালমুনিয়াদের মতো

এদের বাসাও গোলাকৃতি, প্রবেশদ্বারটি পাশের দিকে একটি নলের মতো বেরিয়ে থাকে। সাধারণত নিচু ঝোপের মধ্যেই ওদের বাসা দেখা যায়, কিন্তু কখনো তাল গাছের মাথায় বা পাতার ওপর মাটির 10 থেকে 15 মিটার ওপরেও ওরা বাসা বাঁধে। এদের ডিমের সংখ্যা 4 থেকে 8টি, ডিমের রঙ সাদা।

ফ্রিঞ্জিলিডি (Fringillidae) গোষ্ঠীর পাখিরা চড়াইদের নিকট আত্মীয়, এই গোষ্ঠীর প্রায় সব পাখিই চড়াইদের মতো, তবে এদের রঙের বাহার খুব আছে।

উদাহরণস্বরূপ সাধারণ ভারতীয় বা হজ্‌সন্‌স্‌ রোজফিঞ্চদের (Carpodacus erythrinus) নাম করা যায়, চিত্র নং—100 :

হিন্দী এবং বাংলায় এদের বলে টুটি বা লালটুটি।

ভারতীয় উপমহাদেশে এরা শীতের অতিথি রূপেই দেখা দেয়। পুরুষ টুটির মাথার রঙ চমৎকার গোলাপি, বুক, পিঠ এবং কাঁধও গোলাপি রঙের। স্ত্রী টুটির রঙ বাদামী, তাতে একটু জলপাই-সবুজের আভাস আছে। স্ত্রী এবং পুরুষ দুই পাখিরই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ভারী কোণাকৃতি ফিঞ্চসুলভ ঠোঁট, দ্বিধাবিভক্ত লেজ এবং ডানায় ফিকে রঙের দুটি দাগ। গ্রীষ্মের মুখে, যখন ওরা শীতকালীন আবাসস্থল পিছনে ফেলে জন্মভূমির পথে পাড়ি জমায় সেই সময় পুরুষ পাখির দেহ থেকে পুরোনো পালক ঝরে যায়, আর তলা থেকে দেখা দেয় উজ্জ্বল লাল রঙের নতুন পালক। লালটুটিরা দল বেঁধেই থাকে, চাষের জমির আশেপাশে 10 থেকে 20টি পর্যন্ত পাখির ছোটো ছোটো দল খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। ক্ষেতের ফসল, বাঁশের বীজ, বটফল জাতীয় ছোটো ছোটো ফল এই-

সবই ওদের প্রধান খাদ্য। জোয়ার, বাজরা, তিসি ইত্যাদি এবং পুটুস প্রভৃতি বুনোফলও ওরা খায়। তা ছাড়া মধুর লোভে ওরা এসে ভিড় জমায় পুষ্পিত শিমূল আর মাদার গাছের ডালে। ফুলের গর্ভে, মুখ ডুবিয়ে মধু খেতে গিয়ে এই পাখিদের মুখ, কপাল আর কণ্ঠ পরাগে মাখামাখি হয়ে যায়, এইভাবেই ওরা ফুল থেকে ফুলে পরাগযোগ ঘটাতে সাহায্য করে। লালটুটিদের ডাক বেশ সুরেলা, শিস দেওয়ার ভঙ্গিতে টুই? টুই? বা চুই-চুই? ক'রে ওরা ডাকে, শুনে মনে হয় যেন কাউকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে। গ্রীষ্মের মুখে জন্মভূমির উদ্দেশে যাত্রা করার ঠিক আগে কয়েকদিন পুরুষ টুটির উচ্চকণ্ঠের মিষ্টি গান আমরা অনেক সময় শুনতে পাই। এই প্রজাতিটি, কাশ্মীর এবং পশ্চিম হিমালয়ের মাঝামাঝি উচ্চতাবিশিষ্ট কোনো কোনো অঞ্চলে ডিম পাড়ে। এদের ঘাসের তৈরি বাটির মতো আকারের বাসার ভিতরে খুব মিহি শিকড়-বাকড় ও চুলের আস্তরণ থাকে। বুনো গোলাপ বা ঐ জাতীয় কোনো কাঁটা-ঝোপের মধ্যে মাটি থেকে দু-এক মিটার উচ্চতার মধ্যেই ওদের বাসা দেখা যায়। এদের ডিমের সংখ্যা 3/4টি, ডিমগুলির রঙ নীল, তাতে কালচে ও ফিকে লালের ছিটেফোঁটা দাগ থাকে।

পাসেরিফর্মিস্ বর্গের শেষ গোষ্ঠীটির নাম এম্বারিজিডি (Emberizidae)। বান্টিং পাখিরা এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। ফিঞ্চদের সঙ্গে যদিও এই পাখিদের অনেক মিল আছে, তবে এরা ফিঞ্চদের চেয়ে পাতলা, দেহের গড়ন আরো লম্বাটে এবং লেজটি বেশি লম্বা। পিপিটদের মতো এদের মধ্যেও অনেক পাখির লেজের

বাইরের দিকের পালকে সাদারঙের প্রাচুর্য থাকে, ওড়ার সময় এই সাদা ছোপ স্পষ্ট চোখে পড়ে। এদের দলের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত পাখি ব্ল্যাক হেডেড্ বান্টিং (Emberiza melanocephala) ও রেড হেডেড্ বান্টিং (E. bruniceps), চিত্র 101 :

হিন্দীতে দুরকম বান্টিংকেই বলে গণ্ডাম্।

বাংলায় এদের কালোশির ও লালশির বলতে শোনা যায়। ছবিতে দুরকম বান্টিংদের পুরুষ পাখিকে দেখানো হয়েছে। এই দুটি প্রজাতিই চড়াইদের চেয়ে সামান্য বড়ো এবং এরাও আমাদের দেশে শীতের অতিথি। কালোশিরদের স্ত্রী পাখির পিঠের রঙ হলদে বাদামী আর লালশিরদের স্ত্রী পাখির পিঠ ছাই ছাই বাদামী রঙের। দুরকম স্ত্রী পাখিরই পেটের দিকের রঙ বেশ গাঢ় হলুদ। শীতকালে স্ত্রী এবং পুরুষ বান্টিংদের বেশ বড়ো বড়ো মিশ্রিত দলকে, ফসলের ক্ষেত এবং তার আশেপাশের ঝোপঝাড় ও বাবলা গাছের জঙ্গলে দেখা যায়। জোয়ার বাজরা গম প্রভৃতির পাকা ফসলের ক্ষেতে এই পাখিদের ঝাঁক যখন নামে মনে হয় যেন আকাশ অন্ধকার করে মেঘ নামছে। এরা ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি করে। শুধু যে মাঠের ফসলের ওপরই এরা হামলা করে তা নয়, যতদিন না কাটা ফসল ঝাড়াই বাছাই হয়ে গোলায় তোলা হচ্ছে ততদিন পর্যন্তই চলতে থাকে এদের উপদ্রব। ফসল ক্ষেতের ধারে ধারে বাবলা গাছের গাঢ় সবুজ পাতার ফাঁকে উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের এই পাখিদের ঝাঁক দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন অজস্র হলুদ রঙের ফুল ফুটে রয়েছে। শীতকালে, অর্থাৎ আমরা যখন এই পাখিদের দেখি তখন এদের কণ্ঠে চড়াই-এর মতো কিচিরমিচির ডাক ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না, এই ডাক ডাকে ওরা ওড়ার

সময়। কালোশির বান্টিং পাখিরা আমাদের দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূরে পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ অঞ্চলে ডিম পাড়ে এবং বংশবৃদ্ধি করে। আমাদের সবচেয়ে কাছাকাছি লালশির বান্টিংদের ডিম পাড়ার জায়গা পাকিস্তানের বালুচিস্তান অঞ্চল। ঘাসের ডগা ও তন্তু দিয়ে বাটির মতো বাসা বানিয়ে তার মধ্যে ওরা বিছিয়ে দেয় ছাগলের লোম। মাটি থেকে প্রায় 1½ মিটার উচ্চতায় ঝোপের ভিতরে বেশ লোকচক্ষুর আড়ালে এরা বাসা বাঁধে। সাধারণত এদের ডিমের সংখ্যা 5টি, ডিমের রঙ ফিকে সবুজাভ সাদা, তাতে গাঢ় বাদামী, ধূসর ও ল্যাভেণ্ডার রঙের দাগ ও ছিট থাকে।

———